বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা

নামবিজ্ঞানাচার্য
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

Shri KESAV MATH
Mathura (U.P.)

বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা

[স্বয়ং-ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত-তম
মহাজয়ন্তী উৎসবের সামান্য অর্ঘ্য স্বরূপ]

বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা

[স্বয়ং-ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত-তম
মহাজয়ন্তী উৎসবের সামান্য অর্ঘ্য স্বরূপ]

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥

— শ্রীচৈঃ চঃ, ১।২ অঃ

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারে জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥"

— শ্রীচৈঃ চঃ, ২।২০ অঃ

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৯৬

—

নাম-বিজ্ঞানাচার্য্য প্রভুপাদ
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী
প্রণীত
ও
শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী
কর্তৃক সম্পাদিত

Shri KESHABJI G
MAHAPRABHU CHAITANYA H

[মূল্য পনের টাকা]

প্রকাশক : শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত]

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর,
পোঃ নবদ্বীপ। জিলা নদীয়া।

২। শ্রীগৌররায় গোস্বামী
সি. এন. ৯০, কোক-ওভেন কলোনী,
পোঃ দুর্গাপুর-২। জিলা-বর্দ্ধমান।

৩। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, [কলেজ স্কোয়ার], কলিকাতা-৭৩

৫। ঢাকা ষ্টোর্স
রাজার বাজার। পোঃ নবদ্বীপ। জিলা—নদীয়া।

৬। চারিধাম আশ্রম।
পোঃ খাগড়া, জিলা-মুর্শিদাবাদ।

মুদ্রক। শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস প্রিন্টার্স। ৫৫/৬৪, কালীচরণ ঘোষ রোড। কলিকাতা-৫০

॥ শ্রীহরিঃ ॥

—উৎসর্গ-পত্র—

নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ— শ্রীল সনাতনপাদ শ্রীল
রূপপাদ শ্রীল জীবপাদ শ্রীল মধুপণ্ডিত ও
বাংলার ভক্তকবি জয়দেব -সেবিত যথাক্রমে
পঞ্চপ্রভু শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ,
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ, শ্রীশ্রীরাধা-
দামোদরজীউ, শ্রীশ্রীরাধাগোপী-
নাথজীউ ও শ্রীশ্রীরাধামাধব
জীউর শ্রীচরণারবিন্দে এই
গ্রন্থখানি নিবেদন করিয়া
সেই প্রসাদী নির্মাল্য মদীয় প্রপিতামহ
শ্রীহরিপাদপদ্ম-গত
শ্রীশ্রীমৎ মনোহর গোস্বামিপাদের
পুণ্য স্মৃতিপূজাস্বরূপ
উৎসর্গীকৃত হইল।

—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—

— জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি —

॥ সম্পাদকীয় নিবেদন ॥

মদীয় অভীষ্টদেব পরম কারুণিক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অহৈতুকী কৃপার একটি প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— আমার ন্যায় একান্ত অজ্ঞ, অযোগ্য ও ভজনহীন জনের দ্বারা 'বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা'র ন্যায় ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত অতি সুচারু গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্য সুসম্পন্ন করান। এই মহান্ কর্মে, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইবার গৌরবটুকু লাভ করিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তদীয় রাতুল শ্রীচরণারবিন্দে অশেষ প্রণতি নিবেদন করিতেছি। এই গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্যের ইতিবৃত্ত নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে বিধৃত হইল।

মদীয় শ্রীগুরুদেব ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহরিপাদপদ্মগত [ওঁ বিষ্ণুপাদ] নাম-বিজ্ঞানাচার্য শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার আর কোন সার্থকতা নাই। তদীয় মৌলিক গবেষণা ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত— 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম', 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা', 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' ও 'নামাপরাধ-দর্পণ' প্রভৃতি অনন্য গ্রন্থসমূহ সাধু, সুধী ও ভক্তসমাজে দীর্ঘদিন ধরিয়া পঠিত, সমাদৃত ও উচ্চপ্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে বিভিন্ন ভক্তি-সাময়িকীতে প্রভুপাদের যে সকল প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে ভক্তবৃন্দের পরম আস্বাদনীয় ও বহুজনের ভক্তি-উন্মুখতা ও ভজনপথের দিশারীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন অতীত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। তবে প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ কাল হইতে দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও প্রবন্ধ-প্রতিপাদিত বিষয়সকল, আজিকার পরিবর্তিত সমাজের ও কালের পটভূমিতেও বহু প্রবৃত্ত-সাধকের ভজন পথের

অনুপ্রেরণা-স্বরূপ ও সেকালের মতই ভক্তবৃন্দের পরম আস্বাদনীয়রূপে সমান উপযোগী ও মূল্যবান বিবেচনা করিয়া এবং সুধীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি।

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই অমূল্য প্রবন্ধ-সমূহ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অসীম কালের কপোলতলে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাহাতে না যায়, এইজন্য আমাদের সীমিত সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে ইহাদিগকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করিয়া প্রকাশের বর্তমান উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। 'শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা' এবং 'শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার পরিশিষ্ট' নামক প্রবন্ধ দুইটি প্রথমে চলিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল; গ্রন্থকারের অনুমতিক্রমে উহা সম্পাদক কর্তৃক সাধু ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই সঙ্কলনে নির্বাচিত ১৯টি প্রবন্ধ মাত্র প্রকাশ করা হইল। ইহার বিন্যাসে রাগভক্তিমার্গে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে বিভাগত্রয় বর্তমান— সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। প্রবন্ধরাজির বক্তব্য বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন' তত্ত্বই ব্যক্ত হইতে দেখা যাইবে। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ সহযোগে দুরূহ শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসকল যেভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে— তাহা পাঠক মাত্রেরই মনের গভীরে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করিয়া ভক্তি-পথের অনন্যসদৃশ উজ্জ্বলতা উপলব্ধিতে যে প্রভূত সাহায্য করিবে— সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বর্তমান গ্রন্থ কলেবর প্রকাশিত হইয়া যদি সুধী পাঠকবৃন্দের কিছুমাত্র প্রয়োজন সাধিত হয়, তবে আমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।

পরিশেষে নিবেদন— প্রভুপাদ কর্তৃক রচিত আরও দুই-তিনটি অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা, সজ্জনবৃন্দের উৎসাহ ও পোষকতা

লাভ করিলে উহা কার্যে পরিণত হইতে পারে।

গ্রন্থ মুদ্রণের প্রুফ্ সংশোধনাদি সমুদয় তত্ত্বাবধান কার্য, কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব ডেপুটি পার্সোনেল অফিসার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী [B. Sc., Dip. Lib.] কর্তৃক কৈঙ্কর্য্য মানসে সম্পন্ন হইয়াছে। তদীয় এই সহায়তা ব্যতিরেকে গ্রন্থ প্রকাশ একরূপ অসম্ভব ছিল। একারণে তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া, শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ-চরণে তদীয় সর্বাঙ্গীণ কুশল ও ভজনানুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি।

শুদ্ধ-ভক্তি-গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গুহ মহাশয় ও তদীয় ভক্তিমতী ও সুযোগ্যা সহধর্মিণী স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে যে সদৈন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন তাহাতে এই গ্রন্থের কিয়দংশ মুদ্রণ-ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠে সজ্জনগণ যদি কিছু প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহিত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-চরণে তাঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত যেন কৃপাপূর্বক প্রার্থনা করেন— এই বিনীত নিবেদন।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থের সৌকর্য বৃদ্ধি করায় শিল্পী শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রভুপাদের প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে যাঁহাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি, আনুকূল্য, সহযোগিতা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সকল উদারচরিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে— মদীয় অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী, পিতৃদেব শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী, ভ্রাতা শ্রীমান শ্যামরায় গোস্বামী, নবদ্বীপ গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী (পঞ্চতীর্থ), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় (বি. ই. সি. ই.—

পশ্চিমবঙ্গ সরকরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, সিভিল), ডাঃ শ্রীমণীন্দ্র কুমার সিংহ (এম.বি.), শ্রীমান প্রশান্ত রায়— বি.এম.ই. (যাদবপুর) এম. এস. (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীমান কল্যাণ রায়— এম্. টেক. (কলিঃ) পি. এইচ. ডি. (যুক্তরাষ্ট্র)— উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগৌররায়-জীউ-চরণে ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। সর্বশেষে, সর্ববৈষ্ণবচরণে সকাতরে প্রার্থনা এই যে, নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন।

শ্রীনবদ্বীপধাম।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী,
১৩৮৮ সাল।
শ্রীচৈতন্যাব্দ-৪৯৬

ইতি—
শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ-শ্রীচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন
সম্পাদক

প্রবন্ধমালা-বিষয়সূচী ঃ—

	প্রবন্ধ বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১।	পরপারের পাথেয়	১
২।	অভক্তের ভগবান	১০
৩।	ভক্তের ভগবান	২৭
৪।	ধর্ম	৪১
৫।	ভক্তিই জীবের পরম লভ্যবস্তু	৫১
৬।	ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য	৫৪
৭।	বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ	৬৯
৮।	সমষ্টির মহা-অভিসার	১০০
৯।	চিদানন্দ জগৎ ও তাহার সন্ধান	১০৮
১০।	আশার আলোক	১৪৮
১১।	নাম প্রচারে নামীর পরমাশ্চর্য কৃপা	১৭৩
১২।	শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্য ও তাহার দুইটি প্রধানতম কারণ	১৭৭
১৩।	শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা	২০৩
১৪।	শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা বা প্রেমযুগের অভ্যুদয়ের পরিশিষ্ট	২৬০
১৫।	শ্রীনাম বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা	২৮০
১৬।	শ্রীভগবানকে পাই না কেন	২৮৯
১৭।	পরতত্ত্বের সীমা	২৯৭
১৮।	ভক্তি ও শ্রীভানুনন্দিনী	৩৩৯
১৯।	শ্রীভগবন্নামের ফল	৩৭৪

॥ শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

পরপারের পাথেয়

ভবিষ্যৎ দৃষ্টির নামই দূরদর্শিতা। যে যতদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য করিতে পারে তাহাকে তত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলা যায়। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মনুষ্য যেমন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বহু পূর্ব হইতে তাহার দুঃখের প্রতিকার বিষয়ে যত্নবান হইতে পারে এরূপ দূরদর্শিতা মনুষ্যেতর অপর কোন প্রাণীতে দেখা যায় না। মানুষ যে কেবল কল্য কি হইবে ভাবিয়া অদ্য তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে— তাহা নয়, দশ বিশ বৎসর পরের ব্যবস্থা— তাহাও মানুষ পূর্ব হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এমন কি মৃত্যুর পর কি হইবে!— মানুষ এতদূর পর্যন্ত ভাবিয়া পূর্ব হইতে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে বিরত হয় না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ এতদূর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

মানুষ এতাদৃশ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও, মৃত্যুর পর 'আমার কি হইবে?' ইহা না ভাবিয়া, "আমার পুত্রাদি পরিবারগণের ও পরিজন-বর্গের কি হইবে?"— ইহাই চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা বিষয়েই সমস্ত জীবিতকাল চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের প্রতি এইখানেই মায়ার শ্রেষ্ঠতম ছলনা। মৃত্যুর পর আমি যেখানে যাইব— সেখানে আমার উপকারে আসিবে, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে— এমন কী জিনিষ সংগ্রহ করিলাম ইহা না ভাবিয়া, যাহারা জীবিত থাকিয়া এই পরিচিত জগতে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে অবস্থান করিবে — সেই সহায়সম্পন্ন পরিজনগণেরই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজের একান্ত

প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ বিষয়ে মানুষ বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এমনই প্রভাব।

মনুষ্যের সমস্ত জীবনের কঠোর পরিশ্রমার্জিত যাহা কিছু—মৃত্যুর পর সমস্তই যে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হয়,—এ সত্য কোন প্রকারেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরলোকের পথিকের পক্ষে ইহজগৎ হইতে একটি সূচ, একটি তণ্ডুলকণাও সঙ্গে লইয়া যাইবার যখন উপায় নাই, তখন একথা আমাদেব পূর্ব হইতেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর যেখানে আমি যাইব, সেখানে আমার সঙ্গে যাইবে, আমার কাজে লাগিবে, এমন কী সম্পদ আমি জীবিতকালে সঞ্চয় করিলাম। ইহাই সময় থাকিতে ভাবিয়া, তাহারই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবেই তাহাকে যথার্থ দূরদর্শিতা বলা যায়। নচেৎ যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে কেবল তাহাদেরই জন্য যে ভবিষ্যৎ ভাবনা, সেই দূরদর্শিতাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত বা অদূরদর্শিতা বলিয়াই জানিতে হইবে।

মৃত্যুর কথা ভাবিয়া মানুষ জীবনবীমা (Life Insurance) করে, তাহাও তাহার মৃত্যুর পর ইহলোকে জীবিত থাকিবে যাহারা, তাহাদিগেরই অভাবের প্রতিকারের জন্য। কিন্তু ইহার এক কপর্দকও যদি মৃত্যুর পর নিজের প্রয়োজনে লাগিত, নিজের অভাব মিটাইতে পারিত, তবেই ইহার "জীবন-বীমা" নাম সার্থক হইত। অতএব চিন্তা করিয়া স্থির করা প্রয়োজন, এমন কোন "জীবন-বীমা" আছে কিনা, যাহা জীবনান্তে জীবিত যাহারা তাহাদের কাজে না লাগিয়া নিজের কাজে লাগিতে পারে। ইহাই পূর্ব হইতে স্থির করিতে পারেন যাঁহারা, —তাঁহারাই প্রকৃত দূরদর্শী।

এই উপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। বহু বৎসর পূর্বে কলিকাতার কলুটোলা অঞ্চলে একজন খুব ধনবান বড় জমিদার ছিলেন। তাঁহার কোন একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রজার কয়েক বৎসরের বাকি

খাজনার দায়ে উক্ত জমিদারবাবুর ম্যানেজার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘর ক্রোক্ করিয়া লন। ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পথে বসিলেন। অনেক চিন্তার পর একটি উপায় স্থির করিয়া তিনি জমিদারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু দরিদ্র বেশ দেখিয়া দ্বারবান তাঁহাকে জমিদার-বাবুর নিকট যাইতে দিল না। এইরূপ কয়েকদিন বিফলমনোরথ হইয়া একদিন দ্বারবানের অলক্ষ্যে তিনি সহসা জমিদারবাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু তখন তাঁহার বহুবিলাসমণ্ডিত বৈঠক-খানায় স্তাবকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রূপার গড়গড়ায় তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। সহসা ব্রাহ্মণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্তি ও বিস্ময়ের সহিত ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ব্রাহ্মণ নির্ভীকতার সহিত ও সুগম্ভীরভাবে বলিলেন "মহাশয়, আমি আপনারই একটি জরুরী কাজের কথা জানাইবার জন্য আসিয়াছি, আমার নিজের কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসি নাই। সংবাদটি আপনাকে জানান খুব আবশ্যক বলিয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। আমি কয়েকদিন পূর্বে কঠিন পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-ছিলাম। যমদূতগণ আসিয়া আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। সেখানে যিনি হিসাবপত্র রাখেন, তিনি অনেকক্ষণ খাতার পাতা উল্টাইয়াও আমার নাম দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি দূতগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'মূর্খগণ! যাহাকে আনিবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাকে না আনিয়া এ কাহাকে আনিয়াছিস? যা ইহাকে এখনই রাখিয়া আয়।' গোলমাল শুনিয়া ধর্মরাজ স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সলজ্জভাবে আমাকে বলিলেন, 'আমার দূতগণের এই ভুলের জন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনাকে সযত্নে ইহারা আবার আপনার গৃহে রাখিয়া আসিতেছে। এখানে আসিয়া কেহই আর সেই দেহে ফিরিয়া যায় না। এইজন্য এখানকার কোনও সংবাদ কাহারও দ্বারা পাঠান সম্ভব হয় না। যাহা

হউক, আপনি যখন ফিরিয়া যাইতেছেন তখন আমার একটি বিশেষ কাজের ভার আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে।' এই কথা বলিয়া যমরাজ আপনার নাম করিয়া বলিলেন, 'অমুক জমিদার এখানে শীঘ্রই আসিবেন। শুনিয়াছি, তিনি খুব ধনবান লোক, বহু ধনসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহাকে গিয়া বলিবেন, তিনি আসিবার সময় যেন তাহা হইতে একটি মাত্র সূচ লইয়া আসেন। এখানে সূচের ('ছুঁচ্' চলিত ভাষায়) অভাবে পাতকিদিগের ছিন্নবস্ত্র সেলাই করা সম্ভব হয় না। উক্ত জমিদারবাবু অনেক কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন। তাহা হইতে একটি মাত্র সূচ আনিতে নিশ্চয় তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না।' মহাশয়, যমরাজের এই অনুরোধটি আপনাকে জানাইলাম, এখন আপনার নিকট বিদায় লইতে চাই।"

জমিদারবাবু ব্রাহ্মণের এই কাহিনী বিশ্বাস করেন নাই সত্য; কিন্তু তাহা না করিলেও তিনি মৃত্যুর পর যেখানে যাইবেন—সেখানে তাঁহার সঞ্চিত বিপুল সম্পদ হইতে যে একটি সূচ পর্যন্তও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণের কথায় এই সত্যের আলোক তাঁহার অবিদ্যার অহমিকাচ্ছন্ন অন্তরে আজ সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিনীতভাবে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন কেন? সেখানে কি কেহ সূচ লইয়া যাইতে পারে? আপনার কি অভিপ্রায় খুলিয়া বলুন।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়! মৃত্যুর পর যেখানে যাইবেন, সেখানে যদি একটি সূচ পর্যন্তও লইয়া যাইতে না পারেন, তবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছেন তাহা কি প্রকারে সেখানে লইয়া যাইবেন?"

এই কথা শুনিয়া জমিদারবাবু সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন, এবং যে অতি প্রয়োজনীয় কথাটি তিনি এ পর্যন্ত ভুলিয়া ছিলেন, সেই অমূল্য উপদেশটি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রথমে সেই ব্রাহ্মণকে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, পরে ম্যানেজারবাবুকে ডাকাইয়া

ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘর সমস্ত প্রত্যর্পণের আদেশ দিলেন এবং সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মানুষ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও আমাদের প্রত্যেকের নিজ স্বার্থের পক্ষে এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাটি যে সময় থাকিতে আমরা ভাবিতে পারি না— আমাদের প্রতি মায়ার প্রধান ছলনা এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। অতএব যাহা পরকালে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাইবে, যাহা পরপারের যথার্থ পাথেয়— যাহা পারের কড়ি— সেই বস্তু আমাদিগের প্রত্যেককেই সময় থাকিতে থাকিতে ইহলোকেই সঞ্চয় করিতে হইবে।

এখন হয়তো নাস্তিক-প্রকৃতির লোকে বলিতে পারে, "মানুষের পক্ষে ইহকালই সত্য এবং সর্বস্ব"; 'পরলোক', 'পরপার', 'পারের কড়ি' প্রভৃতি এ-সকল কথা কল্পনাপ্রসূত ও নিছক উপাখ্যান মাত্র, অতএব পরপারের সংস্থান বিষয়ে কিছুই ভাবিবার আবশ্যকতা নাই।" ইহার উত্তরে শুধু এই কথাটি বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাঁহারা পরকাল আছে বলেন এবং পারের কড়ির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন— এমন লোকের সংখ্যাও অল্প নহে; বিশেষত: শুক-সনক-নারদাদির ন্যায় যে সকল মহাপুরুষ ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত জগতের পূজ্য, প্রণম্য, ও প্রাতঃ-স্মরণীয়রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের কথাও উপেক্ষা করা চলে না। অতএব "পারের কড়ির প্রয়োজন নাই" একথা যখন সন্দেহশূন্য নহে, তখন এরূপ বিষয়ের সংশয়স্থলে পারের কড়ি সঞ্চয় করিয়া লইয়া পরে যদি উহা সত্যিই প্রয়োজনে না লাগে তবে তাহাতে তেমন কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উহা সঙ্গে না লইয়া যদি সেখানে গিয়া দেখা যায়, উহার একান্তই প্রয়োজন— তবে সে-অবস্থায় পারের কড়ি সঙ্গে না লইয়া যাওয়া কিরূপ নির্বুদ্ধিতা ও

অদূরদর্শিতার কার্য হইবে সে-কথার উল্লেখ আর না করিলেও চলিতে পারে। অতএব উক্ত উভয় পক্ষের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলেও পরপারের পাথেয় সংগ্রহ বিষয়ে আমাদের ইহকালেই যত্নশীল হওয়া অধিক সমীচীন বলিয়াই মনে করা উচিত। ইহকালই সর্বস্ব নহে, মৃত্যুই শেষ নহে, সংসারের খেয়াঘাটের পরপারেও আছে অফুরন্ত অনন্ত জীবনের উপযুক্ত নিত্য ও শাশ্বত অমৃতময় আনন্দময় জগৎ। তাই ভক্ত কবি উল্লাসভরে গাহিয়াছেন—

"মৃত্যু নহে শেষ তবে,
আছে আছে অবশ্যই এ নদীর পার।
আছে আছে সেই স্থানে—
জীবনের শুভ সমাচার॥"

সুতরাং নাস্তিকগণের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এখন যে-কড়ি ইহকালে সঞ্চয় করিতে পারিলে পরকালের পথেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায়—এমন পরপারের যথার্থ পাথেয় যাহা—তাহাই আমাদের সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধু ও শাস্ত্র (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) শ্রীভগবন্নামকেই 'পারের কড়ি' রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবন্নামাশ্রয়কেই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।" অর্থাৎ প্রবেশপত্র দেখাইয়া তবে যেমন বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ শ্রীহরিনামই শ্রীভগবদ্ধামে— শ্রীগোবিন্দের গৃহে গমন করিবার প্রবেশপত্র (Passport & Visa)।

এক দেশ হইতে দেশান্তরে অন্য মুলুকে যাইবার সম্ভাবনা হয়তো অনেকের পক্ষে নাও হইতে পারে, কিন্তু এ জগতে এমন কেহই থাকিবেন না যাঁহাকে ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকের পথের পথিক হইতে না হইবে। অতএব পরপারের যাত্রীর পক্ষে প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে সময় থাকিতে থাকিতে ইহলোকেই পারের কড়ির সংস্থান করিয়া

লওয়া একান্তই আবশ্যক। একমাত্র নিরপরাধে (দশবিধ নামাপরাধ বর্জনপূর্বক) নাম গ্রহণ করা ভিন্ন এই শ্রীহরির নাম গ্রহণে অপর কিছুই বিধি-নিষেধ নাই। যথা—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব সিদ্ধি হয়॥"

অতএব আমাদের এই ঘোর কলিযুগে কলিপ্রভাব-কৃত এই ঘোর দুর্দিনে সর্বদা সর্বভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীহরির নামই— শ্রীভগবন্নামাশ্রয়ই একমাত্র পারের কড়ি, পরপারের একমাত্র পাথেয়। যথা—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অতএব ইহসংসারে থাকিতে থাকিতে, পরপারের এই প্রকৃষ্ট পাথেয় যিনি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই কেবল যে মায়া-ধামের সীমা বিনা বাধায় অতিক্রমণীয় তাহাই নয়, গোলোকের শ্রীকৃষ্ণ-লোকের দ্বার পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে উন্মুক্ত থাকে, যেখানে অবাধে সসম্মানে প্রবেশ করিয়া যে মূল্যে তিনি শ্রীহরির অমূল্য চরণকমলও ক্রয় করিতে পারেন। শ্রীহরিনামের কড়ির এমনই মূল্য— এমনই প্রভাব! এই ছাড়পত্র লইয়া এই ধনে ধনী হইয়া যখন কোন ভাগ্যবান্ ব্রহ্মলোক অতিক্রম করেন, তখন সেই ভগবদ্ধামের অভিযাত্রীকে সন্দর্শন ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার অপেক্ষায় পূর্ব হইতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পরলোকের পথে পরপারে পারের কড়ির এতই অমূল্য— এমনই প্রভাব।

অন্যান্য শুভক্রিয়াদিরূপ ছাড়পত্র লইয়া স্বর্গাদিলোকে প্রবেশ করা যাইতে পারিলেও উহার দ্বারা সংসারের পরপারে জন্মমৃত্যুর অতীত চিরঅমৃতময় ধামে প্রবেশ লাভ করা যায় না, স্বর্গাদি লোক ভোগের পর পুনরায় জরামরণসঙ্কুল সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু এই

'হরিনাম' রূপ পারের কড়ির প্রভাবে সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া জীব সেই জগন্নাথের নিজ মন্দিরে— গোবিন্দগেহে, অবাধে প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারে ; যেখানে যাইলে আর অনিত্য ধূলার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাই দেখা যায় জগন্নাথ জগতের জীবসমূহকে এই অভয় ও আশ্বাসবাণী শুনাইয়া আহ্বান করিতেছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

(শ্রীগীতা ৮।১৬)

এখন আর এক সন্দেহ মনে আসিতে পারে এই যে, শ্রীভগবন্নাম —হরিনাম যদি সত্যই এমন অমূল্য বস্তু হয়েন, তবে এই জগতের হাটে-বাজারে সেখানকার টাকা পয়সার যেরূপ মূল্য বোঝা যায়, হরিনামের মূল্য তো তেমন কিছুই বুঝা যায় না। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া তাঁহাদের দর্শনী দিবার সময় প্রাপ্য অর্থ না দিয়া যদি 'হরিনাম' শুনাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা যে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন, এরূপ কেহই আশা করিতে পারে না। উকীল-মোক্তারের ফী, খাজনা ট্যাক্স, কোন স্থলেই অর্থের পরিবর্তে কেবল 'হরিনাম' দিয়া চলে না। গাড়োয়ান, মুটিয়া, রিক্‌সাওয়ালা, ট্রামের ভাড়া, রেলের টিকিট, হাট-বাজার, যে কোন বিষয়ই হউক— অর্থের পরিবর্তে কেবল হরিনাম দিয়া কাহাকেও রেহাই পাইতে দেখা যায় না। অধিক কথা কী, এক পয়সা মূল্যেরও কোন দ্রব্য কিনিতে যাইয়া যদি কেহ একটি পয়সার পরিবর্তে 'হরিনাম' দিয়া উহা লইতে চায়, তবে ক্রুদ্ধ দোকানদারের নিকট তাহার লাঞ্ছনা ভোগের সীমা থাকে না। সংসারের হাটে বাজারে যে হরিনামকে এরূপ মূল্যহীন ও পদে পদে 'অচল' হইতে দেখা যাইতেছে, পরলোকের বাজারে সেই বস্তুর আবার কি-ই বা মূল্য হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারের বাজারে, ভবের হাটে

'হরিনাম' যে 'অচল' তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে ইহার এই অচল অবস্থা দেখিয়াই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই পারের কড়ি সেখানে— সেই পরপারের বাজারের যথার্থ 'সচল' অর্থ। যেমন একদেশের টাকা পয়সা দেশান্তরে অন্য রাজ্যে 'অচল' হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকলেই জানেন, চীন বা মার্কিন মুলুকের টাকা এদেশে— এই ভারতে 'অচল' হইলেও উহাই আবার যেমন সেই সেই মুলুকে সচল হয় এবং এই মুলুকের সমস্ত 'সচল' টাকাকড়ি আবার যেমন সেখানে অচল, সে দেশের বাজারে যেমন উহা কেহই লয় না, তেমনি 'শ্রীহরিনাম' পর-পারের কড়ি বলিয়াই এ বাজারে ইহাকে 'অচল' হইতে দেখিলেও ইহা যথার্থ 'অচল' নহে— পরলোকের বাজারে এই হরিনামই কেবল 'সচল কড়ি', সেখানে সে বাজারে ইহজগতের সকল অর্থ, সকল সম্পদ একে-বারেই 'অচল', এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিতে পারিলে শ্রীভগবন্নামকে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন মায়াময় সংসারে মূল্যহীন বস্তুর মত বোধ হইলেও পর-পারের রাজ্যে ইহা যে অমূল্য বস্তু, ইহা যে আমাদের পরলোকের সংস্থান— একথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কাহাকেও যদি এদেশ হইতে অপর দেশে অন্য মুলুকে যাইতে হয়, তবে এই দেশের বাজারে অচল বলিয়া ফেরৎ দেওয়া সেই অন্য মুলুকের প্রত্যেক টাকা পয়সাটি তাহাকে যেমন অতি যত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়, সে দেশে গিয়া উহাই তাহার কাজে লাগিবে বলিয়া, তেমনি পরলোকের যাত্রীর পক্ষে সংসারের বাজারে 'অচল' বলিয়া ফেরৎ দেওয়া প্রত্যেক 'হরিনামটি' অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে হৃদয়-পেটিকায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে— সে দেশের পাথেয়রূপে ইহাই তাহার সঙ্গে যাইবে ও সে বাজারে ইহাই তাহার যথার্থ কাজে লাগিবে বলিয়া।

শুধু তাহাই নহে, কাহাকেও যদি এই দেশ হইতে দেশান্তরে অন্য মুলুকে যাইতে হয়, তাহার পক্ষে যেমন এদেশের অর্জিত সমস্ত অর্থ

বিনিময় (Exchange) করিয়া সেই দেশান্তরে যে মুদ্রা 'সচল', তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেই অধিক লাভজনক হইয়া থাকে ; সেইরূপ যাহারা ইহকালের অর্জিত সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে যত অধিক পারের কড়ি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারা পরকালের রাজ্যে তত অধিক সৌভাগ্যবান মহাজন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়েন।

শ্রীমদ্‌গ্রন্থকারের অপ্রকটের পর
প্রথম প্রকাশ—উজ্জীবন-চৈত্র, ১৩৮৪— ২৪ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা

অভক্তের ভগবান

(১)

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের ও ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের কথাই সর্বত্র জয়যুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা "ভক্তের ভগবান"-রূপেই লোক-প্রসিদ্ধ। যেমন ভক্তের সহিত, তেমনি অভক্তের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। তাহা যদি না হয়,—যদি অভক্তের কোন সম্বন্ধ তাঁহার সহিত না-ই থাকে, তাহা হইলে বেল পাকিলে বায়সের যেমন তাহাতে কোনও লাভ নাই, অথবা আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের বার্তা গ্রহণ করা যেমন নিষ্প্রয়োজন,—সেইরূপ কেবল ভক্তের ভগবানের কথা শুনিয়া, অভক্ত— বহির্মুখ—সংসার-পঙ্কে নিমজ্জমান জীবের প্রাণে কি-ই বা আশার সঞ্চার হইতে পারে। তিনি যেমন ভক্তের, তেমনি অভক্তের উপরেও তাঁহার কৃপার নিদর্শন দেখিতে পাইলে, তবেই শ্রীভগবানের মহিমাদি শ্রবণের সার্থকতা সকলের কাছেই হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তিনি যেমন ভক্তের ভগবান তেমনি অভক্তেরও ভগবান ?

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীভগবানের মহিমার পূর্ণতা কেবল "ভক্তের ভগবানে" নহে— তিনি অভক্তেরও ভগবান বলিয়া তাই তাঁহার এত মহিমা! ভক্ত ও অভক্ত উভয়েরই সহিত তাঁহার সমান সম্বন্ধ। তাহা যদি না হইত, তবে আমরা যেমন তাঁহার "ভক্তবৎসল" নাম শুনিতে পাই, সেইরূপ তাঁহার "অধমতারণ", "দীনশরণ," "পতিত পাবন," "অগতির গতি" নাম শুনিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের এইসব নাম, মাভৈঃ রবে অভক্ত— অগতি— পতিতকেও ভরসা দিয়া বলিতেছেন, "তিনি যেমন ভক্তের ভগবান তেমনি যে তিনি অভক্তেরও ভগবান!" ভক্তের ভক্তিতে তিনি একদিকে যেমন আনন্দিত, অভক্তের বহির্মুখতায়— দুর্দশায় তিনি অপর দিকে তেমনিই ব্যথিত। তাঁহার এই অনন্ত ব্যথাই— অনন্ত করুণারূপে নিত্যই প্রকাশ হইতেছে। হৃদয়ের একভাগে পূর্ণানন্দ ও অন্যভাগে পূর্ণ করুণা লইয়া যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন— তিনিই শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের স্বরূপ কেবল আনন্দময়ই নহে,— তিনি যেমন আনন্দময়, তেমনি করুণাময়।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,— "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ।" (৯।১৭) অতএব তিনিই জগন্নাথ, জগৎপিতা, জগন্মাতা,— এক হইয়াও তিনি-ই সব। — তিনি-ই বিশ্বরূপে প্রকাশ হইতেছেন। মাতৃ-অঙ্কে যেমন সকল সন্তান শুইয়া থাকে, তেমনি বিশ্বরূপ— বিশ্বজননী তিনি, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার কোল পাতা রহিয়াছে; আর সেই একই কোলে ভক্ত অভক্ত তাঁহার সকল সন্তানেরই স্থান।

জগতে যাহা কিছু সুন্দর— যাহা কিছু মধুর— যাহা কিছু মঙ্গলময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেরই কারণ, একমাত্র সেই অনাদির আদি— শ্রীগোবিন্দ। সকল আনন্দের— সকল মাধুর্যের— সকল কল্যাণের— সকল সৌন্দর্যের তিনিই সার— তিনিই মূল উৎস। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা-৫।১)

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর— স্বয়ং ভগবান্। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার শ্রীবিগ্রহ। তিনি অনাদি ও সকলের আদি। তিনি নিত্যই গোপালন করেন বলিয়া "গোবিন্দ" তাঁহার একটি নাম। তিনিই নিখিল কারণের কারণ।

তাহা হইলে জগতে যে আমরা জননীর করুণা, পিতার স্নেহ, রমণীর সৌন্দর্য, ফুলের সুবাস, সঙ্গীতের সুর, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, শিশুর সরলতা প্রভৃতি দেখিতে পাই, সে কাহারও নিজস্ব জিনিস নহে, — সে সকলেরই কারণ সেই অনন্ত করুণা— অনন্ত স্নেহ— অনন্ত সৌন্দর্য— অনন্ত সৌরভ— অনন্ত সুর— অনন্ত স্নিগ্ধতা— অনন্ত সরলতাদির একমাত্র নিলয়—শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার অফুরন্ত মাধুর্য-ভাণ্ডার হইতে একফোঁটা মাধুর্য গড়াইয়া আসিয়া, তাহা হইতেই বিশ্বের নিখিল মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়া, তাহারই প্রভাবে সারা জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার একবিন্দু করুণা লইয়া, আত্মহারা— বিশ্বব্যাপী মাতৃ-করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে,— যাঁহার একবিন্দু স্নেহ লইয়া বিশ্বব্যাপী পিতৃস্নেহের বিকাশ হইয়াছে, না জানি সেই শ্রীভগবানের স্নেহ করুণাদির সীমা কোথায়!

তাই বলিতেছি, তিনি যেমন ভক্তের ভগবান তেমনি অভক্তের ভগবান। তাঁহার অনন্ত কৃপা— অনন্ত স্নেহ ও করুণা হইতে একটি ধূলিকণাও বঞ্চিত নহে।

তবে কথা এই যে, ভক্ত তাঁহার সুস্থ সন্তান, আর অভক্ত বা বহির্মুখ জীব তাঁহার অসুস্থ সন্তান। সুস্থ ও অসুস্থের মধ্যে যে পার্থক্য ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে সেই ব্যবধান। জননীর দুইটি সন্তানের মধ্যে একটি সুস্থ ও অন্যটি অসুস্থ থাকিলে, মা যেমন তাঁহার রুগ্ন সন্তানটির

সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া অবধি, সুস্থ সন্তানের আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারেন না ; সুস্থ সন্তানকে কাছে বসাইয়া, রুগ্ন—বিকারগ্রস্ত সন্তানটিকে কোলে লইয়া জননী যেমন ব্যথিত হৃদয়ে — ছলছল নয়নে সেই রোগক্লিষ্ট— শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, সারা দিনরাত বসিয়া থাকেন, তাহার আরোগ্য লক্ষণ দেখিবার অপেক্ষায় , — সেইরূপ, অনন্ত করুণায় ভরা শ্রীভগবান তাঁহার ভক্ত সন্তানকে কাছে বসাইয়া, ভবরোগক্লিষ্ট— ত্রিতাপতপ্ত— দুর্দশাগ্রস্ত সন্তানকে কোলে লইয়া, আরোগ্যের চিহ্ন দেখিবার আশায়, সেইরূপ ব্যথিত হৃদয়েই তাহার মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন।

বিকারগ্রস্ত সন্তান যেমন বুঝিতে পারে না— সে তাহার জননীর স্নেহের অঙ্কে শুইয়া আছে ; মায়ের সুশীতল করপল্লব তাহার শীর্ণ মুখখানিকে দণ্ডে শতবার সস্নেহে স্পর্শ করিতেছে ; মায়ের ব্যথিত হৃদয়-ধোয়া বিগলিত অশ্রুবিন্দু—কতবার তাহার তপ্ত বুকের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে ; সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব শ্রীভগবানের কোলে থাকিলেও মনে করে, বুঝি কোন দেশান্তরে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে সে। দণ্ডে শতবার তাঁহার অমিয়মাখা সংস্পর্শ পাইয়াও তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনামাখা অশ্রুজলে কতবার পরিষিক্ত হইয়াও তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না আমরা। আমাদের রোগ এতই প্রবল !

মায়ের কোলে শোওয়া পীড়িত সন্তানের বিকারের কথা, বিকারের হাসি, বিকারের গান, তাহার বিকৃত মানসপটে যতই সুখের ছবি অঙ্কিত করুক না কেন, সে কথা— সে হাসি— সে গানে, জননীর প্রাণে যেমন আরও ব্যথা বাড়াইয়া দেয়,— সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের বিকারের হাসি, গান, কথা, সবই শ্রীভগবানের প্রাণে বেদনা দিয়া থাকে। ভক্ত, নীরোগ সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রাণে আনন্দধারা সিঞ্চন করেন, আর অভক্ত, জননীর রুগ্ন সন্তানের ন্যায়

তাঁহাকে বেদনায় ভরাইয়া দেয়। ভক্ত ও অভক্তের এই পার্থক্য।

রুগ্ন সন্তান কর্তৃক জননী বেদনা পান বলিয়া তাহাকে যেমন পরিত্যাগ করেন না বরং তাহার দুঃখে দুঃখী—তাহার ব্যথায় ব্যথী হইয়া— তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকেন শুধু দেখিবার জন্য,—প্রলাপের হাসির পরিবর্তে সেই মুখে যথার্থ আরোগ্যের হাসি কতক্ষণে ফুটিয়া উঠিবে; সেই বিকারের কথার পরিবর্তে, মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া—মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া—অনেক দিনের পর যথার্থ একবার 'মা' বলিয়া ডাকা—কতক্ষণে শুনিতে পাইবেন বলিয়া; সেইরূপ বহির্মুখ জীব, তাহার প্রলাপের হাসি-কান্নায়, তাহার প্রলাপের কথা ও গানে শ্রীভগবানের প্রাণে অবিরত ব্যথা দিলেও, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না; বরং তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তের বিকার কাটিয়া গিয়া তাহার মুখ হইতে "আমি তোমারই" এই নির্ভুল কথাটি শুনিবার জন্য তাহার মুখ চাহিয়া চিরদিন অপেক্ষা করিয়া থাকেন। যখনই জীব, শ্রীভগবানের সহিত তার নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত হইতে সে আর অভক্ত বা অসুস্থ নহে; সুস্থের সকল অধিকার লাভ করিয়া ভক্ত হইয়া, সে তখন হইতে সকল ভয়ের অতীত হইয়া যায়। অনেক দিনের বিকার-ঘোর কাটিয়া যাইবার পর, তাঁহাকে চেনা—তাঁহার যথার্থ সম্বন্ধ জানা প্রথম ডাকটি শুনিবার জন্য শ্রীভগবান যে কতই ব্যাকুল, তাঁহার নিজ বাক্যই তাহার প্রমাণ দিতেছে;—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

—(রামায়ণে লঙ্কা ১৮।৩৩)।

শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন— অবিদ্যার ঘনান্ধকারে আমায় ভুলিয়া যাওয়া জীব, যেদিন প্রথম আমায় যথার্থরূপে চিনিতে পারিয়া, "আমি তোমারই"— এই কথা বলিয়া একবারও আমার শরণাপন্ন হইবে, সে তখন হইতেই সকল ভয়ের অতীত হইয়া যাইবে।

অভক্ত বহির্মুখ জীবকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানের যে কতই ব্যাকুলতা, তাহা যদি আমরা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতাম, তবে তাঁহা হইতে বিমুখ— বিষয়াসক্ত হইয়া তাঁহার প্রাণে চিরদিন এমন করিয়া আর ব্যথা দিতাম না।

(২)

পথহারা সন্তানের সন্ধান করিবার জন্য পিতা যেমন ঘরে-ফেরা সন্তানকে পাঠাইয়া দেন, তেমনি অনন্ত পিতৃস্নেহে ভরা শ্রীভগবান, তাঁহার গৃহাগত ভক্ত সন্তানকে পাঠাইয়া দেন,—সংসার-পথে পথহারা সন্তানকে পথ দেখাইয়া ঘরে লইয়া আসিবার জন্য। ভাইকে পথে হারাইয়া, আর এক ভাই যদি আপন ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে এক ছেলের ঘরে আসার আনন্দে পিতার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিলেও হারানো ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া, সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণে যেমন একটা গোপন ব্যথা জাগাইয়া দেয়; সেইরূপ গৃহাগত, স্বপদপ্রাপ্ত, অনন্ত ভক্তের আনন্দে শ্রীভগবান যেমন আনন্দিত, গৃহহারা বিপদগ্রস্ত অনন্ত জীবের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া তিনি তেমনিই বিষাদিত! শুধু বিষাদিতই নহেন,—পথভ্রান্তকে সুপথে ফিরাইবার জন্য,— গৃহহারাকে ঘরে আনিবার জন্য তাঁহার এতই ব্যাকুলতা যে, অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টার ফলে বিপদ-সঙ্কুল সুদীর্ঘ সংসার-পথ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে— এমন স্বপদপ্রাপ্ত প্রিয়তম তাঁহার ভক্তকেও সেই চিদানন্দভরা দেশ হইতে আবার বিপদের দেশে পাঠাইয়া দেন— শুধু মায়াপদাহত, ত্রিতাপসন্তপ্ত, সংসার-ধূলি-ধূসরিত, ব্যথিত ও বহির্মুখ অভক্তের চোখের জলে ভাসা মলিন মুখ মুছাইয়া, তাহাকে হাতে ধরিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। তাই সাধু-ভক্ত, সংসারের পথে পথে পথহারা ভাইদের পথ দেখাইয়া বেড়ান। ঘন-ঘটাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, ভাদ্রের ভরা নদীর গর্জন ও তুফানের ভিতর, জাহাজের

"সার্চ্চলাইট" যেমন তীব্রদৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুর মত চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, সেইরূপ, ভয়-সঙ্কুল ভবার্ণবে নিমজ্জমান জীব উদ্ধার করিবার জন্য, সাধু-ভক্তের কৃপাদৃষ্টি জাহাজের "সার্চ্চলাইটের" (অনুসন্ধানী আলোকের ন্যায়) মত সতত অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। সে কৃপার আলোক একবার যাহার উপর পড়িবে,— ভব-জলধিগর্ভে তাহার আর ভয় নাই। শ্রীভগবান, তাঁহার ভক্ত সন্তানদের পাঠাইয়া, ভব-ভয়াতুর অভক্ত সন্তানদের এই ভাবে উদ্ধার করিতেছেন।

ভক্ত শ্রীভগবানের সুসন্তান— তাঁহার বুকে করিয়া রাখিবার বস্তু। এমন প্রিয়বস্তুকেও পাঠাইতে হইতেছে, তাঁহার পথভ্রান্ত—বহির্ম্মুখ সন্তানদের উদ্ধারের নিমিত্ত। শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্তই অভক্ত-জনদের উদ্ধার করিতে আসিয়া, কত সময়ে তাঁহাদের কত নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করিতে হয়, সেই অভক্তজনদের হাতে। অভক্ত, ভগবানের কু-সন্তান। তাই অনেক সময় তাহারা, তাহাদেরই উদ্ধারের জন্য পরম করুণাবশে সমাগত সেই মহৎগণের উপরও নিতান্ত কুমতিগ্রস্ত হইয়া অপমান ও অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। সে অপরাধ এতই উগ্র ও অচিন্তনীয় যে, এমন অপার করুণার পাথার হইয়াও শ্রীভগবান তাহা ক্ষমা করেন না। যে-ভগবান, করুণায় কুসুম অপেক্ষাও কোমল,— মহদতিক্রমরূপ মহাপরাধী জীবের পক্ষে আবার তিনিই বজ্রাদপি কঠোর! বদ্ধজীবের এত বড় অকৃতজ্ঞতা, তিনি সহ্যই-বা করিবেন কেমন করিয়া? তাই তিনি ক্ষমার অসীম সাগর হইলেও তাঁহার কাছে মহদপরাধীর ক্ষমা নাই। এইস্থলে ক্ষমা গুণে নিজেকে ছোট করিয়া তাঁহার অভিন্নাত্মা ভক্তের দ্বারা সেই ক্ষমা গুণের অসীম মহিমার ক্ষুণ্ণতাকে পূর্ণ করিয়া,—তাহাকে বাড়াইয়া, শ্রীভগবান নিজে বড়-ই হইয়া আছেন। অভক্ত কর্তৃক সাধু-ভক্তগণ অবমানিত উৎপীড়িত হইলেও তাঁহারা মোহাচ্ছন্ন জীবের প্রতি কৃপাবিস্তারে পরাঙ্মুখ হয়েন না। এত বড় অপরাধও অম্লান মুখে ক্ষমা করিয়া আমাদের পরম দয়াল

অবতার,— অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায়, তাহাদের অভয় দিয়া ডাকিয়া বলেন,—"মেরেছ কলসীর কাণা। তা' বলে কি প্রেম দিব না।"

সাধু-ভক্তগণ যে এত বড় ক্ষমার মূর্তি হইতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ,—অভক্তের দুর্দশার জন্য শ্রীভগবানের প্রাণে যে ব্যথা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সে ব্যথার তুলনায় তাঁহাদের প্রতি অভক্তের অত্যাচার ব্যথা, অতি তুচ্ছ! একটি হারানো ভাইকে বিশ্বপিতার অভয় পদপ্রান্তে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে, শ্রীভগবানের মুখের হাসিতে যে আনন্দের রেখাটুকু ফুটিয়া উঠিবে,— সেই মৃদু স্মিত জ্যোৎস্নার সুখস্পর্শে, তাঁহাদের শতধারে রক্তবহা ক্ষতের সব জ্বালা জুড়াইয়া শীতল হইয়া যায়।

শ্রীভগবান ভক্তেরও যেমন অভক্তেরও তেমনি। কেবল ব্যবধান এই যে, তিনি ভক্তের ভক্তিতে আনন্দিত, আর অভক্তের বহির্মুখতায়— দুর্দশায় ব্যথিত। বদ্ধ জীব উদ্ধারের জন্য তাঁহার বিশ্রামহীন ব্যাকুলতার কথা ভাবিলে, চির কৃতজ্ঞতা ভরে কাহার না হৃদয় সেই রাঙ্গা চরণ দুইখানির উপর লুটাইয়া পড়ে?

বিপন্ন সন্তানকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য ঘরে ফেরা সন্তানকেও পাঠাইয়া দিয়া পিতা যখন দেখেন, সে তাহার গৃহহারা ভাইকে ফেরাইতে না পারিয়া একাই বিষন্নমুখে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন আর অপেক্ষা না করিয়া কখন একা, কখন বা ঘরের ছেলেকে সঙ্গে লইয়া— নিজেই যেমন তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন, সেইরূপ শ্রীভগবানও কখনও একা, কখন বা সপার্ষদ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে ধরাধামে নামিয়া আসেন—বিপন্ন-বহির্মুখ-পথহারা-জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য। বদ্ধজীবের প্রতি আত্মহারা স্নেহ ও করুণার উচ্ছ্বাস লইয়া তাঁহার এই যে বারবার আসা-যাওয়া, ইহারই মধ্যে যে অভক্তের জন্য তাঁহার কত বড় মমতা ও ব্যথার পরিচয় লুকান রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার কোন

ভাষা নাহি! শ্রীভগবানের হৃদয়ে, আনন্দের অন্তরালে অবিশ্রান্ত এই লুকান ব্যথার কথা, যদি আমরা বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে পারি, তবে বুঝিতে বাকী থাকে না,— ভগবানের মহিমা ভক্তের জন্য শুধুই তাঁহার আনন্দের হাসিতে নহে— অভক্তের জন্য তাঁহার ব্যথার অশ্রুপাতে! যতদিন পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র কীটও এই মায়ার মরুভূমে পড়িয়া থাকিবে, ততদিন শ্রীভগবানের ব্যাকুলতার বিরাম থাকিবে না। ততদিন তাঁহার আসা-যাওয়া চলিবেই চলিবে। পতিত বিশ্ব-জীবের জন্য বিশ্বনাথের এই ব্যথার সংবাদ,— ইহারই অপর নাম "অবতার-বাদ।"

দর্শনাদি লালসায় উৎকণ্ঠিত সাধক-ভক্তগণের আনন্দের জন্য ও অবিদ্যাবিমোহিত— কুপথগত অভক্ত বহির্মুখদের সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, শ্রীভগবান সময়ে সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তির বশ। তাই ভক্তের নিকট তিনি মুক্ত হইয়াও বদ্ধ— অজিত হইয়াও জিত হইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তের জন্য তাঁহার আসা ও অভক্তের জন্য তাঁহার আসা— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভক্তের ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, আর অনন্যগতি অভক্তের দুর্দশা দেখিয়া তিনি তাঁহার উদ্ধারের জন্য কৃপায় নিজেই আসিয়া থাকেন। "আনা" ও "আসার" মধ্যে যে প্রভেদ, ভক্ত ও অভক্তের নিকট শ্রীভগবানের প্রকটের মধ্যেও সেই ভেদ আছে। শ্রীভগবান যে গীতায় বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(— শ্রীগীতা, ৪।৮)

অর্থাৎ— সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

এই দুষ্কৃত বা অভক্ত— বহির্মুখগণের বিনাশের কথা শুনিয়া,

ভগবানকে ভক্তের বন্ধু ও অভক্তের শত্রু মনে করা একান্তই ভুল। সন্তানের প্রতি পিতামাতার পালন ও তাড়ন যেমন একই স্নেহপ্রসূত, ইহাও ঠিক সেইরূপ। শ্রীভগবান দুষ্টকে বিনাশ করেন না, তিনি দোষকে বিনষ্ট করিয়া দুষ্টকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন। অভক্তকে উদ্ধারের জন্য সমস্ত উপায় যখন ব্যর্থ হইয়া যায়,— সর্পদষ্ট অঙ্গকে বিনষ্ট করিয়াও জীবন রক্ষার ন্যায়,— শ্রীভগবান অভক্তের অবিদ্যাকৃত, বহু-দোষদুষ্ট অসংশোধনীয় স্থূলাদি দেহ বিনষ্ট করিয়াও তাহার উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন। এইরূপে অভক্ত উদ্ধার-কার্যের জন্য অনেক সময় তাঁহাকেও বড় কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না! একটি রাবণের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যদি তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাকেও বুক পাতিয়া শক্তিশেল লইতে হয়, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্যাকেও পরগৃহে বন্দিনী থাকিতে হয়, তাঁহার প্রাণসম ভক্তবৃন্দকেও অশেষ নির্যাতন সহ্য করিতে হয়,— তিনি এ-ত্যাগ স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহেন! একটি বংশের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যদি নিজ জনক-জননীকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, কঠিন কারাগৃহে বহুদিন অতিবাহিত করিতেও হয়,— পতিতোদ্ধারে বদ্ধপরিকর ভগবানের পক্ষে এত বড় ত্যাগস্বীকারও অধিক বলিয়া মনে হয় না!— অভক্তের প্রতি এতই আশ্চর্য তাঁহার কৃপা! অবিদ্যার মোহে যাহারা দেহকেই "জীব" মনে করে, দুষ্ট-কর্মার্জিত অসাধু দেহের বিনাশ— তাহাদেরই বিবেচনায় জীবের বিনাশ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। জীব দেহ নহে— দেহী। আর সেই "দেহী নিত্য-মবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।" (শ্রীগীতা, ২।৩০)। দেহী বা জীব সর্বদা সকল দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন; অতএব কে-ই-বা কাহাকে বিনাশ করিবে?

অন্বেষণ-পরায়ণ পিতা, যেমন পথভ্রষ্ট— অরণ্যপ্রবৃষ্ট ভীষণ-ভুজঙ্গ-বেষ্টিত সন্তানকে দেখিয়া, অস্ত্রাঘাতে সেই দুষ্ট সর্পকে বিনষ্ট করিয়া বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভগবান যখন

দেখেন, জীব ঘোর অবিদ্যা-অরণ্যে পাপ-দোষরূপ মহানাগ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নিজে আসিয়া, পাপকে বিনষ্ট করিয়া পাপীকে উদ্ধার করেন। দোষমুক্ত সেই জীব, তখন আর দুষ্ট থাকে না; শুদ্ধ জীবরূপে তাঁহার শুদ্ধ সন্তানদের অধিকার,— সেও তখন হইতে লাভ করিয়া থাকে।

পতিতোদ্ধারের জন্য পতিত-পাবনের যে কতই ব্যাকুলতা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। তিনি "অবতার" রূপে আসিয়া ধর্ম-সংস্থাপনাদি দ্বারা জীবকে পরিশুদ্ধ করেন; আর "অবতারী" রূপে আসিয়া সর্বসাধ্যসার এমন যে প্রেম,— সেই প্রেমের সার, তাহাই দান করিয়া অপূর্ণ জীবকে পূর্ণ করিয়া দেন!

(৩)

পরম মঙ্গলময় জগন্নাথের জগতে, মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের কিছুই থাকিতে পারে না। তবে যে আমরা এই জগতে দুঃখ, দৈন্য, শোক, তাপ, ভয়, ভাবনাদি দেখিতে পাই, সে কেবল আমাদের মায়ান্ধ চোখের দেখিবার দোষে— সে কেবল আমাদের মায়ামুগ্ধ মনের বুঝিবার ভুলে। রোগী ও নীরোগের পথ্যাদির পার্থক্য, যদি উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জগতের সুখ ও দুঃখের পার্থক্যের মধ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কল্পনা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? দুঃখে, দৈন্যে, রোগে, শোকে, আপদে, বিপদে অভিভূত হইয়া লোকে মনে করে, বুঝি সে অভক্ত— বহির্মুখ বলিয়া তাই তাহার উপর ভগবানের এই অভিশাপ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অভিশাপ নহে,—ইহা তাঁহার আশীর্বাদ।

জননী যেমন তাঁহার সুস্থ সন্তানটিকে দুধভাত দিয়া, অসুস্থ সন্তানটিকে উপবাস দেওয়ান; প্রয়োজন হইলে তাহারও উপর হয়তো

আবার কটু, তিক্ত, কষায় রসবিশিষ্ট পাচনাদি উৎকট ঔষধ তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া থাকেন ; একই স্নেহভরা হৃদয়ের এই দুই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে— একই স্নেহমাখা হাতের এই দুই প্রকার দানের মধ্যে যে পক্ষপাত দোষের আবিষ্কার করে, সেই-ই যথার্থ দুর্ভাগ্য ! দুগ্ধান্নে ও পাচনে, বাহ্য দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিলেও, ইহা যে জননীর স্নেহভরা হৃদয়ের পরম মঙ্গলময় ব্যবস্থা-প্রসূত, সে কথা ভাবিয়া দেখিলে তখন দুগ্ধান্নের ও পাচনের মধ্যে আর কোন পৃথক আস্বাদন পাওয়া যায় না। তখন যেমন জননীর করুণা-রসের স্পর্শ পাইয়া দুই-ই এক রস হইয়া যায়, সেইরূপ জগতের সুখ-দুঃখকে শ্রীভগবানের একই করুণার কল্যাণময় ব্যবস্থা বলিয়া যতক্ষণ বুঝিতে না পারিব আমরা, ততক্ষণ আমাদের ভবরোগে ভুগিতেই হইবে— ততক্ষণ কটু-তিক্ত ঔষধের আস্বাদন লইতেই হইবে।

জীবের প্রতি দুঃখরূপ ঔষধের বিধান করিতে, ভগবানকে যে কত বেশী দুঃখিত হইতে হয়, সে কথা বুঝিতে পারিলে তখন আর নিজ দুঃখের জন্য লেশমাত্রও দুঃখ বোধ হয় না। রুগ্ন সন্তানকে তাহার আরোগ্যের জন্য উপবাসী রাখিতে হইলে, তাহার জন্য জননীকে যে কতখানি ব্যথা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে হয়, যখন পুত্র সে কথা জানিতে পারে, তখন তাহার ব্যাধিযন্ত্রণা আর মনে থাকে না, তিক্ত ঔষধের বিস্বাদের কথা প্রাণে জাগে না,— তখন কেবল নিমেষহীন নয়নে সেই আত্মহারা— স্নেহব্যাকুল— পাগলপারা মায়ের করুণাময়ী মূর্তিখানির দিকে চাহিয়া, শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে, —"জননি গো ! তোর স্নেহে পালিত যে, তার আবার দুঃখ কোথায় ? পুত্রস্নেহে আত্মহারা— পাগলপারা তুই মা,— আমার দুঃখে তোর প্রাণে যে ব্যথা জেগেছে— সেই ব্যথাই এখন আমায় ব্যথা দিচ্ছে ! মা গো !— এ অকৃতী সন্তানের দুঃখ ঘুচাতে তোর বেদনা ধোয়া চোখের জল শীঘ্র মুছে ফ্যাল্ মা !"

সেইরূপ সংসারের দুঃখ ও বিপদের মধ্যে পড়িয়া যে দিন জীব, নিজ দুঃখের কথা না ভাবিয়া, তাহার প্রতি, কল্যাণের এই কঠোর ব্যবস্থা করিবার জন্য অনন্ত মাতৃস্নেহে ভরা শ্রীভগবানকে যে ইহা হইতেও কত অধিক ব্যথা লইতে হইয়াছে— এই কথা মনে করিয়া, তাহারই জন্য ব্যথিত হইবে, সেই দিন হইতে তাহার সকল দুঃখ, বিপদ,— সকল ভয়, ভাবনার শেষ হইয়া, পরমানন্দ আস্বাদনের অধিকার লাভ হইবে। ভগবান যেমন বদ্ধজীবের দুঃখে নিত্যই ব্যথিত, সেইরূপ জীব যদি নিজের দুঃখ ভুলিয়া, শ্রীভগবানের ব্যথার জন্য ব্যথিত হয়, তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়, তাহারই নাম হয় "প্রেম"। এই ভাবে দুঃখ দিয়া, চিরদুঃখের হাত হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া লইতে শ্রীভগবান নিত্যই ব্যাকুল! যতক্ষণ না জীবের এই প্রেমভাবের উদয় হয়,— ততক্ষণ তাঁহারও ব্যাকুলতার বিরাম নাই!

অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম, উভয়ই অনর্থ-স্বরূপ; উভয়ই সংসারচক্রে সংবদ্ধ হইবার সুদৃঢ় রজ্জু। সুকৃতির ফলে, অনিত্য ও অসার সাংসারিক সুখভোগ হইয়া থাকে। এই সুখভোগ প্রায়ই আবার কুপথ্যের মত জীবকে দুষ্কৃতিরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করাইয়া দেয়। দুষ্কৃতির ফলে, জীবের অবাঞ্ছনীয় বিবিধ সংসার-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। ভবের সুখ ও দুঃখে যতক্ষণ ভাল ও মন্দরূপ পৃথক বুদ্ধি থাকিবে,— যতদিন আমরা সুখে আসক্ত ও দুঃখে বিরক্ত হইব,— সুখে প্রলুব্ধ ও দুঃখে সংক্ষুব্ধ হইব,— ততদিন জন্ম ও মৃত্যুর মহা আবর্তে আমাদের ঘুরপাক খাইতেই হইবে। আর যে দিন দুঃখকে, আতুর সন্তানের হিতার্থে জননীর তিক্ত ঔষধ প্রদানের ন্যায়, জগজ্জননীর করুণ হৃদয়ের ব্যথার দান বলিয়া— সুখ অপেক্ষা মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে পারিব, সে দিন হইতে আর কোন দুঃখের সহিত কোনও দিন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না।

জননী তাঁহার পীড়িত সন্তানের নিরাময়তার জন্য প্রয়োজন

হইলে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াও, নির্বোধ পুত্রের কান্নাকাটিতে সব সময় যেমন কঠোর হইয়া থাকিতে পারেন না ; তাই যেমন করুণায় আপ্লুত হইয়া কখন কখন একটু-আধটু কুপথ্যও "লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়" এই স্নেহ-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া, তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারেন না তিনি,— সেইরূপ যিনি অনন্ত মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ,— সেই শ্রীভগবানও জীবের দুঃখের ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, অপার করুণায় বিগলিত হইয়া, সময়ে সময়ে আমাদিগের ন্যায় রুগ্ন সন্তানকেও কুপথ্য দিয়া থাকেন। মায়ের মঙ্গল হস্তের স্পর্শ পাইয়া কুপথ্য যেমন সুপথ্য হইয়া যায়,— সেইরূপ জগজ্জননীর স্বহস্তের দেওয়া সেইরূপ স্নেহভরা কুপথ্য— ইহা কর্মবন্ধনের সৃষ্টি না করিয়া, পরম সুপথ্যের যাহা সুফল,— সেই তাঁহাতে বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় করাইয়া দেয়। ঔষধ ও উপবাসাদির ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, নীরবে ভোগ করাই আমাদের আরোগ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, দুর্বল জীব আমরা— যখন রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অপমানে, অত্যাচারে, বিপদে ও অবসাদে আকুল হইয়া,— "হা কৃষ্ণ ! হা গোবিন্দ ! হা মহা-প্রভো ! হা বিপদভঞ্জন ! হা জগদীশ ! রক্ষা কর !" বলিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য কাঁদিয়া উঠি, তখনি "মায়ের লুকিয়ে দেওয়া কুপথ্যের মত", সাময়িক সব কর্মফল সরাইয়া দিয়া শ্রীভগবানের নিকট হইতে, "প্রতিকার" আসিয়া পৌঁছায় ! এই প্রতিকার, তাঁহার স্বহস্তের দান ; আর সংসার-দুঃখ ভোগ,— ইহা জীবের স্বকৃত অপরাধের ফল। শ্রীভগবান কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন মাত্র ; কিন্তু জীবের শুভাশুভ কর্মের জন্য তিনি দায়ী নহেন, জীব নিজেই দায়ী।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ

স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥

—(অধ্যাত্মরামায়ণ অযোঃ কাঃ ৬ সর্গ-৬)

তাৎপর্যার্থ— সুখ ও দুঃখের কেহই দাতা নয়— অপরে দেয় এরূপ মনে করাই কুবুদ্ধির পরিচায়ক। ইহা পুরুষকারের দ্বারা অর্জিত— ইহাও বৃথাভিমান। মনুষ্যগণ স্বকর্মসূত্রেই আবদ্ধ— অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল সকলই সুখ ও দুঃখরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। তথাপি তাহার উদ্ধারের জন্য ভগবান তাহাকে কৃপা করিতে সর্বদাই উন্মুখ! নিজের দোষে পুত্র অসুখে ভুগিতেছে বলিয়া মা কখন উদাসীন থাকিতে পারেন কি? পারেন না বলিয়াই, অভক্তেরও ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত হইবার কোন কারণ হয় নাই।

(৪)

আগুনে পরিদগ্ধ না হইলে সুবর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। যতক্ষণ মলিনতা থাকে, ততক্ষণ সুবর্ণকে অগ্নিদহন সহ্য করিতেই হয়। উত্তাপ যতই তীব্রতর হইয়া উঠে, জানিতে হইবে, চিরতরে শীতল হইয়া থাকিবার দিন ততই নিকটতর। যতদিন জীব, সংসার-দুঃখের জ্বালায় ভীত হইয়া, সংসার-সুখের শীতলতাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, ততদিন তাহার পক্ষে মায়া, পিশাচীর মতই অমঙ্গলকারিণী; আর যখন এই ভব-সংসারকে, চিদানন্দের দেশে যাইবার সাধনাগার বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন মায়া আর দুঃখ দিবে না, বরং পরম হিতৈষিণীর ন্যায় সেই চিন্ময়-ধামের পথ তাহাকে দেখাইয়া দিবেন। সেই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে, মায়া তাহাকে দুঃখ দিয়া দগ্ধ করে নাই; স্বর্ণকার যেমন অগ্নি-দহনাদির দ্বারা মলকে পরিদগ্ধ করিয়া স্বর্ণকে নির্মল করিয়া দেয়, সেইরূপ মায়াও তাহার মলিনতা দগ্ধ করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সাজান ঘরে স্নিগ্ধ-নির্মল স্ফটিকাধারের মধ্যে, হেমবিজড়িত রত্নালঙ্কারসকল সযত্নে সাজাইয়া রাখিবার পূর্বে যেমন তাহাদের

নির্মাণ-আগার হইতে অগ্নির পোড় ও হাতুড়ির আঘাত সহ্য করিয়া আসিবার প্রয়োজন হয়, তেমনি পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানের এই মঙ্গলময় "মায়া" আগার। ইহা পিশাচীর নৃত্যভূমি বা স্বপ্নবৎ অলীক নহে, ইহা 'ভক্ত'রূপ রত্নাভরণ প্রস্তুতের কারখানা। এখানকার অগ্নির জ্বালা, হাতুড়ির আঘাত, অস্ত্রের বিদারণ, যন্ত্রের নিষ্পেষণ— যে জীব তাহার পরিশুদ্ধি ও পরিনির্মাণের উপকরণ বলিয়া হাসিমুখে বুকের উপর টানিয়া লইতে পারে, সেই অমল উপাদানেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গসেবার উপযুক্ত ভক্তাভরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার সংসারাগারে উত্তাপ ও আঘাত হইতে তাঁহার চরণের নূপুর, হস্তের বলয়, মস্তকের চূড়া ও বক্ষের রত্নহারের উৎপত্তি হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব-বিশিষ্ট সাধক-ভক্তগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে উক্ত অলঙ্কার সকলের ন্যায়ই শ্রীভগবানের সেবা করিয়া চিরধন্য হইয়া থাকেন।

যে জীব ভগবৎসেবায় লাগিবে, তাহাকে সংসারের শত শত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে,— তাহার জন্য মুখ ভার করিলে চলিবে না। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিপদকে সম্পদ অপেক্ষাও শুভ বলিয়া মনে করা চাই। যতক্ষণ তাহা না পারিব আমরা,— ততক্ষণ বিপদ, বিপদ হইয়াই দেখা দিবে। যেমন বড় ভাই, রাক্ষসের মুখোস পরিয়া, তাহার ছোট ভাই দুষ্টামী করিলে তাহাকে ভয় দেখায়। ছোট ভাই যতক্ষণ মনে করে, সেই একই বাড়ীতে তাহাকে আদর-করা— কোলে-নেওয়া— চুমু-খাওয়া— তাহার একটি স্নেহের দাদা আছে, আর আছে একটা লম্বা নাকওয়ালা ভীষণাকার রাক্ষস, যেটা তাহাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বদা অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যে পর্যন্ত ছোটভাইয়ের এই দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ অর্থাৎ দাদা ও রাক্ষসে পার্থক্য-বুদ্ধি,— সেই পর্যন্তই তাহার ভয়। কিন্তু যখন কোন কৌশলে সে বুঝিয়া ফেলে, সেই ভয়ঙ্কর মুখটার পিছনেই, তাহার

স্নেহের দাদার হাসিভরা মুখখানি লুকান রহিয়াছে,— তাহার সেই স্নেহের দাদাটিরই ইহা একটা সাজা রূপ, তখন হইতে মুখোসটাকে আর ত সে ভয় করেই না, বরং দেখিলে আমোদ আরও বাড়িয়া যায়; তখন দাদার মুখের মুখোসটি টানিয়া খুলিয়া লইবার জন্য হাসির ফোয়ারার সঙ্গে দুই ভায়ের মধ্যে যেন একটা মল্লযুদ্ধ বাধিয়া ওঠে। সেই প্রকার মঙ্গলময় শ্রীভগবানের জগতে দুঃখ বা ভয়ের বিষয় যাহা কিছু দেখি আমরা, সেইগুলি মঙ্গলের মুখে অমঙ্গলের মুখোস মাত্র। এই রহস্যটি ঠিক বুঝিতে পারিব যেদিন, সেদিন হইতে আমাদের আর কোন ভয় থাকিবে না; বরং দুঃখ বা বিপদের তরঙ্গে আরও আমোদ বাড়িয়া উঠিবে। রজনীর অন্ধকার যতই ঘনতর হইতে থাকে, বালারুণচ্ছটার প্রীতিসম্ভাষণ ততই সন্নিকট বুঝিতে হয়; ঘোর কৃষ্ণ-মেঘজাল যতই বেশী জমাট বাঁধিয়া ওঠে, অত্যুজ্জ্বল সৌদামিনীর বিকাশ-সম্ভাবনা সেখানে ততই অধিক হইয়া থাকে। অতএব সংসারের সকল নিগ্রহ যতই অধিকতররূপে প্রাপ্ত হইব আমরা— যদি ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া তাহাকে প্রসন্নচিত্তে— হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারি, তবে যথার্থ সুখের আলোক আমাদের খুবই নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রথম প্রকাশ ঃ সাধনা (মাসিক পত্রিকা) ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৩৫ ও ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৫ সাল।

——

ভক্তের ভগবান

'ভক্তের ভগবান' কথাটি জগতে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এই কথাটি শ্রবণ করিয়া অনেকেরই এইরূপ মনে করিবার অবসর ঘটে যে ভগবান, কেবল ভক্তেরই পালক ও পোষক— ভক্তেরই সংরক্ষক; ভক্তজনের সঙ্গেই তাঁহার যাহা কিছু সম্বন্ধ; তদ্ভিন্ন অপর বহির্মুখ জীব-সাধারণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তিনি যখন ভক্ত ভিন্ন অপরের পোষক, পালক বা রক্ষক নহেন, তখন তাঁহার বিষয় জন-সাধারণের উদাসীন ও অপেক্ষাশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক— ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা যে নিতান্তই ভুল, তাহা আমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। শ্রীভগবান যে কেবল ভক্তেরই প্রতিপালক তাহা নহে, তিনি তাঁহার ভক্ত, অভক্ত— নিখিল জীব-সমুদয়সহ বিশ্ব-সংসারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারণ পালন ও সংরক্ষণ করিতেছেন। গীতায় তিনি শ্রীমুখে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন;—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।"

(শ্রীগীতা ৯।১৭)

অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা। এই কথা তিনি চরাচর জগতের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,— কেবল ভক্তের সম্বন্ধে নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব জননী যেমন ভাল মন্দ সকল সন্তানকেই একই স্নেহ দিয়া প্রতিপালন করেন,— জগতের মাতা, পিতা, ধাতা— একাধারে সমস্তই তিনি, তাই লৌকিক জননী হইতেও বহু সন্তর্পণে ও সস্নেহে তিনি সমস্ত জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন।

তবে, বহির্মুখ জন-সাধারণ হইতে ভক্তের পার্থক্য এই যে, জাগ্রত

ব্যক্তি মহারত্ন পাইলে যেমন সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করে, কিন্তু নিদ্রিত ভিখারীর করতলে মহারত্ন রাখিয়া দিলেও, অনুপলব্ধি বশতঃ সে যেমন চির দরিদ্রই থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন কৃপা-প্রবাহের ভিতর সমস্তই নিমজ্জিত থাকিলেও, ভক্ত ভিন্ন অপরের নিকট তাহার অনুভূতি থাকে না,— ভক্তের সহিত অভক্ত বা বহির্ম্মুখ জন-সাধারণের এই প্রভেদ। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন কৃপাদৃষ্টি ও শুভ সঙ্কল্প হইতেই— কেবল জীব-জগৎ নহে,— জড়জগৎও পালিত ও রক্ষিত হইতেছে। সেই কৃপা-ধারার ক্ষণিক বিচ্ছেদে কোন কিছুরই সত্তা থাকে না।

সাধারণতঃ আমাদের হাট, বাজার, ব্যবসা, বাণিজ্য, ঘর, সংসার,— এক কথায় লৌকিক কোন ব্যাপারই ভগবানের অভাবে অচল থাকিতে দেখা যায় না বলিয়াই, জগতের সংরক্ষক ও পরিচালক-রূপ তাঁহার মহান সত্তার কোনও অনুভূতি জীব-সাধারণের নাই। তাই সাধারণতঃ আমরা মনে করি জগৎ বুঝি আমাদেরই সামর্থ্যে— বড় জোর স্বাভাবিক নিয়মে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু সকল শক্তির পিছনে কেবল সৃজন নহে, যদি তাঁহার মঙ্গলময় পালন শক্তি না থাকিত, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের কিছুই থাকিত না ; ইহা ধারণা করিবার মত সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। নেত্ররোগাদি-জনিত চক্ষুদোষ ঘটিলে তখন দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং নির্দোষ চক্ষুকেই দৃষ্টি-শক্তির কারণ ভিন্ন, তাহার উপর আর কোন কারণের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জনসাধারণ অনভিজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, সূর্যই দৃষ্টিশক্তির মূল কারণ ; ("সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ— ।"— শ্রুতিঃ) সূর্য না থাকিলে সদোষ ও নির্দোষ সকল নেত্রকেই যে দৃষ্টিহীন হইয়া থাকিতে হইত, একথা সকলের বুঝিবার অধিকার না থাকিলেও যেমন ইহা সত্য, তেমনি স্থূল দৃষ্টিতে জগৎ আমরাই চালাইতেছি কিম্বা আর

একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক নিয়মেই জগৎ চলিতেছে বলিয়া বোধ হইলেও, কিন্তু ভক্তেরই শুদ্ধদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,— জগতের মূলে জগন্নাথের নিরবচ্ছিন্ন কৃপাপ্রবাহ আছে বলিয়াই জগৎ আছে, নচেৎ মুহূর্তকালও জগতের সত্তা থাকিত না,— ইহা সুনিশ্চয়।

বাহ্যদৃষ্টিতে, সূত্র ভিন্ন মণিহারের মণিসকলকেই দেখা যাইলেও যেমন সূত্র ভিন্ন মণিসকল বিধৃত থাকিতে পারে না, তেমনি বাহ্যতঃ জগতের কোথাও শ্রীভগবানকে দেখা না যাইলেও জগতের মূলে, অভ্যন্তরে— সর্বত্রই সূত্রাত্মারূপে ভগবানের সত্তা— ভগবৎ কৃপা না থাকিলে জগতের কিছুই থাকে না ; ইহা ভক্তই অনুভব করিতে পারেন, — অন্যে পারে না,— ভক্তে ও ভক্তিহীন জনসাধারণে এই পার্থক্য।

যদিও স্বয়ং-ভগবদ্রূপে— শ্রীভগবান নিত্যই কেবল লীলাবিলাস-পরায়ণ, তথাপি নিজ সর্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়তা নিবন্ধন — সেই একই তিনি, শ্রীনারায়ণাদি তদেকাত্মস্বরূপে— বহু প্রকাশভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া অশেষ ব্রহ্মাণ্ড— বিশ্ব-সংসার সংরক্ষণ ও পালন করিতেছেন। তাই কেবল ভক্তেরই নহে, নিখিল জীব ও জড়-জগতের সংরক্ষণ ও পালনের সেই নিগূঢ় রহস্য,— তাঁহার সেই অবিচ্ছিন্ন করুণা ও কৃপার কথা জীব-জগৎকে বিদিত করাইবার জন্য, তিনি ব্রহ্মাকে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসহ নিজেই উপদেশ করিয়াছেন ; যথা—

দর্শনধ্যান-সংস্পর্শৈর্মৎস্য-কূর্ম্ম-বিহঙ্গমাঃ।
পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ— ১০।১৬১)

অর্থাৎ, যেমন দৃষ্টিদ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ও সংস্পর্শ দ্বারা যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম ও বিহঙ্গ সকল নিজ নিজ সন্তানগণকে পালন করে, হে ব্রহ্মণ ! আমিও সেইরূপ পালন করিয়া থাকি।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় স্থিরভাবে চিন্তা করিলে পূর্বোক্তি

সকলেরই সুস্পষ্ট সমর্থন ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন মৎস্য দৃষ্টিশক্তি দ্বারা সন্তান প্রতিপালন করে। জলাশয়ে দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র মৎস্যশাবক সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, আর ছায়ার মত নিরন্তর তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে তাহাদের জননী,— যাহার মঙ্গলদৃষ্টিসম্পাতে সর্বক্ষণ অভিষিক্ত হইয়া, তাহা দ্বারাই সেই মীনশিশুগণের রক্ষণ ও সংবর্ধনকার্য সাধিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সেই মৎস্যজননীর নিধনে সমস্ত মৎস্যশাবকের একযোগে বিনাশবার্তাও শ্রবণ করা যায়। এইরূপে মীন-জননীর মঙ্গলদৃষ্টিই যেমন মৎস্য-শাবকদিগকে সংরক্ষণ ও পালন করিয়া থাকে, তেমনি ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির দ্বারা নিরন্তর অভিষিক্ত হইয়াই জীব-জগৎ সুরক্ষিত হইতেছে। নিখিল জীব অর্থাৎ জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মারূপে পরমেশ্বরের নিরন্তর এই দর্শনের কথা, শ্রুতিতে স্পষ্টই 'অভিচাকশীতি'— এই শব্দটি দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥— (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

অর্থাৎ, পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীদ্বয় একত্র সমান-ভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন; তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্টফল ভক্ষণ করেন; আর একজন (পরমাত্মা) ফলভুক না হইয়া কেবল দর্শন করেন।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কূর্ম বা কচ্ছপ নদী হইতে দূরে বালুকাগর্তে ডিম্ব প্রসব করিয়া নদীতে ফিরিয়া আসে এবং জলমধ্যে এক স্থানে একই ভাবে অবস্থান পূর্বক যে পর্যন্ত শাবকগণ ডিম্ব হইতে নির্গত না হয়, সে পর্যন্ত নিরন্তর তাহাদের মঙ্গল বিষয় ধ্যান করিতে

থাকে। কূর্ম-জননীর সেই অবিরত মঙ্গলধ্যান দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াই কূর্ম-শাবকগণ বর্ধিত হয় এবং ডিম্ব হইতে বহির্গত হইবার শক্তিলাভ করে। এরূপ অবস্থায় কোন কারণে সেই কূর্ম-জননীর নিধন ঘটিলে ডিম্বস্থিত শাবকগণ আর বর্দ্ধিত হয় না, এবং সমস্ত ডিম্ব অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব কূর্ম-জননী কর্তৃক নিরন্তর মঙ্গলধ্যান হইতেই কূর্ম-সন্তানগণ যেমন সুরক্ষিত ও পালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলধ্যান দ্বারা তর্পিত হইয়াই জড়জগৎ সুরক্ষিত হইতেছে। তাহার ধ্যান অর্থাৎ সুমঙ্গল ইচ্ছা হইতেই যে জগৎ সুরক্ষিত হয়, শ্রুতিকর্তৃক সৃষ্টির মূলে স্পষ্টতঃ 'কামনা' শব্দের উল্লেখ হইতে উহা বুঝিতে পারা যায়; যথা—

"সোঽকাময়ত— বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"। (তৈত্তিঃ ২।২।৬)

অর্থাৎ, পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, বহু হইব। তাঁহার সেই ইচ্ছা বা ধ্যান হইতেই জগতের সৃষ্টি ও জগতের অবস্থিতি। শ্রীভগবানের সেই অনু-ধ্যানের বিরতি ঘটিলেই যে জগতের প্রলয় সংঘটিত হয়, ইহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিহঙ্গমা কর্তৃক শাবক পালনের প্রণালী সর্বজনবিদিত। পক্ষি-শাবক জননীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াই পালিত হইয়া থাকে। পাখার আচ্ছাদনে, বক্ষের অভয়দানে, চঞ্চুপুটের সন্তর্পণে সংরক্ষণ করিয়া পক্ষীজননী যেমন নিজ সন্তানকে পালন করে, তেমনি ভগবান সাক্ষাৎ নিজ অমিয়মাখা স্পর্শ দিয়াই ভক্তগণের পালন ও পোষণ করিয়া থাকেন। তদীয় চরণ, বক্ষ, শির ও অধর-স্পর্শামৃত প্রাপ্ত হইয়াই যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তগণের জীবনধারণ মহৌষধ হইয়া থাকে। পক্ষী ও পক্ষি-শাবকে উভয় হৃদয়ের স্নেহশীতল সংস্পর্শে যেমন উভয়ের একই হৃদয় একই অন্তর হইয়া যায়, ভক্তের সহিত ভগবানের সেইরূপ প্রীতি-সম্বন্ধ; সে কথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন; যথা—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

—(শ্রীভাঃ, ৯।৪।৫১)

অর্থাৎ,— সাধুসকল আমাতে নিজ হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে। আমি সাধুগণের হৃদয় অবগত আছি। তাহারা আমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না ; আমিও তাহাদের ভিন্ন অপর কিছুই জানি না ;— ইহা শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানেরই নিজোক্তি।

পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের অমিয়স্পর্শে পালিত—মধুর আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত শুদ্ধ জীব বা ভক্তগণের সেই স্পর্শসুখের কিঞ্চিৎ আভাস শ্রুতিও জীব-জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং।
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ॥

—(বৃহদারণ্যকে, ৪।৩।২১)

অর্থাৎ যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই অনুভব করে না, সেইরূপ ভক্ত-জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা বা শ্রীভগবান কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।

জড়ে, জীবে ও ভক্তে— সর্বত্র শ্রীভগবানের পালন-কার্য সমানই চলিতেছে ; কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধ— প্রীতির বিনিময় কেবল ভক্তে ও ভগবানেই সীমাবদ্ধ। বিনিময় ভিন্ন প্রীতি পুষ্ট হয় না। যেখানে সাড়া নাই— সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রীতির ক্ষেত্র নহে। আবার জাগরিত যে, তাহার নিকট হইতেই সাড়া পাওয়া যায়, নিদ্রিত ও মৃতের নিকট হইতে সাড়া আসে না। ভক্তই জাগরিত জীব ; তাই সেখানে সাড়া আছে,— প্রীতির বিনিময় আছে ; সেখানে তাই প্রেম পরিস্ফুট। বহির্মুখ জীব-

সাধারণ নিদ্রিত। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাপ্নিক জগতের পক্ষে জাগরিত হইলেও যেমন জাগ্রৎ জগতে নিদ্রিতই থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা-বিমোহিত জীব-সাধারণ, মায়িক ব্যবহার বিষয়ে জাগরিত থাকিলেও পরমেশ্বরের বা পরমার্থ বিষয়ে নিদ্রিতই রহিয়াছে। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে ;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

—(শ্রীগীতা, ২।৬৯)

অর্থাৎ, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত-মতি ব্যক্তিগণের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ জাগরিত থাকেন এবং প্রাণিগণ, যে বিষয়-নিষ্ঠা স্বরূপ দিবায় জাগরিত থাকে, মননশীল সাধুদিগের তাহাই নিশাস্বরূপ।

কূর্ম্মমাতা ডিম্বের মঙ্গলধ্যানে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিলেও, ডিম্বের পক্ষে সে-সংবাদ জানিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া উহারা যেমন তাহা জানে না এবং কোন দিন জানিবে না, সেইরূপ রক্ষণাদি বিষয়ে শ্রীভগবানের অবিরাম মঙ্গলধ্যানের কথা ডিম্বপ্রায় জড়-জগতের পক্ষে জানিবার যোগ্যতা না থাকায়, জড়-জগৎ সে-কথা জানে না এবং কোনও দিন জানিতে পারিবে না। জানিতে না পারিলেও তাঁহার স্মরণামৃত সেচনে জড়-জগৎ যেমন পালিত হইতেছে, সেইরূপই হইবে।

মৎস্য-জননী, মঙ্গলদৃষ্টি দ্বারা সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়া নিরন্তর তাহাদের অনুসরণ করিলেও বহির্ম্মুখ শাবকগণ যেমন খেলার আবেগে মত্ত হইয়া পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহে না বলিয়াই জানিবার যোগ্যতা থাকিলেও সেই স্নেহাকুলা জননীর মঙ্গলদৃষ্টির বিষয় যেমন তাহারা কিছুই জানে না, সেইরূপ শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে শুভ নিরীক্ষণ দ্বারা জীব সকলের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক নিরন্তর তাহাদের অনু-সরণ করিলেও, বহির্ম্মুখ জীব, সংসার-স্বপ্নে নিমগ্ন হইয়া,— সে-কথা জানিবার যোগ্য হইয়াও, অন্তরের দিকে ফিরিয়া দেখে না বলিয়াই— অন্তর্ম্মুখ হয় না বলিয়া তাহা জানিতে ও সেই উন্মীলিত স্নেহ-করুণ সজল

নয়ন-যুগলের সন্দর্শন লাভ করিতে না পারিলেও, তাঁহার সেই দর্শনামৃত সেচনেই জীব-জগৎ যেমন সংরক্ষিত হইতেছে, সেইরূপই হইবে।

পক্ষিমাতা নিজ শাবককে স্পর্শ দ্বারা পালন করে সে-কথা যেমন পক্ষিশাবকের জানিবার যোগ্যতা আছে এবং জননীর বুকের ভিতর থাকিয়া যেমন সে তাহা বুঝে ও প্রত্যক্ষ করে, তেমনি শ্রীভগবানের অনন্ত কৃপা ও করুণার সংবাদ— অবিদ্যা মোহ-ঘোর হইতে সমুত্থিত কিম্বা নিত্যমুক্ত ভক্ত যাঁহারা, সেই ভক্তগণের পক্ষে জানিবার যোগ্যতা আছে এবং তাঁহারাই উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শামৃত সেচন দ্বারা ভক্ত-জগৎ যেমন নিত্যই সুরক্ষিত ও পালিত হইতেছে, সেইরূপ নিত্যই হইবে।

ভক্তগণ ভিন্ন অপরে এই প্রকার শ্রীভগবানকে দেখিতে কিম্বা জানিতে পারে না বলিয়াই, বহির্মুখ জীবসকল, তাঁহার সম্বন্ধে উদাসীন ও অপেক্ষাশূন্য হইতে পারে। যাহা জড়েরই উপযুক্ত, সেই পরমেশ্বর সম্বন্ধে অনুপলব্ধি যদি সচেতন জীবে— বিশেষভাবে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে মানবতা যে জড়তারই নামান্তর মাত্র, ইহা একটু চিন্তা করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারি। মানবের পক্ষে যত প্রকারে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার মধ্যে সর্ব-প্রধান অকৃতজ্ঞতার পরিচয় হইতেছে— এতাদৃশ শ্রীভগবানে অবিশ্বাস করা। জীব-সাধারণ এইরূপে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেও, তিনি কিন্তু নিজ কৃপা এক ভাবেই সেচন করিয়া নিখিল-জীবাত্মাকে সংরক্ষণ ও পালন করিতেছেন। জীবের প্রতি তাঁহার সেই অনাবিল কৃপা ও করুণাধারা একই ভাবে ক্ষরিত হইতেছে।

ভোগাবসানে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, জীব যখন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পরলোকের অজানা পথে একাকী গমন করিতে থাকে,— ইহলোকের কোন সহায়-সম্পদ— কোন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনকে যেখানে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,— সকলেই

তাহাকে চিতার আগুন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, সে অবস্থায়— পরলোক-পথের সেই সহায়-সম্বল ও সঙ্গী-হীন— একলা যাত্রী যদি পশ্চাতের দিকে— অন্তরের দিকে ফিরিয়া চাহিতে জানিত, তবে দেখিতে পাইত, আজ এই অদিনের অজানা— অন্ধকার পথে সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও কেবল একজন তাহার সঙ্গে আছেন,— সজল— সকরুণ নয়নদৃষ্টিতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া। জীব যাঁহার প্রতি কোনদিন একবার ফিরিয়াও চাহে নাই,— উপেক্ষা, অনাদর ও অবিশ্বাস দিয়াই যাঁহার অভিবাদন করিয়া আসিয়াছে, আজ তিনি-ই সেই অসহায় জীবের একমাত্র সহায় ও সঙ্গীরূপে তাঁহার সাথে সাথে চলিয়াছেন,— সংজ্ঞাহারা জীব সচেতন হইবামাত্র তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া— চির অভয় দিয়া— নিজঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য। এইভাবে সকলে পরিত্যাগ করিলেও যিনি সকল সময়ের জন্য সকল জীবের সহচর, ইহ-পরকালের বন্ধু ও চির-আশ্রয়,— অন্তর্যামীরূপে তিনি-ই সেই শ্রীভগবান।

জীব কর্মবশে মান্য বা ঘৃণ্য যে কোন দেহান্তর লাভ করিলেও, তিনি পরমাত্মারূপে, সেইখানেই অনুগমন করিয়া, সেই দেহস্থিত জীবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভয় দিলেও, অবিদ্যায় অচেতন জীব, তাই সে-বাণী শুনিবার তাহার ক্ষমতা নাই। জীব কর্মবশে যদি ক্রিমি দেহও প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর বিলাস নিকেতন হইয়াও, অন্তর্যামীরূপে তিনি সেই ঘৃণ্য দেহেও অনুগমনপূর্বক জীবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভয় দিয়া থাকেন,— নিখিল-জীবের প্রতি এতই পরমাশ্চর্য করুণা তাঁহার! অবিদ্যার বিকার ঘোরে হতচেতন আমরা— সে কৃপার মূর্তি— সে করুণার ছবি— দেখিতে পাই না— এমনই দুর্দৈব আমাদের!

বিকারাচ্ছন্ন সন্তানের মুখের দিকে জননী যেমন আরোগ্যের প্রথম লক্ষণ দেখিবার অপেক্ষায় পলকহীন নয়নে চাহিয়া থাকেন,

একটি চেতনার কথা শুনিবার আশায়— দীর্ঘ দিবস পরে মাকে চিনিয়া, একটি প্রথম 'মা' বলিয়া আহ্বান শুনিবার প্রতীক্ষায়— জননী যেমন দিনের পর দিন সেই রুগ্ন সন্তানের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন, সেইরূপ অবিদ্যার বিকারঘোরে হতচেতন জীবের মুখে কোন একদিন রোগমুক্তির প্রথম লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে— ইহা দেখিবার আশায় শ্রীভগবান অনন্ত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। কোন দিন চেতনা লাভ করিয়া জীবনের সেই চির-সহচরকে— চির-সুন্দরকে চিনিতে পারিয়া, "আমি যে তোমার" — জীবের মুখ হইতে এই চেতনার প্রথম কথাটি শুনিবার আশায়— সেই একটি শুভ-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় অনাদিকাল হইতে তিনি জীবের দেহরূপ রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন।

অবিদ্যা কর্তৃক সংসার-স্বপ্নে পথহারা বহির্মুখ জীবকে তাহার নিজঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য জীবাত্মার সহিত অনাদিকাল হইতে পরমাত্মারূপে শ্রীভগবানের এই অভিযান চলিয়াছে এবং যতদিন তিনি জীবকে স্বদেশে— আপনার ঘরে ফিরাইয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন এই অভিযান— অনুগমন চলিবে।

স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজগৃহে— সুখশয্যায় শায়িত থাকিয়াও স্বপ্নের-দেশে— কল্পিত সুখদুঃখ, হাসিকান্না লইয়া— পথহারা-প্রায় ঘুরিতে থাকে— তাহাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিতে হইলে যেমন আর কিছুরই আবশ্যক হয় না,— কেবল প্রয়োজন তাহাকে জাগাইয়া তোলা, তেমনি সংসার-স্বপ্ন হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবকে তাহার চির-শান্তিময় — সুশীতল নিজঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, অবিদ্যার ঘুমঘোর হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই একমাত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে। জীবাত্মার জাগরণের জন্য, এই মায়িক জগতে সাধু ও শাস্ত্ররূপ সোনার কাঠির অবস্থান— ইহা শ্রীভগবানেরই সুমঙ্গল ব্যবস্থা। অহৈতুকী সাধু-শাস্ত্রকৃপায় জীব অবিদ্যার ঘুমঘোর হইতে জাগরিত হইবামাত্র, সেই

চির-সুন্দর ও চির-সহচরকে চিনিতে পারে ; তখন তাঁহার সহিত নিজ নিত্য সম্বন্ধ স্মরণ হওয়ায়, "হে চির আশ্রয়!— আমি তোমারই।"—এই চেতনার প্রথম বাণী যে মুহূর্তে জীবের অন্তর হইতে স্ফুরিত হয়, সেই শুভক্ষণে, সেই জীবের সহিত সংসার পথে শ্রীভগবানের এই নিরবচ্ছিন্ন অভিযান সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে! সেই মুহূর্তেই তাঁহার সপ্রতিজ্ঞ চির অভয়বাণী শুনিতে পাইয়া জীব চির অভয় ও অমৃতময় হইয়া যায়।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

— (রামায়ণ, লঙ্কা ১৮।৩৩)

অর্থাৎ, যে একবার "আমি তোমার হইলাম" বলিয়া আমার শরণাপন্ন হইতে চাহে,— আমি সর্বপ্রকারে তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। শ্রীভগবান ইহা নিজেই বলিয়াছেন।

এইরূপে সুমঙ্গল দৃষ্টি সম্পাতে সংরক্ষণ ও অনন্ত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অনুগমন পূর্বক মোহ-নিদ্রা হইতে—সংসার-স্বপ্ন হইতে নিখিল জীবাত্মাকে এইরূপে জাগরিত করিবার প্রয়াস, যাঁহার অপরিসীম অনন্ত করুণার সংবাদের সহিত বিজড়িত,— সেই শ্রীভগবানের প্রতি উদাসীন ও অপেক্ষাশূন্য হইয়া, "তিনি ভক্ত ভিন্ন অপরের পালক ও সংরক্ষক নহেন,"— এরূপ মনে করা কিম্বা তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা,— জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে যে কতদূর অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিবার মত কোন ভাষা নাই।

যাঁহারা সর্বনিয়ন্তা— পরম-করুণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে জাগরিত হইয়াছেন বা চিরজাগ্রৎ রহিয়াছেন, তাঁহারাই 'ভক্ত' বা 'সাধু' নামে কীর্তিত। শ্রীভগবানকে ও সর্বভূত পালনে তাঁহার অবিরত করুণা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া জীব-জগতের এই সর্বপ্রধান জ্ঞাতব্য সংবাদ ভক্তগন কর্তৃক জগতে প্রচারিত না হইলে,—এই মহাসত্য

অজ্ঞতার অতল অন্ধকার গর্ভেই চিরলুক্কায়িত থাকিয়া যাইত।

শ্রীভগবান যে প্রীতি— যে আবেগ লইয়া সর্বভূত পালন করিতেছেন, তাহাতে সাড়া দিবার ক্ষমতা মৃতবৎ জড়-জগতের অথবা নিদ্রিত জীব-জগতের পক্ষে না থাকায়,— কেবল পালনের অবিরল ধারা সেখানে প্রবাহিত থাকিলেও, সেখানে প্রীতির উচ্ছ্বাস নাই। উহা কেবল সচেতন বা সাড়া দিতে সমর্থ ভক্ত-জগতেরই নিজস্ব সম্পদ। পরস্পর বিনিময় দ্বারাই প্রীতি উচ্ছ্বসিত বা অভিব্যক্ত হয়, নচেৎ প্রীতির প্রকাশ থাকে না। ভক্তগণ ভগবানের অন্তর-নিঃসৃত প্রীতি-কিরণ সম্পাতের কণকস্পর্শ অনুভব করিয়া, যেমন সম্পূর্ণরূপে "তাঁহার" অর্থাৎ "ভগবানের ভক্ত" হইয়া যান, ভগবানও ভক্তের হৃদয়-নিঃসৃত প্রীতি-শতদলের স্নিগ্ধ-সৌরভের অনুভূতি পাইয়া তেমনি ভাবেই "তাহার" অর্থাৎ "ভক্তের ভগবান" হইয়া থাকেন। পরস্পর এইরূপ প্রীতি বিনিময়ের আত্ম-বিনিময়,— ভক্তে ও ভগবানে এবং ভগবানে ও ভক্তেই কেবল সম্ভব হইয়া থাকে। প্রীতি এখানে উচ্ছ্বসিত বলিয়া, ভক্তই সেই প্রীতি প্রকাশের ক্ষেত্র। অতএব কেবল পালন করিয়াই নহে— তিনি প্রীতি-দ্বারা "সকলের ভগবান" হইতে চাহিলেও, কেবল ভক্তই প্রীতির বিনিময়ে প্রেম দ্বারা সে আবেগ— সে প্রীতির সাড়া দিয়া তাঁহাকে "ভক্তের ভগবান" করিয়া রাখিয়াছেন। এইভাবেই ভক্তই জগতে ভগবানের সত্তা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। নচেৎ নিজ সমুজ্জ্বল সত্তায় নিত্য প্রতিভাত হইয়াও, দিবাকর যেমন দিবায় নিদ্রালস নিমীলিত-নেত্র পেচকের নিকট "নাই" বলিয়া প্রতীত হয়েন, শ্রীভগবানও তেমন তদ্বিষয়ে নিদ্রাভিভূত জীব ও মৃতবৎ জড়— উভয় ভাববিশিষ্ট এই জগতের নিকট সেইরূপই প্রতীত হইতেন। ভক্তগণের এতাদৃশ উপকারের উপযুক্ত প্রত্যুপকার দানে জগৎ অসমর্থ বলিয়া, তাই জগদীশ্বরকেই সে ভার সানন্দে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

তাই সমস্ত যাঁহার অধীনে, সর্বাধীশ সেই শ্রীভগবান স্বেচ্ছায়—

সাধ করিয়াই ভক্তাধীনতা— ভক্তবশ্যতা— স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই ভক্তবশ্যতার কথা বড় আনন্দের, বড় গৌরবের কথার মত নিজ শ্রীমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্ত-বন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্॥

—(শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে)

অর্থাৎ, আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রীতিরজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ, আমি অজিত হইয়াও ভক্ত কর্তৃক বিজিত; এবং আমি অন্যের অবশীভূত হইয়াও তাহাদের নিকট বশীভূত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধুগণের মমতা পরিহারপূর্বক কেবল আমাতেই রতি বিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার— সে আমার। আমাদের উভয়েরই আর অপর সুহৃদ্ নাই।

ভগবৎ-প্রীতি-পবনে হিল্লোলিত সেই ভক্ত-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ, শ্রীভগবান আবেগময়ী ভাষায় আরও বলিয়াছেন;—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়া সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

—(শ্রীভাঃ, ৯।৪।৬৩-৬৬)

অর্থাৎ, আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। আমি

ভক্তজন-প্রিয়। ভক্তগণ কর্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে।

যাহাদের আমি-ই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপন আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

ফলতঃ যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ ও পরলোক পর্যন্ত— সমস্তই পরিত্যাগপূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি ?

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।

এইরূপে ভগবৎ-সত্তা ও করুণা দ্বারা নিখিল বিশ্ব-সংসার বিধৃত ও পালিত হইলেও, জননীর অস্তিত্ব বিষয়ে কূর্ম ও মীন-শাবকের অনুপলব্ধির ন্যায়— জড়ের নিকট ও জড়প্রায় জীব-সাধারণের নিকট সে-সংবাদ অপ্রকাশিত থাকাই যে স্বাভাবিক, ইহা এখন সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

অতএব বহির্মুখ জন-সাধারণে— ভগবানের অভাবে লৌকিক বা ব্যবহার বিষয়ে কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেখিয়া, তাঁহাতে অপেক্ষাশূন্য হইলেও, জননীর অস্তিত্ব ও আবেগের সম্বন্ধে পক্ষি-শাবকের প্রত্যক্ষের ন্যায়, কেবল ভক্তগণই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন যে,— বিশ্বব্যাপী ভগবৎসত্তা ও করুণার ক্ষণিক অভাব ঘটিলে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসারের কিছুই বিদ্যমান থাকিতে ও সংঘটিত হইতে পারে না। এতাদৃশ শ্রীভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতায় চির-নমিত ও শরণাগত না হইয়া, মনুষ্য যদি অবিদ্যা-কৃত অজ্ঞতা ও অহমিকার বশে জীব-জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও সার্থকতা যাহা,— সেই ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভক্তি হইতে বিচ্যুত হয়, তবে ইহা হইতে দুর্দৈব ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

ভগবান চাহেন, ভক্তের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে সকলেই বলুক 'আমার ভগবান।' এই উদ্দেশ্যে, 'কে আমায় আপনার করিয়া লইবে গো',— এই বলিয়া তিনি সর্বত্র সকলের নিকট যাচিয়া বেড়াইলেও, সেই ডাকে— ভক্ত ভিন্ন আর কেহই সাড়া দেয় না। তাই তিনি 'সকলের ভগবান' হইতে গিয়াও কেবল, 'ভক্তের ভগবান' হইয়াই রহিয়াছেন।

জড়বাদের প্রবল মোহে জড়তাগ্রস্ত হইয়া সারা জগৎ যদি কখন তাঁহাকে অস্বীকারও করে,— তখনও তিনি ভক্তের ভগবান হইয়া ভক্তের হৃদয়-কমল জুড়িয়া— যেমন নিত্য আছেন— তেমনি নিত্যই বিরাজমান থাকিবেন।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৪ হইতে ১৫শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত।

——

ধর্ম

'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবস্থান করে, অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, যাহা দ্বারা কোন কিছু ধৃত বা রক্ষিত হয়, ধর্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে অথবা পুণ্যাত্মাগণ কর্তৃক যাহা ধৃত হইয়া থাকে তাহার নাম ধর্ম,— শাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন। ধর্ম শব্দের অপর পর্যায়, যথা— পুণ্য, ন্যায়, স্বভাব, আচার প্রভৃতি।

জগতে বিদ্যমানতা বোধক যত কিছু পদার্থ আছে তাহাই 'ভাব' পদার্থ ; ভাবই অস্তিত্বের নামান্তর। ভাব মাত্রেই ধর্ম শব্দের অভিধেয়।

জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, যাহা কিছু অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, যাহা কিছু ধৃত রহিয়াছে, সে সকলই এক একটি 'ভাব' বা এক একটি 'ধর্ম'।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং
ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে
ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

অর্থাৎ ধর্মের দ্বারাই বিশ্ব সুরক্ষিত রহিয়াছে; ধর্ম বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন, ধর্ম ভিন্ন ভুবনে অপর কোন বস্তু নাই; সেই ধর্মকে নমস্কার করি।

সুতরাং আমরা বুঝিতেছি, জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই এক একটি ধর্ম বা এক একটি ভাব; আর যাহা কিছু নাই, তাহাই ধর্ম নহে, তাহাই অভাব। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

"ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।"

ধর্ম বা ভাবকে অবলম্বন করিয়া,— ধর্ম বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া,— ধর্ম বা ভাবকেই ধারণ করিয়া সকল পদার্থই অবস্থিত রহিয়াছে। পশুর ভাবকে অবলম্বন করিয়া পশু অবস্থান করে, সিংহের ভাবে সিংহ, শৃগালের ভাবে শৃগাল অবস্থিত; পক্ষীর ভাবকে অবলম্বন করিয়া পক্ষী অবস্থান করে, কোকিলের ভাবে কোকিল ও বায়সের ভাবে বায়স অবস্থিত; মনুষ্যের ভাবকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য অবস্থান করে, ব্রাহ্মণের ভাবে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ভাবে শূদ্র, বালকের ভাবে বালক, বৃদ্ধের ভাবে বৃদ্ধ, স্ত্রীর ভাবে স্ত্রী, পুরুষের ভাবে পুরুষ অবস্থিত; রজনী, আলোক, আঁধার, শীত, গ্রীষ্ম— এক কথায় চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলেই নিজ নিজ ভাবকে, নিজ নিজ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। যাহার কোনও ভাব বা ধর্ম নাই, সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্বও নাই;

সুতরাং সকল অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থই এক একটি ধর্মী, সকল ভাবই এক একটি ধর্ম ইহা বুঝিতে পারিলাম। যে পদার্থ যে ভাব বা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে সেই ভাব বা সেই ধর্মটিই তাহার "স্বভাব" বা "স্বধর্ম"। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা.....ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

অর্থাৎ ধর্মই জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ধর্মেই নিখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত, ধর্মশূন্য হইয়া কাহারও অবস্থান করিবার উপায় নাই, অতএব ধর্মই পরম পদার্থ।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম কোন সংকীর্ণ সীমায় সংবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ নহে; ইহা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় অবিচ্ছিন্ন বিরাট বস্তু। আর প্রত্যেক পদার্থের স্ব স্ব ভাব বা স্ব স্ব ধর্ম, সেই এক অখণ্ড ধর্মেরই স্তর বা অবস্থা বিশেষ মাত্র। সকল পদার্থই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে পদার্থ ধর্মের যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান বা সেই অবস্থা বিশেষেরই নাম 'স্বধর্ম' বা 'স্বভাব'। স্বভাবে অবস্থিত পদার্থ সকলের সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যানুসারেই ধর্মের অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্বভাব দেখিয়াই আমরা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারি।

বৃক্ষভাবে অবস্থিত যাহা তাহাই বৃক্ষের স্বভাব বা স্বধর্ম; বৃক্ষের স্বভাব দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। মনুষ্যভাবে অবস্থিত যাহা, তাহাই মনুষ্যের স্বভাব; মনুষ্যের স্বভাবেই মনুষ্য নির্ণীত হইয়া থাকে। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, দাতা, কৃপণ, গ্রহ, নক্ষত্র, ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত,— এক কথায়, প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ স্বভাবেই পরিচিত হইয়া থাকে। নিখিল পদার্থকেই ধর্ম বা ভাবের কোনও না কোন অবস্থা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেই হইবে। ধর্ম বা ভাবের অবস্থা বিশেষের নামই "স্বধর্ম" বা "স্বভাব"। যাহা সমষ্টি

তাহাই ধর্ম বা ভাব ; যাহা ব্যষ্টি তাহাই স্বধর্ম বা স্বভাব।

ধর্মের গতি দ্বিবিধা। একটি ঊর্ধ্বস্রোতস্বিনী, অপরটি অধঃ-স্রোতস্বিনী। জগৎ গতির মূর্তি ; জাগতিক প্রত্যেক পদার্থই নিয়ত গতিশীল, নিয়ত সচঞ্চল ; অপূর্ণতাই এই চঞ্চলতার কারণ। সাংসারিক সকল জীব সকল পদার্থই অপূর্ণ বলিয়া প্রতি ক্ষণ প্রতি মুহূর্ত পূর্ণতা প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল ! তাই বিশ্ব গতির মূর্তি। তাই প্রাকৃত পদার্থ-মাত্রেই উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়ভাব-বিকার প্রাপ্ত। জগতের কোনও বস্তু ক্ষণকালের জন্যও সুস্থির নহে। একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অস্থিরতার জন্যই কোন কিছু অস্থির হয় না ; সুস্থির হইবার জন্যই— স্থিরতা না পাওয়া পর্যন্তই— অস্থির হইয়া থাকে। সেইরূপ গতির জন্যই গতি নহে— স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়াই গতির চরম লক্ষ্য। যাহা অপরিবর্তনীয় ভাব তাহাই পাইবার জন্য পরিবর্তনশীল জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল।

শ্রীভগবানের সংসার-দুঃখ-প্রশমন চিরসুশীতল চরণচ্ছায়াই একমাত্র নিত্যবস্তু— অপরিবর্তনীয় সম্পদ। সেই অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তিনী হওয়াই গতি বা পরিবর্তন মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব যে গতি যে পরিমাণে সেই অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্থিতির সমীপবর্তিনী, সেই ভাব বা ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পদার্থ বা ধর্মী সেই পরিমাণে পূর্ণ— সেই পরিমাণে সুস্থির।

ধর্মের ঊর্ধ্বস্রোতস্বিনী গতি অবলম্বন করিয়া স্থিতির দিকে— অপরিবর্তনীয় ভাবের দিকে অগ্রসরণ অবস্থাই ধর্মের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ, এই অবস্থার অপর নাম 'পুণ্য'। সাধুগণ কর্তৃক আচরিত হয় বলিয়া ইহাকে সদ্ধর্মও কহে। এই ঊর্ধ্বগতিই পুণ্যাত্মাগণ কর্তৃক নিয়ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহাই জীবের প্রকৃষ্ট গতি। এই প্রকৃষ্ট গতি অবলম্বন করিয়াই স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আনন্দঘন শ্রীভগবানের চরণসেবন

প্রাপ্তিতেই সমস্ত গতির স্থিতি বা বিশ্রাম। তাহা প্রাপ্ত হইলে তখন আর জীব ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কোনও ভাবেই সংবদ্ধ নহেন। তখনই তিনি স্বাধীন—তিনি স্বপদপ্রাপ্ত। স্বপদপ্রাপ্তিই সমস্ত জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য; ধর্মই ইহার সাধন এবং ভক্তিই সাধন মাত্রের মুখ্য প্রয়োজন।

ধর্মের অধঃস্রোতস্বিনী গতির নাম অধর্ম। ইহাই সাধারণতঃ "পাপ" নামে উক্ত হইয়া থাকে। যে পরিবর্তন কোনও পদার্থকে তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম হইতে নিম্নাভিমুখে পরিভ্রষ্ট করিয়া দেয়, সেই বিচ্যুতির অবস্থাই তাহার পক্ষে অধর্ম,—তাহাই তাহার পক্ষে পুণ্যের বিপরীত গতি। অধোগতিতে পরিচালিত জীব অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্বপদের বিপরীত দিকে যতই অগ্রসর হয়,— বিপদের পর বিপদ,— অনন্ত বিপদ— অনন্ত গতায়াত— সেই অপ্রকৃষ্ট গতির পথে তাহার সম্বর্ধনার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

আমরা বুঝিলাম,— স্বধর্ম, ধর্ম ও অধর্ম বলিয়া এমন কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাব নাই, যাহা একই সময়ে সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। যে ভাব যাহার স্বধর্ম তাহার পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর যোগ্যতানুসারে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বপ্রবাহিনী গতির অনুসরণের নাম "ধর্ম" আর স্বধর্ম হইতে নিম্নপ্রবাহিনী গতির অনুসরণের নাম "অধর্ম" এবং যে কোনও ভাব অবলম্বনে অবস্থিতি করণের নাম "স্বভাব"।

ধর্ম ও অধর্ম লক্ষণ নির্ণয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে।

(—ধর্মদীপিকা)

তাৎপর্য— যাহা শাস্ত্রবিহিত কার্য— যাহা প্রকৃষ্ট গতি, তাহারই অনুসরণ করাকে ধর্ম কহে; আর যাহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য যাহা অপ্রকৃষ্টগতি, তাহারই অনুসরণ করার নাম অধর্ম।

নিখিল পদার্থই কর্মানুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই সংমিশ্রিত

গুণত্রয়যুক্ত হইয়া নিজ নিজ ভাবে অর্থাৎ স্বধর্মে বা স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। হীন-মধ্য-অধিক ভেদে গুণত্রয়ের অসংখ্য বিভাগ হইলেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য অনুসারে পদার্থসকল ত্রিবিধ প্রকারে বিভক্ত ; যথা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। প্রকৃতির অধীন এমন কোন বস্তু নাই যাহা উক্ত গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥

—(শ্রীগীতা, ১৮।৪০)

অর্থাৎ,—পৃথিবীতে মনুষ্যগণের মধ্যে বা স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে এমন কোন কিছুই নাই, যাহা প্রকৃতিজন্য এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত।

আবার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে অসংখ্য প্রকার হইয়াও জীবসকল যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ সকল জীবের শ্রদ্ধাও গুণভেদানুসারে অসংখ্য প্রকার হইয়াও প্রধানতঃ ত্রিবিধ ; যথা ;—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

—(শ্রীগীতা, ১৭।২)

অর্থাৎ,— শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, দেহিদিগের সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ; ঐ শ্রদ্ধা স্বভাবজা ; উহা বলিতেছি,— শ্রবণ কর।

সুতরাং গুণানুসারে যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধানুরূপ ধর্মেই তাহার অধিকার জন্মিয়া থাকে ; অধিকার অনুরূপ ধর্মের নামই স্বধর্ম। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তির তামসী শ্রদ্ধা ; সুতরাং তামস ধর্মই তাহার স্বধর্ম বা স্বভাব ; রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির রাজসী শ্রদ্ধা, সুতরাং রাজস ধর্ম তাহার স্বধর্ম বা স্বভাব ; আর সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা,

সুতরাং সাত্ত্বিক ধর্মই তাহার স্বধর্ম বা স্বভাব। স্বধর্ম বা স্বভাবের যথারীতি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতির নামই ধর্ম বা পুণ্য ; যেমন তমোগুণপ্রধান ব্যক্তির ক্রমশঃ রজোগুণে, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির ক্রমশঃ সত্ত্বগুণে ও সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির ক্রমশঃ নৈর্গুণ্যে অধিকার প্রাপ্তিই ধর্ম। আবার স্বধর্ম বা স্বভাবের অধোগতির নাম অধর্ম বা পাপ ; যেমন সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির রজোগুণে ও রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির তমোগুণে অধঃপতন।

অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্বপদ প্রাপ্তিই সকল জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও, গুণভেদে অধিকারীর বিভিন্নতা বশতঃ ধর্ম বা তৎসাধনও বিভিন্ন প্রকার ; সুতরাং পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম, দোষ-গুণ যে সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না, ইহা স্থির। তামস অধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর যথাক্রমে রাজস অধিকার প্রাপ্তিই ধর্ম ; কিন্তু সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজস ভাব প্রাপ্তিই অধর্ম। সুতরাং একই রাজস অধিকার যেমন কাহারও পক্ষে গুণের, কাহারো পক্ষে দোষের হইতেছে, সেইরূপ অন্য গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।২১।২)

অর্থাৎ, শ্রীভগবান বলিয়াছেন,— উদ্ধব ! যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্তিত হয় ; এবং তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে দোষ বলা যায়। বস্তুতঃ দোষগুণের এইমাত্র নিশ্চয়।

জীবের মহৎ কল্যাণ সংসাধিত করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বাক্যই, পুণ্য বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্ররূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের সংস্থাপিত আইন যাহা— তাহাই শাস্ত্রের সমুদয় বিধি-নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত বিধিই মানবের অশেষ

কল্যাণের প্রবর্তক এবং শাস্ত্রোক্ত নিষেধ মানবের অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক। শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতুভূতা ভক্তির মহিমা প্রচার করাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, সত্ত্বাদি গুণানুসারে যে যেরূপ শ্রদ্ধার অধিকারী তাহার পক্ষে তৎকালে সেই গুণানুরূপ ধর্মই উপযোগী হইয়া থাকে। স্বভাবানুরূপ ধর্মের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ধর্মের আচরণে অনধিকার বশতঃ তাহা অনিষ্টেরই কারণ হয়। স্বভাবোপযোগী ধর্মের অনুষ্ঠানে সুসিদ্ধ হইলেই তাহার পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর ধর্মে অধিকার জন্মে। এইরূপ ক্রমাগত ধর্মের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতির অনুবর্তী হইয়া সকল ধর্মের মুখ্য প্রয়োজন যাহা— জীব তাহারই সন্নিকটবর্তী হয়।

তমোগুণ হইতে জীবের প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়; রজোগুণ হইতে জীবের লোভ উৎপন্ন হয়; এবং সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে,— যে জ্ঞানের সহায়তায় জীব তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে অধিকারী হয়। অতএব স্বপদ বা মুখ্য-প্রয়োজন প্রাপ্তির নিমিত্ত তমঃ হইতে রজোগুণে, রজঃ হইতে সত্ত্বগুণে ও সত্ত্ব হইতে নির্গুণভাবে অধিকার প্রদান উদ্দেশ্যেই, শাস্ত্র গুণানুসারে যথারীতি স্বধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা,—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥

—(শ্রীভাঃ, ৭।১১।৩২)

স্বধর্মাচারী যে ব্যক্তি স্বভাবকৃতা বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার স্বভাবজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিজ নিজ গুণানুসারে শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশঃ শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা, অন্যথা যথেচ্ছাচার দ্বারা প্রবল অনর্থই ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণানুসারে জীবসকলের প্রবৃত্তি ও কর্মাদি সমস্তই বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। গীতা শাস্ত্রেও সুবিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা

করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে মাত্র দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥

—(শ্রীগীতা, ১৪।১৭)

অর্থাৎ— সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

—(শ্রীগীতা, ১৪।৯)

অর্থাৎ,— হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্মে ও তমোগুণ জ্ঞান আবরণ করিয়া প্রমাদে জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রের এই সুমহান উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ অবমাননা পূর্বক আমরা যতই স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইব, অনর্থের ভীষণ আবর্তনে আমাদিগকে ততই বিঘূর্ণীত হইতেই হইবে। তাই শ্রীভগবান জীবকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে সাবধান করিবার জন্য স্বয়ংই গীতায় উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥

—(শ্রীগীতা, ১৬।২৩-২৪)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরমা গতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্য্যাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ বলিয়া এই কর্মভূমিতে শাস্ত্রবিধানোক্তি বিদিত হইয়া সমুদয় কার্য করা উচিত।

গুণভেদানুসারে সাধনার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য বা প্রয়োজনের ভিন্নতা নাই। ভক্তিই যে পরম ধর্ম, ভক্তিই যে মুখ্য প্রয়োজন, ভক্তির উদ্দেশ্যেই যে বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও নিষেধ, ভক্তির উদ্দেশ্যেই যে সমস্ত ধর্ম কর্ম,— একথা শাস্ত্রই স্পষ্টরূপে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন। যথা,

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

— (শ্রীভাঃ, ১।২।৬)

অর্থাৎ,— যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি জন্মিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবগণের পরম ধর্ম, যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

আর যে ধর্মানুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ না হয়, সেই ধর্মাচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জল সেচনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

— (শ্রীভাঃ, ১।২।৮)

অর্থাৎ, সযত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না জন্মে, পুরুষের সেই ধর্মানুষ্ঠান কেবল পরিশ্রম মাত্র।

যাঁহার প্রাপ্তিতে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, যাঁহার মহিমা প্রচারে বেদাদি শাস্ত্রের সার্থকতা, যাঁহার সম্বন্ধ লইয়া সমস্ত ধর্ম-কর্মাদির সার্থকতা— তিনিই সেই শ্রীভগবদ্বশীকরণের একমাত্র হেতুভূতা "শুদ্ধাভক্তি"।

প্রথম প্রকাশ— শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল।

——

ভক্তিই জীবের পরম লভ্যবস্তু

একমাত্র বিশুদ্ধা ও সর্বগরীয়সী শ্রীভগবদ্ভক্তিই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত করাইয়া তৎসেবাসুখ প্রদান দ্বারা জীবকে পরমানন্দের অধিকার প্রদান করেন। কেবল তাহাই নহে—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির পরম সাররূপা বলিয়া ("হ্লাদিনীসার সমবেত-সম্বিৎসাররূপেতি।"—সিদ্ধান্ত-রত্ন। ১।৩৮) ভক্তি নিজেও হইতেছেন চিদানন্দ-স্বরূপিণী বা পরমানন্দরূপা। পরমানন্দই জীবের পরম সাধ্যবস্তু বা মুখ্য প্রয়োজন। সুতরাং ভক্তি নিজেই সেই সাধ্যবস্তু বা মুখ্য প্রয়োজন। ভক্তি নিজেই সেই সাধ্যবস্তু হইয়া আবার অনন্যাপেক্ষী বলিয়া নিজেই তৎসাধন হয়েন ("ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা"—শ্রীভাঃ ১১।৩।৩২); ভক্তি ভিন্ন অপর পুরুষার্থ বিষয়ে সাধন ও সাধ্য বা অভিধেয় ও প্রয়োজন পরস্পর পৃথক হওয়ায়, তৎসমুদয় হইতে ভক্তির ইহাও এক পরম বৈশিষ্ট্য হইতেছে। অধিকন্তু ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতির কোনও সাধনাই ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া কোন সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ না হওয়ায় তৎসমুদয় পুরুষার্থই ভক্তি-মুখাপেক্ষীই হইতেছেন, ("ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।" শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২২।১০)। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ॥

[বৃহন্নারদীয়ে]

অর্থাৎ— প্রাণিগণ যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

মহিয়সী ভক্তি কিন্তু অপর কোনও সাধনার অপেক্ষা মাত্র না

করিয়া স্বরূপে— আত্মমহিমায় আপনিই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজ সাধ্যত্ব নিজেই সাধন করেন বলিয়া ভক্তির অপর একটি নাম হইতেছে— "স্বরূপ-সিদ্ধা।"

অতএব এক ভক্তিই সাধনভক্তিরূপে পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় বা সাধন এবং প্রেমভক্তিরূপে সাধ্য বা পরমানন্দ— এই উভয়বিধ সামর্থ্য-যুক্তা হয়েন বলিয়া, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই জীবের পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজন— এই উভয়রূপেই কীর্তিতা হইয়াছেন। অধিক কথা কি?— ভক্তির সংযোগ বা মধ্যস্থতা ভিন্ন বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব-বস্তু বা শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবকাদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রের সম্বন্ধ-তত্ত্বও 'ভক্তি'ই। তাহা হইলে 'বিষয়' 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'— এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট বেদাদি শাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন 'বিষয়' এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই হইতেছেন— 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'।

জীব-হৃদয়রূপ আধারের অবস্থান্তর ভেদে সাধন ও সাধ্য ভক্তি নামে অভিহিত হইলেও ভক্তি নিজে সর্বাবস্থায় একরূপা ও অভিন্না। একই বিকাররহিত সূর্য যেমন পৃথিবীর অবস্থিতি অনুসারে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নাদিক্রমে বিবিধরূপে প্রতিভাত হইলেও উহা যেমন সূর্যের অবস্থান্তর নহে— পৃথিবীর পরিস্থিতি ভেদ বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ একই অপরিবর্তনীয়া বা অপরিচ্ছিন্না ভক্তি সাধকের অবস্থা ভেদে 'সাধনভক্তি' 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি'রূপে উদয় হইয়া থাকেন। ("সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা"— শ্রীভক্তিরসামৃতে)।

শ্রীভগবানের স্বরূপবৈভব বা অপ্রাকৃত লোক হইতে মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় এই ভক্তি, ভক্ত-প্রণালী-পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া, মায়া-বৈভবে অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে অবতরণপূর্বক মহৎসঙ্গাদি দ্বারে

জীবে সঞ্চারিত হয়েন। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ হেমত্ব প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু স্পর্শমণি হইয়া যায় না। মহৎসঙ্গ-রূপ ভক্ত-স্পর্শমণির প্রভাব আরও অচিন্ত্য,— তাই মহৎসঙ্গাদি-সংস্পর্শে জীব তাদাত্ম্য বা ভক্তত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তটস্থাশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণাংশভূত অণুচৈতন্য জীব এইরূপে মহৎ-সঙ্গদ্বারে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির শ্রেষ্ঠতমা বৃত্তিরূপা ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে, স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ-পরিকরগণের আনুগত্যে তদনুরূপ সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-সেবানন্দের নিত্য অধিকারী হইয়া থাকেন। যে জীব অনাদিকাল হইতে বহির্মুখতা বশতঃ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা বা জড়রূপা মায়াশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ জড়ীয় দেহাত্মবোধে বিমুগ্ধ হইয়া, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-দুঃখে বা ত্রিতাপ-সন্তাপে যে জীব নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছেন,— সেই চির দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবের পক্ষে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে, তৎসহ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া নিত্যকালের জন্য, সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরগণের আনুগত্যে ও তত্তুল্য সেবাধিকাররূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি অপেক্ষা, তটস্থা জীবশক্তির পক্ষে অধিকতর লাভ আর কিছুই হইতে পারে না,— ইহা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাই শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখেই শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন,— "লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।" —(শ্রীভাঃ, ১১।১৯।৪০) অর্থাৎ আমার ভক্তিই জীবের পক্ষে উত্তম লাভ। ভগবদ্বিষয়া ভক্তি উত্তম লাভ হইলে, স্বয়ং ভগবৎ বা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি বা ব্রজপ্রেম যে সর্বোত্তম বা পরম লাভ,— একথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। তাই এই কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে, একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে যে প্রেমভক্তির উদয় করাইয়া কলির জীবকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত কর্তৃক 'পরম লাভ' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, দেখা যায়,— "নহ্যতঃ পরমো লাভো

দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ"— ইত্যাদি। [শ্রীভাঃ, ১১।৫।৩৬ দ্রষ্টব্য]

মহৎসঙ্গাদি হইতে জীবে সঞ্চারিত সেই একই ভক্তি, যখন প্রধানতঃ স্থূল দেহে ক্রিয়াশীল বা অভিব্যক্ত হয়েন, তখন "সাধনভক্তি" নামে, যখন সূক্ষ্মদেহে অভিব্যক্ত হয়েন, তখন "ভাবভক্তি" নামে ও যখন জীবত্মায় সক্রিয় বা সঞ্চারিত হয়েন, তখন 'প্রেমভক্তি' নামে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। অতএব সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি ইহা জীবের শুদ্ধাশুদ্ধ ক্রমিক অবস্থা ভেদে এক স্বপ্রকাশ চিদানন্দময়ী ভক্তিরই প্রকাশভেদ ভিন্ন পৃথক কিছুই নহে। সেই এক ভক্তিই বেদাদিশাস্ত্রোক্ত 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' হইলেও প্রেমভক্তিই উহার পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া, প্রেমভক্তিই হইতেছেন মুখ্য প্রয়োজন তত্ত্ব বা জীবের পরম পুরুষার্থ— যাহা হইতে জীবের অধিক লাভ আর কিছুই নাই।

প্রথম প্রকাশ—সজ্জন-সঙ্গিনী
১৫শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৩৬৩ সাল।

——

ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য

প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা শুনিতে চাহে না, কিছুই গ্রহণ করিতে চাহে না— প্রমাণই সর্ব প্রবৃত্তির মূল। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে, বিশ্বাস হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে এবং প্রবৃত্তিই সকল কর্মের পূর্ববর্তী হেতু ; প্রমাণ অনেক প্রকার থাকিলেও বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রধানতঃ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন— (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ, (২) অনুমান প্রমাণ, (৩) শব্দ প্রমাণ।

আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়া যে জ্ঞান অর্জন করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষ কহি ; যেমন প্রভাতে উঠিয়া পূর্বদিকে সূর্যোদয় দেখিলাম ;

ইহাতে জ্ঞান হইল সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়েন— ইত্যাদি। যাহা হইতে যে বস্তু হইয়াছে বা হইবে বা হয়— এরূপ বুঝিতে পারি, তাহাই অনুমান ; যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, অথবা নদীর পূর্ণতা দেখিয়া জোয়ার হইয়াছে, কিংবা ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে, এরূপ নিশ্চয় করাকে অনুমান কহে। লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের নিদান-ভূত অভ্রান্ত বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসকল যাহা বলিয়াছেন তাহাই শব্দ প্রমাণ। উহাকে আপ্তোপদেশও কহে। প্রমাণ প্রধানতঃ উক্ত তিন প্রকার হইলেও, প্রত্যক্ষ ও অনুমান অপেক্ষা শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান অনেক স্থলেই ভ্রম (যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তদ্রূপ জানা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা),— এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ শাস্ত্র-বাক্যে এই প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ—আদি। ৭) —

মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান সর্বদা "প্রমা" বা অভ্রান্ত জ্ঞান না হইয়া, উহা যে অতি সহজেই দোষদুষ্ট হইতে পারে, সামান্য দুই-একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ সূর্যকে আমরা একখানি স্বর্ণের থালার ন্যায় দেখিয়া থাকি। যাহা দেখি তাহাই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে সূর্যের আয়তন একখানি থালার মতই বলিতে হইবে। সূর্যের আয়তন সম্বন্ধে যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহারা স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুরূপ সূর্যের আয়তন মনে করিয়া থাকে ; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে "প্রমা" বা অভ্রান্ত জ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অগ্নি জল দ্বারা নির্বাপিত হইলেও কিছুক্ষণ তাহা হইতে ধূম উত্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ধূম দৃষ্টে অগ্নির

অনুমান করা যেমন সকল স্থানে অভ্রান্ত অনুমান নহে, সেইরূপ অপরাপর অনুমানও অনেক স্থানে অসত্য হইবারই সম্ভাবনা।

যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা, আমরা সামান্য লৌকিক বিষয় সম্বন্ধেই অনেক সময়ে অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারি না, সেই তুচ্ছ প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলে কি প্রকারে অচিন্ত্য অলৌকিক অনন্ত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু নির্ণয় করিবার দুঃসাহস পোষণ করিতে পারি? ইহা পঙ্গুর শৈল-লঙ্ঘন প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। সুতরাং জানিতে হইবে শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ-স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রই তাঁহাকে নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায়। অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বস্তু নির্ণয়ে শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ।

বেদ ও পুরাণেতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতেই প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।
পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাসূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানি॥
যদৃগবেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।
এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্॥"

— (বৃহদারণ্যকে,—২।৪।১০) —

অর্থাৎ,— অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ মহৎ ভূতের অর্থাৎ বিভুরূপ এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ তাহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

অতএব বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সমুদয়ই শব্দপ্রমাণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত,— রত্নাকরের ন্যায় অতল-স্পর্শী। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত,— ইহার দিক্, প্রান্ত ও সীমা, পরিছিন্ন মানব-বুদ্ধির দ্বারা সহজে নির্ণয় করিয়া উঠা অতীব কঠিন ব্যাপার। দিগন্তবিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত বক্ষে যেমন নাবিক ব্যতীত আর কেহই পথ নির্ণয়ে সক্ষম হয় না, সেইরূপ যাঁহারা

স্থিতপ্রজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ নির্ণয়ে কখনই সমর্থ নহে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-শিরোমণি হইলেও "বাঁশ বনে ডোম কানার" ন্যায় শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য, কি বিধেয় তাহা নির্ণয়ে সাধারণতঃ আমরা অক্ষম। তাই হেমাদ্রি-ধৃত ব্যাস-বচনে উক্ত হইয়াছে,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
— (মহাভারত-বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭)

অর্থাৎ,— তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতি সকলও বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন মত নির্দেশ করেন— ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এমন মুনি নাই যাহার মত অপরের সহিত ভিন্ন নহে। ধর্মের তত্ত্ব অন্ধকার-গর্ভেই নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গমন করেন তাহারই অনুসরণ ব্যতীত ধর্মপথ নিরূপণের গত্যন্তর নাই।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য আবিষ্কাররূপ ব্যাপারটি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই। দুগ্ধ পেয় হইলেও যেমন বস্ত্রপূত দুগ্ধই পানযোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয় হইলেও সদ্‌গুরু ও সাধুমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রবাক্যই গ্রহণীয়, অন্যথা পথভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

সচরাচর আমরা নিজ বুদ্ধি-বলে শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া সেখানে দেখিতে পাই কোথায়ও-বা যজ্ঞাদির প্রাধান্য, কোথায়ও কর্মের প্রাধান্য, কোথায়ও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথায়াও যোগের প্রাধান্য, কোথায়ও-বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। ইহাতে প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; কিন্তু বৈষ্ণবাচার্যগণ আমাদিগকে সেই বেদ, অধিকারী ও ক্রম অনুসারে যে ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি শাস্ত্রতাৎপর্য

গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি, একমাত্র শ্রীভগবানে ভক্তিই বেদ ও বেদানুগত সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য,— ভক্তিই সকল নিগমবল্লীর সংফল। যতদিন না এই ভক্তিফল আস্বাদিত হইতেছে, ততদিন সেই জীবের— তিনি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী যাহাই হউন, তাঁহার পিপাসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি— অপূর্ণতার সম্পূর্ণ পূরণ —অসম্ভব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ, আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও সেই উরুক্রম শ্রীহরিতে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন,— শ্রীভগবানের এমনই গুণ।

অধিকারী-ভেদে সাধনার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য একই— সেই একেরই বিজয়বার্তা বহন করা,— সেই এক-কেই ব্যক্ত করা সকল শাস্ত্রের সম্মিলিত উদ্দেশ্য। যতক্ষণ না ঐক্যতান বাদনের মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাবৎ এক একটি বাদ্য যন্ত্রের পৃথক পৃথক ধ্বনি শুনিয়াই লোকে পরিতৃপ্ত থাকে; নিজ রুচি অনুরূপ এক প্রকার বাদ্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অন্য প্রকার বাদ্যধ্বনিকে বর্জন করিয়া থাকে। সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত সুর— ঐক্যতান উপলব্ধি হইলে, তখন আর পৃথক পৃথক ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা হয় না; তখন সকল শাস্ত্রবাক্যকেই সেই ঐক্যতানের সম্মিলিত সুরে মিলাইয়া দিয়া, সেই মধুর ধ্বনির অমৃত তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

কেন্দ্রস্থল হইতে যে যত নিকটে ও যত দূরে অবস্থিত, কেন্দ্রের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে কেন্দ্রের উপলব্ধি ও তথায় উপস্থিতির তারতম্য হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। কেন্দ্রস্থল হইতে যে যত দূর সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে তথায় ফিরিয়া আসিতে ততই বিলম্ব হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রাকৃত গুণেরও তারতম্যানুসারে জীবের স্বরূপ ভাব

হইতে যথাক্রমে দূর, দূরতর ও দূরতম ব্যবধান ঘটিবার কারণ হইয়া থাকে। উক্ত গুণত্রয়ের তারতম্য ভেদে মনুষ্যের অধিকারেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী— এই গুণত্রয়ের তারতম্য— কেবল জীবের প্রকৃতি ও অধিকার ভেদেরই কারণ নহে,—সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ।

মনুষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণও এই ত্রিগুণের তারতম্য। কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ-বা তমোগুণ-প্রধান। আবার এই গুণত্রয়ের হীন মধ্যাধিক ভেদে ইহার অসংখ্য প্রকার বিভাগ হইতে পারে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের তারতম্যানুসারে যেমন অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ও দোষের বলাবল অনুসারে তাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসাদি যেমন এক প্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, সনাতন ধর্মের লীলা-নিকেতন পুণ্য ভারত-ভূমি ব্যতীত অপর কোনও দেশে এই যুক্তির মূল্য অনুভূত হয় নাই। ত্রিদোষের বলাবল ভেদে দেহরোগের ঔষধাদি বহুপ্রকার হইলেও, ত্রিদোষের সাম্যভাব স্থাপন ও স্বাস্থ্য-সুখ প্রদান যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র সকলের মুখ্যতম প্রয়োজন,— সেইরূপ ভবরোগের চিকিৎসা অধিকারী-ভেদে বহুপ্রকার পরিদৃষ্ট হইলেও সকলের উদ্দেশ্য এক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখ প্রাপ্তি— ইহাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য— ইহাই বেদ ও বেদানুগত নিখিল-শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য। ভক্তিই সেই সুখ-স্বরূপ। ভক্তিই সেই মুখ্য প্রয়োজন।

ভক্তিই যে বেদের মুখ্য প্রয়োজন, বেদের যথাযথ বিভাগ অনুসারে পর্যালোচনা করিলে তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। সমগ্র উপনিষদের সারস্বরূপ মহিয়সী গীতা, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। একমাত্র ভক্তিবাদই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তিবাদেই গীতার পরিসমাপ্তি।

বেদ প্রধানতঃ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত ঃ (১) কর্মকাণ্ড (২) দেবতাকাণ্ড,

(৩) জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড পুনরায় দ্বিবিধ; যথা— সকাম-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম। সকাম-কর্ম পুনরায় ভুক্তীচ্ছা বা ভোগবাসনামূলক ও মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষবাসনামূলক। ভুক্তীচ্ছা ও মুক্তীচ্ছা উভয়ই আত্ম-সুখেচ্ছা তাৎপর্যময় বলিয়া সকাম কর্মের অন্তর্গত। ভুক্তীচ্ছা পুনরায় ঐহিক ও পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। ইহকালে ধন-ধান্য, পুত্র-কন্যা, রাজ্য-সম্পদ, যশ-মান প্রভৃতি প্রাপ্তিকামনা-মূলক শাস্ত্রবিহিত কর্মকে ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম এবং পরকালে স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তি কামনা-মূলক শাস্ত্রবিহিত কর্মকে পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম কহে। উভয়বিধ ভুক্তীচ্ছামূলক কর্মই পুনরায় হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত ভেদে দ্বিবিধ। ঐহিক ও পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা পূরণের জন্য ছাগাদি বলি প্রদান পূর্বক যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই হিংসাযুক্ত ও তদ্‌বর্জিতকে হিংসা-রহিত কহে; সুতরাং—

(১) হিংসাযুক্ত ঐহিক বা পারলৌকিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,—তামসিক।

(২) হিংসারহিত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,—রাজসিক।

(৩) মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,—সাত্ত্বিক।

(৪) নিষ্কাম কর্ম— (অর্থাৎ ফল ভোগ বাসনা রহিত— কেবল ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম) নির্গুণ জ্ঞানের প্রাপক ও চিত্তশুদ্ধিকর।

উক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের সহিত বহু প্রকার দেবদেবীর উপাসনা উপদিষ্ট হইয়া থাকে; ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয়। অধিকারী-ভেদে আবার এই উপাসনাও দ্বিবিধ,— (১) সগুণ উপাসনা ও (২) নির্গুণ উপাসনা। আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনাকে সগুণ উপাসনা ও একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাকে নির্গুণ উপাসনা বলা হয়।

নির্গুণ অর্থে প্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ-রহিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

তামসিক অধিকারী-ভেদে অধিকারানুরূপ বিভিন্ন সগুণ দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার জন্মে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মের পূর্ণতম ভাব।

অধিকারানুরূপ কর্ম ও উপাসনার দ্বারা ও তদনন্তর নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অধিকার লাভ হয়। ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়। এই জ্ঞান আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের নাম পরোক্ষ জ্ঞান বা অপরা বিদ্যা; আর সেই পরোক্ষ জ্ঞানের সারাংশ বা ফলস্বরূপ যাহা,— তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরা বিদ্যা নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। এই পরা বিদ্যা হইতেই সাধনার যাহা সাধ্য—সেই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধা বিদ্যার বা জ্ঞানের বিষয় শ্রুতি এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি— পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা— ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা —যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

— (মুণ্ডক, ১।১।৪)

অর্থাৎ,— ব্রহ্মবিদেরা বলেন, বিদ্যা দুইটি— পরা ও অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ— এই সকল অপরা বিদ্যা; আর যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়— সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই —পরা বিদ্যা।

এই পরা বিদ্যার ফলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ঘটে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই পরা বিদ্যার প্রয়োজন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব সাধকের অধিকার বা ভাবানুরূপ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—(শ্রীভাঃ, ১।২।১১)

অর্থাৎ,— তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয় জ্ঞানকে "তত্ত্ব" বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নির্বিশেষ সত্তামাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলিয়া থাকেন; আর সর্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্তি রূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে "শ্রীভগবান" রূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলস্বরূপ যাহা সেই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রথমতঃ দ্বিবিধ,— (১) নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার ও (২) সবিশেষ বা সবিকল্প সাক্ষাৎকার। সবিশেষ বা সবিকল্প সাক্ষাৎকার পুনরায় দ্বিবিধ,— (১) পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ও (২) শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের নির্বিশেষ সাক্ষাৎকারের নাম 'ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার'; ইহা জ্ঞানযোগীর অধিকার। সবিশেষ 'পরমাত্ম'-সাক্ষাৎকার অষ্টাঙ্গ যোগীর অধিকার; এবং পরিপূর্ণ সবিশেষ "শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার"— ইহাই ভক্তযোগীর অধিকার।

ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ। "ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি।"

— (সিদ্ধান্তরত্ন।)

শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণী। ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞান সেই পূর্ণ জ্ঞানাংশস্বরূপ।

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞান আদি সব যার পরিবার ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৪।৬৭)

বেদের বিভাগ

- কর্মকাণ্ড
  - সকামকর্ম
    - ভুক্তীচ্ছামূলক
    - মুক্তীচ্ছামূলক (৩)
      - ঐহিক
        - হিংসা-মূলক (১)
        - অহিংসা-মূলক (২)
      - পারত্রিক
        - হিংসা-মূলক (১)
        - অহিংসা-মূলক (২)
  - নিষ্কামকর্ম (৪)
- দেবতাকাণ্ড
  - সগুণ (আধিকারিক দেবতা সকলের উপাসনা)
  - নির্গুণ (প্রাকৃত গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা)
- জ্ঞানকাণ্ড
  - পরোক্ষজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র) অপরাবিদ্যা
  - অপরোক্ষজ্ঞান (তত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কারাত্মক-জ্ঞান) পরাবিদ্যা
    - নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার (জ্ঞান— জ্ঞান-যোগীর অধিকার।) (আংশিক)
    - সবিশেষ সাক্ষাৎকার (পূর্ণ)
      - পরমাত্ম-সাক্ষাৎ-কার (যোগ-অষ্টাঙ্গযোগীর অধিকার।)
      - শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎ-কার (ভক্তি-ভক্তযোগীর অধিকার।)

কর্মযোগীর, জ্ঞানযোগীর বা অষ্টাঙ্গ-যোগীর কর্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা ভক্তিবিদ্যা আবৃত নহে; "জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতা।" ইহা সম্পূর্ণ অনন্যাপেক্ষী ও বিশুদ্ধা। ভক্তিই সকল নিগমবল্লীর পূর্ণ ফল;—ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল; অতএব ভক্তিই জীবের সাধ্য বা মুখ্য প্রয়োজন।

বেদের উক্ত ক্রম-নির্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, হিংসামূলক সকাম কর্ম হইতে বেদের কর্মকাণ্ডের আরম্ভ এবং শুদ্ধাভক্তির নির্দেশ করিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অবসান। অধিকারী-ভেদে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম ও তদনন্তর চিত্তের সম্পূর্ণ কষায় ক্ষয়ে (ভোগ ও মোক্ষাভিনিবেশ শূন্য) নিষ্কাম কর্মের ও তদূর্ধ্বে জ্ঞানের সারভূত— অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল-স্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ও তদূর্ধ্বে সবিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার বেদের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হইলেও উহাই মুখ্য প্রয়োজন নহে,— শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই বেদের মুখ্য প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—দরিদ্র ভিক্ষা করে কেন?—অর্থের জন্য। অর্থের কি প্রয়োজন? —অন্নের সংস্থান জন্য। অন্নের কি প্রয়োজন?— ক্ষুধা নিবৃত্তি। ক্ষুন্নি-বৃত্তির কি প্রয়োজন?— সুখপ্রাপ্তি। সুখপ্রাপ্তির কি প্রয়োজন?— সুখ-প্রাপ্তির অন্য প্রয়োজন নাই; সুখপ্রাপ্তিই সুখপ্রাপ্তির প্রয়োজন; এইজন্য সুখপ্রাপ্তিই হইতেছে মুখ্য প্রয়োজন। ভিক্ষা, অর্থোপার্জন, অন্ন-সংস্থান ও ভোজনাদি প্রয়োজন হইলেও সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন,— একমাত্র সুখ-প্রাপ্তিরূপ মুখ্য প্রয়োজনের অনুরোধেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; নচেৎ ভিক্ষাদির কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না। উহা মুখ্য প্রয়োজনের সাধনমাত্র; সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন যাহা,— তাহাই সাধ্য বস্তু।

বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই,—

১। হিংসাযুক্ত ভুক্তীচ্ছামূলক বিহিত কর্ম,

২। হিংসাশূন্য ভুক্তীচ্ছামূলক বিহিত সকাম কর্ম,

৩। মুক্তীচ্ছামূলক বিহিত সকাম কর্ম,

৪। নিষ্কাম কর্ম,

৫। পরোক্ষ জ্ঞান বা অপরা বিদ্যা,

৬। অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরা বিদ্যা,

৭। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

৮। সবিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার।

৯। পরিপূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার। জীবের এতগুলি প্রয়োজন নির্ণীত হইলেও শেষফল স্বরূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যাহা একমাত্র উপায়, সেই ভক্তি বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য বা সাধ্য বস্তু ; আর সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, সুতরাং ঐ সকলই মুখ্য প্রয়োজন বা ভক্তির-ই অধীন।

অধিকারী-ভেদে হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রাপক শুদ্ধা ভক্তি পর্যন্ত শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, সকাম কর্মাদিকে ভক্তির সাধন বলিয়া যেন মনে করা না হয়। তামস অধিকারী, বিহিত সকাম কর্মরূপ সাধন আরম্ভ করিয়া জ্ঞানের হেতুভূত নিষ্কাম কর্মের অধিকার পর্যন্ত ক্রমশ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিলেও শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ পক্ষে একমাত্র মহৎ-কৃপা ভিন্ন অপর সাধনা নাই। ভক্তিই ভক্তির সাধন হওয়ায় শুদ্ধা ভক্তিকে 'স্বরূপসিদ্ধা' নামে অর্থাৎ নিজরূপেই নিজে সিদ্ধ— ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অধিকারী-ভেদে শাস্ত্রবিহিত কর্ম দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া নির্বেদ উপস্থিত হয়, এবং সেই নির্বেদ বা বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিতে পারে, কিন্তু মহৎ-কৃপা ভিন্ন, ভগবৎ-ভক্তি বা ভগবৎ-কথাদিতে অনুরাগ জন্মিবার অন্য কোনও হেতু নাই। অতএব নিষ্কাম কর্মের ফল স্বরূপ বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্য বশতঃ মহৎ-কৃপার ফলস্বরূপ শ্রীভগবৎ-কথাদিতে প্রকৃষ্ট অনুরাগ না হওয়া

পর্যন্ত সংসারী মনুষ্যের পক্ষে অধিকারানুরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিযুক্ত থাকাই কর্তব্য। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(শ্রীভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ—যে পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্যোদয় না হয়, কিম্বা যাবৎ আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র-বিহিত কর্ম সকলই আচরণ করিবে।

অতএব যদৃচ্ছালব্ধ (মহৎকৃপারূপ অতিভাগ্য হইতে উদিত) ভক্তিই নিগম কল্পতরুর পরিপূর্ণ ফল। এইজন্য ভক্তি সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ সম্পদ। যে বস্তু যত সুলভ, তাহার অধিকারীও তত অধিক। ভক্তি সুদুর্লভা বলিয়া ইহার অধিকারী-সংখ্যাও অতি অল্প। সেই অনুপাতে সকাম কর্মী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মীর সংখ্যা অল্প; তদপেক্ষা জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প এবং যোগীর সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অল্প। তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ;—

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে হয় বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

—(মধ্য, ১৯।১৪৬-১৪৮)

শ্রীভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে ;—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

—(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

অর্থাৎ, হে মুনিবর! যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ কোটি সিদ্ধের মধ্যে একজন প্রশান্তাত্মা (ঐকান্তিক) হরিভক্ত সুদুর্লভ।

সুতরাং একমাত্র ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, মহৎ-কৃপাদি ভিন্ন তাহার শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি না হওয়ায়, তৎসাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না; সুতরাং যাঁহারা ভক্তিপথের অধিকার লাভে বঞ্চিত, তাঁহাদিগকে চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্যের ফল যাহা, সেই জ্ঞানমার্গের সাধন-স্বরূপ বিহিত কর্মসকলের অনুষ্ঠান করা একান্তই প্রয়োজন। কোনও অতি ভাগ্য বশতঃ যিনি ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা, উপাদেয়তা, ও সর্ব-শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া তৎ-সেবনে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন, ইহ বা পূর্বজন্ম-লব্ধ মহৎ-কৃপাই তাহার কারণ। কূপমণ্ডুক (ভেক) কূপের আয়তনকেই জগতের সীমা মনে করে; জগতের যথার্থ আয়তনের অনুভবে কূপমণ্ডুক অধিকারী নহে। তাহাকে জগদায়তনের যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করাইতে হইলে ক্রমশঃ যেমন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয় দর্শন করাইয়া পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়, সেইরূপ যে যেমন অধিকারী তৎকালে তাহার পক্ষে সেই ধর্মই উপযোগী ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভক্তিই সকলের শেষ সীমা,—ভক্তিই পরিপূর্ণা ও অপরাপর সাধনের জীবন-স্বরূপিণী। একমাত্র ভক্তিলাভেই জীবের জীবত্বের পূর্ণতম সার্থকতা।

শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেকে ভক্তিকে অপর উপাসনাদির সহিত সমজ্ঞান করিলেও, পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ যে একমাত্র ভক্তিদ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে, অপর কোনও সাধন দ্বারা নহে, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

—(শ্রীভাঃ ৩।৩২।৩৩)

অর্থাৎ বহু গুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ ভগবান উপাসনা-ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তির প্রাধান্যই প্রতিপাদিত হইলেও স্থূল দৃষ্টিতে উহাকে সকল উপাসনার সমতা বিধায়ক উক্তি বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী-কৃত নিম্নোদ্ধৃত কারিকা হইতে উক্ত শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় ;—

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥
যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্ব্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্॥
তথাঽন্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাঽখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃ স্থানীয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থলাভতঃ॥

(শ্রীলঘুভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রঃ ১।৪৭৭-৪৮১)

অর্থাৎ,— এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেই প্রকাশ হইয়া থাকেন। যেমন রূপরসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে প্রতীত হয় ; অর্থাৎ চক্ষু-দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর, ইত্যাদি রূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ একই ভগবান উপাসনা-ভেদে বহুধা প্রতীত হইয়া থাকেন। যেমন দুগ্ধাদির মধুরতা কেবল রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে ; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদির মধ্যে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে

সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে,—তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয় স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ— চিত্তস্থানীয় ভক্তি কিন্তু তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই পরিপূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাই শ্রীদেবর্ষি নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রেও বলিয়াছেন,—

ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥

অর্থাৎ, সেই ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা হইতে ১১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত।
ফাল্গুন ১৩৪০ সাল হইতে চৈত্র ১৩৪০ সাল পর্যন্ত।

বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ

সংসারী জীব মাত্রকেই ত্রিবিধ দুঃখের কোনও এক বা একাধিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে দুঃখ প্রধানত ত্রিবিধ। সংসারে আমাদের যত প্রকার দুঃখ হউক, তাহাকে উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত বলিয়াই জানিতে হইবে। যে সকল দুঃখ দেহ ও মনকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। বায়ু, পিত্ত ও কফরূপ ত্রিধাতুর বৈষম্য হইতে যে দুঃখ, তাহাকে শারীর-আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে, এবং মনকে অবলম্বন করিয়া অনভিপ্রেত বিষয়ের সংযোগ ও অভিলষিত বিষয়ের বিয়োগ জন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই মানস-আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। দস্যু, তস্কর, সর্প, ব্যাঘ্র, বিষ, বৃশ্চিক, অগ্নি, জল, অস্ত্র ও আতপাদি ভূতগ্রাম

হইতে যে-সকল স্বাভাবিক দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। দৈব প্রেরণাবশতঃ অস্বাভাবিক শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষা, বজ্রপাত, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারক, যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ প্রভৃতি অঘটন সংঘটিত হইয়া যে সকল দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহাদিগকেই আধি-দৈবিক দুঃখ বলা যায়। দুঃখসংযোগই জীবের বিপদ হইলেও যখন উক্ত দুঃখসকল ঘনীভূত হইয়া আধিক্য বিস্তার করে, তখনই আমরা তাহাকে 'বিপদ' নামে উল্লেখ করিয়া থাকি। বর্তমান জগৎ এক অভূতপূর্ব বিপদের অবস্থায় সমুপস্থিত হইয়াছে। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নহে— সমষ্টিগতভাবে, এক মহা বিপদজালে সমস্ত জগৎ সমাচ্ছন্ন। এই বিপদ শুধু বাঙ্গালার নহে,— ভারতের নহে,— সমস্ত জগৎ বিপদগ্রস্ত!

বিবিধ শারীর ব্যাধি দ্বারা মনুষ্যসমাজ আজ উৎপীড়িত। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধিসকল এখন 'বার-মেসে' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তদুপরি নিত্য নূতন রোগসকল বিকটাকার বহুরূপীর ন্যায় জগৎকে সন্ত্রাসিত করিতেছে। সর্পাঘাত, বজ্রাঘাত, দস্যুভয়, কুম্ভীর, ব্যাঘ্র ও ক্ষিপ্ত শৃগালাদির উৎপাত; উদ্বন্ধনে, বিষপানে, অগ্নিদহনে, আত্মহত্যা; বিবিধ প্রকারে অপমৃত্যু: কারণে, সামান্য কারণে বা অকারণে নরহত্যা প্রভৃতি দুঃসংবাদে প্রত্যহ সংবাদপত্রের স্তম্ভসকল পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে; ইহার সহিত অভাব, উৎপীড়ন, অত্যাচার, বিপ্লব, বেকার-সমস্যা, হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহ-আগুনে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত। শাসক ও শাসিতে কলহ, ধনিকে ও শ্রমিকে কলহ, প্রাচীন ও নবীনে কলহ, স্ত্রী ও পুরুষে কলহ, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সর্বত্রই হিংসা, বিদ্বেষ— সর্বত্রই কলহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্যের বিষম ঝটিকায় যেন জগতের ধারণ-সূত্র শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাই অস্বাভাবিক ঝড়, বৃষ্টি, জল-প্লাবন, ভূকম্পন, ঘূর্ণীবাত্যা, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা-

প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত, পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। অধিক কি, রুধির বৃষ্টি, ধূলিমেঘ প্রভৃতির সংবাদও দেশ বিদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। জড়বিজ্ঞান ভোগ বিলাসের নিত্য নব নব উপকরণে জগৎ পূর্ণ করিয়া দিলেও মরীচিকায় ধাবমান মৃগের ন্যায় আজ সমস্ত পৃথিবী অভূতপূর্ব ত্রিতাপসন্তাপে দিন দিন অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে, সমস্ত জগৎ যে দিন দিন ঘোরতর বিপদের ভিতর দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? বিশ্বের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বর্তমান জগতের এই বিপদের অবস্থা দর্শনে বিশেষ আশঙ্কান্বিত। এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার উপায় সম্বন্ধে জগতের সকল দেশের মহানুভব মনীষিগণ যথাসাধ্য সচেষ্ট হইলেও কোনও উপায় দ্বারা এই সকল বিপদের প্রতিকার পরিলক্ষিত হইতেছে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল প্রতিকার দ্বারা বিপরীত ফল প্রসূত হইতেছে।

বিপদের মূল কারণ নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত তাহার যথার্থ প্রতিকার কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আত্মধর্মের আকরভূমি ও পরিপূর্ণ বিকাশক্ষেত্র এই পুণ্য ভারতবর্ষে প্রাচীন ঋষিগণ বিপদের প্রকৃষ্ট কারণ যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে যদি আমরা "বিপদ" এই শব্দটির অর্থ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বর্তমান বিশ্বব্যাপী এই বিপদের কারণ সহজেই সুনির্ণীত হইতে পারে। 'বিপদ' —এই কথাটির সহিত বিপদের কারণ সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। কানে কলম রাখিয়া ভ্রমবশতঃ সমস্ত গৃহে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইবার ন্যায়, আমরা এই বিপদের কারণ নির্ণয়ে নানা দিকে নানা ভাবে অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থকাম হইতেছি; কিন্তু 'বিপদ' কথাটির মধ্যেই যে বিপদের হেতু নির্ণীত রহিয়াছে, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না।

বিপদ কি? স্বপদচ্যুতির নামই "বিপদ"। জীবের যাহা "স্ব-পদ", সেই "স্ব-পদ" হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই 'বিপদ' অবশ্যম্ভাবী। যে জীব যে

পরিমাণে স্বপদভ্রষ্ট সেই জীব সেই পরিমাণে বিপদগ্রস্ত ; আবার যে যত অধিক স্বপদ-প্রাপ্ত সে তত অধিক বিপদমুক্ত। "বিপদ" ও "স্ব-পদ" পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাব। একের সংযোগে অপরের বিয়োগ এবং একের বিয়োগে অপরের সংযোগ অনিবার্য।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, জীব ও জড়ের সম্মিলিত অবস্থা,— চেতন ও অচেতনের সমষ্টি। সহজ কথায়, যাহা জ্ঞান বস্তু,— যাহার অনুভব আছে তাহাকেই চেতন, চৈতন্য, বা চিদ্‌বস্তু প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয় ; আর যাহার জ্ঞান নাই,— অনুভব লক্ষণ নাই, তাহাই জড়, অজ্ঞান, অচেতন বা অচিদ্ বস্তু। জাগতিক প্রাণীমাত্রেই চিদ্‌জড়াত্মক বা চেতন ও অচেতন বস্তুর সম্মিলিত ভাব। আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ জড় পদার্থ। ইহারা জীব নহে। জীব জ্ঞানময় বস্তু— চিৎকণ। কর্মফল বশতঃ জীব যখন যে জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই জীবেরই চৈতন্যশক্তি বা চেতনার দ্বারা জড় দেহাদিও সচেতন হইয়া উঠে। কেশাগ্র হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য— অপরিমেয় চিৎ-পরমাণুকেই শাস্ত্র 'জীব' নামে অভিহিত করিয়াছেন,—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
(শ্রীভাগবতে ১০।৮৭।৩০—শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক)

অগ্নি-সংযোগে লৌহ যেমন, নিজে দহন পদার্থ না হইয়াও দাহিকা শক্তি প্রকাশ করে ;— অগ্নির ধর্ম উত্তাপ অন্তর্হিত হইলেই, তাহাতে যেমন আর দাহিকা শক্তি প্রকাশ পায় না, তেমনি চিৎকণ জীবাত্মা ও তদাশ্রয় বিভুচৈতন্য-পরমাত্মা উৎক্রান্ত হইয়া যাইলে, দেহ যে সম্পূর্ণ জড়বস্তু এবং কাহার চেতনায় সেই দেহে শীত গ্রীষ্মাদির অনুভব হইত,— তখন সে-কথা বুঝিতে পারা যায়। দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মবস্তুর অধিষ্ঠান-গৌরবেই দেহাদি হেয় জড়বস্তু হইয়াও যে আদৃত হইয়া থাকে, এই কথা আমাদিগকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

"যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বশিষ্ট ইতি।" (বৃঃ আঃ, ৬।১।৭)।

অর্থাৎ— যে উৎক্রান্ত হইলে, লোকে এই শরীরকে অস্পৃশ্য মনে করে, সে-ই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অতএব জীব যখন দেহরূপ জড়বস্তু নহে,— জীব যখন দেহাতিরিক্ত চিন্ময় বস্তু, তখন যাহা তদাশ্রয় ও তৎস্বজাতীয় অনন্ত— অখণ্ড চৈতন্য বা বিভু চিদ্‌বস্তু, তাহাই অবলম্বন ও আশ্রয়পূর্বক তৎ-সেবনে নিযুক্ত থাকাই জীবের "স্ব-পদ"; আর জড় ভাবকে অবলম্বন করিয়া, জড়ের আশ্রয়ে— জড়ের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকাই জীবের "বিপদ" বলিয়া জানিতে হইবে। জলোৎপন্ন মীনসকলের পক্ষে যেমন জলই "স্বপদ" বলিয়া তাহারা জলকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু স্থল তাহাদের 'বিপদ' স্বরূপ হয়; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ হইতে সমুৎপন্ন জীবের পক্ষে সচ্চিদানন্দের সেবনই 'স্বপদ', এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা, সেই জড়ীয় বিষয়াভিনিবেশ বিপদেরই কারণ হইয়া থাকে। সুবাস যেমন মৃগমদের ধর্ম, সেইরূপ আনন্দই চৈতন্যের ধর্ম। যাহা চৈতন্য, যাহা চিদ্‌বস্তু, তাহাই আনন্দ; যাহা আনন্দ— তাহাই চৈতন্য। পরমাত্মা ও জীবাত্মা চিন্ময় বস্তু; সুতরাং উভয়েই আনন্দময়। মহান বা বিভুচৈতন্য হইতে অণুচৈতন্য জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। 'আনন্দ' চৈতন্যেরই ধর্ম, সুতরাং মহান চৈতন্য হইতে চিৎকণ জীবসকল সমুৎপন্ন অথবা আনন্দরাশি হইতেই আনন্দময় জীবসকল সমুৎপন্ন,— ইহা একই কথা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। —(তৈত্তিরী উঃ, ৩।৬।১)।

অর্থাৎ,— আনন্দ হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে; প্রলয়ে আনন্দ-স্বরূপেই লীন হইয়া থাকে।

সুতরাং আনন্দময়— আনন্দের নিত্যসেবক জীবকে আনন্দ

অবলম্বন করিয়া, বিভু আনন্দের আশ্রয়েই অবস্থান করিতে হইবে ; ইহাই জীবের 'স্বপদ'। পরমানন্দ সেবনের পরিবর্তে জড়ের সেবায় যতই আমরা উন্মুখ হইব,— ততই আমাদের বিপদ হইতে ঘোরতর বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। অণুসচ্চিচানন্দ জীব-('এষোঽণু-রাত্মা—' মুণ্ডকঃ, ৩।১।৯) তদাশ্রয় বিভু-সচ্চিদানন্দকেই ('মহান্তং বিভুমাত্মানং—' কঠঃ, ২।১।৪) অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইহাই জীবের স্বপদ বা স্বভাব। জীব প্রগাঢ় অবিদ্যার প্রতারণায় যদি কেবল ঐহিক সুখাশাসন্তপ্ত হইয়া নিরন্তর জড়ের অভিমুখেই ধাবিত হয়, তবে মরীচিকা-প্রধাবিত মৃগের ন্যায় স্বভাবচ্যুত সেই জীবকে যে অভাব হইতে অনন্ত অভাবেরই সম্মুখীন হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? সচ্চিদানন্দের নিত্যসেবক জীব, যতই জড়বাদ কুহকমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া জড়ের উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হইতেছে, ততই স্বপদ-বিচ্যুত জীব-জগতের পক্ষে বিপদের অন্ধকার আরও ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। চৈতন্যের আশ্রয়রূপ স্বপদ হইতে বিচ্যুত বলিয়াই বর্তমান জগৎ আজ বিপদগ্রস্ত।

যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে,— যাহা অতীন্দ্রিয় বস্তু, তদ্বিষয়ে মনুষ্যসাধারণকে স্বভাবতঃ অনাস্থাবান হইতে দেখা যায় ; আর যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়,— যাহা দৃষ্ট বস্তু,— যাহার প্রভাব ও ফল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এরূপ বিষয়ের প্রতি সাধারণতঃ লোকের আস্থাবান ও আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারাই কেবল জীবের চিদাত্মবোধ ও অতীন্দ্রিয় চিৎ-সত্তার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইয়া থাকে। সেই প্রকৃষ্ট শিক্ষা ও সাধনার অভাবেই আজ জীব জগতে— চিদাত্মস্বরূপ জ্যোৎস্নাকাশের উপর প্রগাঢ় দেহাত্মবাদরূপ মেঘরাশি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে।

এইজন্যই চিদাত্মবিস্মৃত মনুষ্যসমাজের নিকট অতীন্দ্রিয়— সাধন-গ্রাহ্য চিদানন্দ বা চিন্ময় বিষয়ে উপেক্ষা এবং প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ জড়ের

উপাসনা ও আনুগত্যই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে বিভু-চৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার পূর্বক তদন্বেষণ বিষয়ে যে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত, জড়বাদের কুহক মন্ত্রে হতচেতন হইয়া, সেই মনুষ্য-সমাজ অখণ্ড জ্ঞান-তত্ত্বের সন্ধান বিষয়ে বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ জড়ের উপাসনায় অধিকতররূপে অভিনিবিষ্ট হইতেছে। চৈতন্যেরই চিরাশ্রিত জীব স্বীয় আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ বিভু-চৈতন্য বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের সত্তা সম্বন্ধেও অনাদর ও অস্বীকার করিতে উদ্যত! তাই আজ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষ-বাষ্পে জড়োপাসনা-সংরত জীব-জগতের জীবন-শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিতেছে,— এ কথা নিরপেক্ষতার সহিত বর্তমান জগৎ-ব্যাপার স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ কামিনী-কাঞ্চনাদি জড়ের উপাসনায় আত্মহারা— সুতরাং ঘোরতর দেহাত্মবোধবিমুগ্ধ বর্তমান মনুষ্যসমাজ, অতীন্দ্রিয় চিদ্‌বস্তুর সত্তা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অনাদর বা অস্বীকার করিলেও, কোনও অবস্থায় চিদ্‌বস্তুর সত্তা ও সম্মান বিলুপ্ত হইতে পারে না। যাহা নিত্য — যাহা সত্য, তাহা সকল অবস্থাতেই সত্য থাকিবে। দৃষ্ট বস্তু বলিয়া যে জড়দেহকে আদর ও সম্মানপূর্বক অতীন্দ্রিয় চিদাত্মাকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করা হইতেছে, চিদাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে, সেই অদৃষ্ট বস্তুর বিয়োগে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ দেহকেও যখন হেয় বোধে অস্পৃশ্য বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়, তখন অদৃষ্ট বিষয় হইলেও সেই চৈতন্যই যে সর্বাবস্থায় সমাদৃত ও সম্মানিত বস্তু, —ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহার অবস্থিতি কাল পর্যন্তই আমাদের এই জড় দেহ পূতিভাব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরাদি কর্তৃক ভক্ষিত বা অগ্নিসংযোগে ভস্মাকারে পরিণত হয় না, তাহাই চিদ্‌বস্তু— চিদাত্মা; যাহার অবস্থিতি কাল অবধিই আমাদের এই জড় দেহে রস রক্তাদি সঞ্চালিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণ-ক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বল, বর্ণ, আশা, উৎসাহ

ও যাবতীয় অনুভব শক্তি পরিলক্ষিত হয়— তাহাই চিদ্‌বস্তু— চিদাত্মা। যাহার অবস্থিতি-কাল পর্যন্তই আমাদের এই জড় দেহ মূল্যবান বসন ভূষণ, কিংবা মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা শোভিত, আদৃত, অথবা সম্মানিত হইয়া থাকে,— তাহাই চিদ্‌বস্তু— তাহাই চিদাত্মা। আমাদের এই ব্যষ্টি দেহপিণ্ড যে চিদাত্মার সংযোগে রক্ষিত ও বিয়োগে বিনষ্ট হইয়া থাকে সেই চৈতন্যবস্তু বা পরমাত্মার প্রবেশ বা অবস্থিতি বশতঃই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও মহাশূন্যে বিধৃত ও সুরক্ষিত হইতেছে। বিশ্বাত্মারূপে সেই চিদাত্মাই যে কাল পর্যন্ত নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী থাকেন, সেই পর্যন্তই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকল দীপ্তিশালী হয়; সেই পর্যন্তই সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়, নদ, নদী, প্রস্রবণ ও সমীরণ প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং সেই পর্যন্তই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তাদি ঋতুসকলের আবির্ভাব নিবন্ধন ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে শৃঙ্খলা ও সুনিয়মের সহিত বিবিধভাবে, বর্ণে, শোভায় সুশোভিত হইতে দেখা যায়। চিদ্‌বস্তু অতীন্দ্রিয় এবং জড় পদার্থ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা দৃষ্ট বিষয় হইলেও, সেই অদৃষ্ট চৈতন্য বা চিদ্‌বস্তুর সত্তায় সত্ত্বান্বিত জড়ের প্রতি আমরা যে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করি, তাহা জড়ের প্রতি নহে— প্রকারান্তরে উহা চৈতন্যের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু সর্বদা সর্বভাবে চিদ্‌বস্তুই সেব্য ও সম্মাননীয়; কিন্তু জড়বাদ-প্রমত্ত মোহান্ধ জীব, গাঢ়তম অজ্ঞান অন্ধকার বশতঃ নিত্য সেব্য সেই চৈতন্যকে উপেক্ষা বা অস্বীকার পূর্বক প্রত্যক্ষীভূত বিষয় বলিয়া জড়ের সেবায় আজ অভিনিবিষ্ট।

চিৎকণ জীবের পক্ষে বিভুচৈতন্যের অনুগত হইয়া তাঁহার সম্পর্কে তাঁহারই গৌরবে নিখিল বস্তুর প্রতি যে আদর ও আরাধ্য বুদ্ধি, — ইহারই নাম চৈতন্যের উপাসনা; আর জড়াতিরিক্ত চৈতন্যের সত্তায় অনাস্থা ও অনাদর পূর্বক কামিনী, কাঞ্চন, দেহ, গেহাদি জড় বিষয়ে যে প্রবল আসক্তি ও আদর, ইহাই প্রকৃত পক্ষে জড়োপাসনা।

ব্যবহার জগতে— লৌকিক আচরণের মধ্যেও যে আমরা আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে, তন্নিবৃত্তির আশায়, উৎকৃষ্টতর চৈতন্য বা চিৎশক্তিরই শরণাপন্ন হইয়া থাকি, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। কোনও বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারিয়া যখন কাহাকেও কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির সৎপরামর্শ লইতে হয়; কিংবা রোগ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের অথবা মামলা মোকদ্দমাদি ব্যাপারে ব্যবহারজীবীর শরণাপন্ন হইতে হয় তখন সেই সেই জড়দেহ-বিশিষ্ট দৃষ্ট ব্যক্তিরই শরণ লইতেছি বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা তদন্তর্গত চিৎকণ বা চৈতন্যেরই শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অপর কিছুই নহে; যেহেতু চিদাত্মা-পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির কেহই শরণাপন্ন হয় না। সামান্য বিপদে আপদেও যখন আমাদের চিৎকণের শরণাপন্ন না হইলে চলে না, তখন বিভুচৈতন্যই যে জীবের একান্তই শরণ্য, একথা অধিক উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

সকল দিক দিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিষয় নহে বলিয়া যে চৈতন্য পদার্থকে উপেক্ষাপূর্বক প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড় বিষয়ে আমরা আস্থাবান ও আসক্ত হইতেছি সেই জড়ের সত্তা ও সমাদর যাহা কিছু সমস্ত চিৎসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এতাদৃশ চৈতন্যের আশ্রয় বা অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা যে জড়ের সেবায় উন্মত্ত গতিতে ধাবিত হইতেছি,— ইহাই জড়বাদরূপ ঘনীভূত অবিদ্যার ফল।

অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক চিৎ-শক্তির উপর বিশ্বাস পূর্বক, তাহার উপাসনা বা আনুগত্যই চৈতন্যের উপাসনা; আবার সাক্ষাৎ চৈতন্যের আনুগত্য না হইলেও, তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, তাহার সহায়তা ও আনুকূল্য প্রাপ্তির আশায়, তদধিষ্ঠানস্বরূপ যে, অগ্নি, জল, সর্প, গ্রহ, পিশাচাদি ও প্রাকৃত দেবতাদি জড় বস্তুর উপাসনা,— তাহা জড়োপাসনা নহে,— অবিধিপূর্বক হইলেও প্রকারান্তরে উহা চৈতন্যেরই

উপাসনা; কিন্তু জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র চিৎসত্তা অস্বীকার ও উপেক্ষা পূর্বক, ঐহিক তুষ্টি ও দৈহিক পুষ্টি বিধান তৎপরতায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধন, ধান্য, কামিনী, কাঞ্চন, শিল্প, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাদি শুদ্ধ জড় বিষয়ের প্রতি বর্তমান মানব সমাজের যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও আসক্তি — তাহাই প্রকৃষ্ট জড়োপাসনা। ঐহিক সুখাশাসন্তপ্ত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফল স্বরূপ জড়বাদ বা ভোগবাদ প্রমত্ত বর্তমান জগৎ, অতীন্দ্রিয় বিষয় নিবন্ধন আজ জড়াতিরিক্ত চৈতন্যের সন্ধান-শূন্য হইয়া, প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড়ের সেবায় যতই অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়িতেছে— চিৎকণ জীবের যথার্থ আত্মভাব বা আধ্যাত্মিক ধর্ম, এইভাবে বিচ্যুত হওয়ায়, তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জগতের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ধর্মবন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ায়, তৎফল স্বরূপ বর্তমান জগৎ প্রত্যহ— প্রতিক্ষণে বিপদ হইতে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতেছে। সমষ্টিগত ভাবে আজ বিভু চৈতন্যে অনাস্থা ও অবিশ্বাস এবং জড়ে প্রগাঢ়তম আস্থা ও আসক্তি,— ইহাই জীবশ্রেষ্ঠ মানব জাতির পক্ষে স্বপদচ্যুত ও বিপদগ্রস্ত হইবার মূল কারণ।

জীব নিজে চিৎকণ বলিয়া তদপেক্ষাও কোন শ্রেষ্ঠতর চৈতন্য বা জ্ঞান স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তদানুগত্য প্রভৃতিকে "চৈতন্যের উপাসনা" বলা যায়। অণু-চৈতন্য জীবের পক্ষে তৎ-স্বজাতীয় বা তদাশ্রয় বিভুচৈতন্যের সেবকরূপে অবস্থিতিই 'স্বপদ' বা 'স্বধর্ম'। এই 'ধর্ম' বা 'চৈতন্যের উপাসনা' আবার 'সগুণ' বা নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। চৈতন্যের উপাসনা হইয়াও যে উপাসনা জড় সম্বন্ধযুক্ত তাহারই নাম 'সগুণ উপাসনা' বা 'সগুণ ধর্ম'। যেমন ধন, ধান্যাদি ঐহিক কিম্বা স্বর্গভোগাদি পারলৌকিক জড়ীয় বিষয়-সুখ-প্রাপ্তি কামনায় শ্রেষ্ঠতর চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন দেবতাদির উপাসনা। ইহাতে নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞানশক্তির শরণাগতিরূপ উপাসনা

লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সাক্ষাৎভাবে নির্গুণ বিভু চৈতন্যের উপাসনা নহে; যেহেতু উহা জড়ভাব— জড় সম্বন্ধের দ্বারা ব্যবহিত। সগুণ উপাসক সকল অজ্ঞানতা বশতঃ উপাস্য দেবতাদি হইতেই কাম্যফল সকল প্রাপ্ত হইতেছি বলিয়া মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে সেই সকাম উপাসকের কাম্য-ফল সকল জড়াতিরিক্ত নির্গুণ বিভু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই গুণাতীত বিভু-চৈতন্যই নিজ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জড়ীয় বিষয় সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও নিখিল পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিজে বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়াঃ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবৎতু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

—(গীতা, ৭।১৯—২৩)

অর্থাৎ,— আর্তাদি ভক্ত বহু জন্মের পর জ্ঞানবান হইয়া আমাকে ভজন করেন। "বাসুদেব সর্বময়" এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্যক্তি এই সংসারে সুদুর্লভ।

বিবিধ কামনা দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, তাহারা বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া, নিজ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া অন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়।

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতানুরূপ মদীয় মূর্তি অর্চনা করিতে অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবতা বিষয়িণী অচলা শ্রদ্ধাই প্রদান করি।

সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মূর্তির আরাধনা করে। পরে সেই সেই দেবতার আরাধনা হইতে মৎকর্তৃক বিহিত সেই সকল কাম নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে।

সেই অল্পবুদ্ধি দেবতান্তরসেবীদিগের সেই ফল নশ্বর। দেবযাজিগণ সেই সব অনিত্য দেবতাকে লাভ করে; আমার ভক্ত সকল কিন্তু ফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জড়ীয় বিষয় সম্বন্ধ বা বিষয়সুখ-বাঞ্ছাশূন্য হইয়া জীবের পক্ষে যে গুণাতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপাসনা— তাহাই "নির্গুণ উপাসনা" বা "নির্গুণ ধর্ম"। এই জড় হইতে ভিন্ন বা নির্গুণ ও অখণ্ড শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব" নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়া থাকেন;—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(শ্রীভাঃ ১।২।১১)

তাৎপর্যার্থ— তত্ত্ববিদ্‌গণ অখণ্ড চৈতন্য বস্তু বা অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। অদ্বয়-জ্ঞানরূপ তত্ত্ব যখন নির্বিশেষরূপে প্রকাশ হয়েন, তখন জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ হইলে অষ্টাঙ্গযোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন এবং সর্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান বলেন। অর্থাৎ একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকে যখন কেবল জানা যায়, কিন্তু দেখা ও পাওয়া যায় না, সেই অবস্থায় তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' আখ্যায় নির্দেশ করা হয়; যখন জানা যায় ও অন্তর্যামিরূপে দেখা যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না, সেই অবস্থায় তাঁহাকে 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়; আর

যখন জানা যায়, অন্তরে ও বাহিরে দেখা যায় এবং পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকেই ভগবান বলিয়া কীর্তন করা হয়। একই জ্ঞানতত্ত্ব বা বিভু সচ্চিদানন্দ বস্তু যে-সাধনায় কেবল জানা যায় তাহাই 'জ্ঞান,'— যে-সাধনায় জানা ও দেখা যায় তাহাই 'যোগ' এবং যে-সাধনায় জানা, দেখা ও পাওয়া যায় তাহাই 'ভক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবৎসেবায় একমাত্র হেতুভূত ভক্তিই জীবের পরিপূর্ণ 'স্বপদ' বা 'পরম ধর্ম'।

বিভু-চৈতন্য বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে সগুণভাবে আশ্রয় বা উপাসনা করা "স্বপদ" বা "স্বধর্ম" হইলেও সেই সগুণ ধর্ম হইতে নির্গুণ ভাবে আশ্রয় বা উপাসনা করা জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর "স্বপদ" বা "স্বধর্ম"। আবার সেই নির্গুণ ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও "ভগবান"— এই প্রকাশত্রয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতার আধিক্য থাকায় ভগবদ্রূপ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যই বিভু সচ্চিদানন্দতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং যে-উপাসনা বা ধর্ম দ্বারা সেই ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশিত হয়েন, (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ— শ্রীভাঃ ১১।১৪।২১) সেই ভক্তিই জীবের পরিপূর্ণ "স্বপদ" বা "স্বধর্ম"।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(শ্রীভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ, যে ধর্ম হইতে ভগবানে অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্যা ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মিয়া থাকে— সেই ধর্মই মানবগণের পরম ধর্ম — তাহা দ্বারা আত্মার সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

বিভু-সচ্চিদানন্দ বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের ভগবদ্রূপ প্রকাশই পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও মৎস্য-কূর্মাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দের পূর্ণতম স্বরূপ। (এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।— শ্রীভাঃ ১।৩।২৮)। অতএব পূর্ণতম ভগবান

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই বিবিধ ভাবাপন্ন জ্ঞানতত্ত্বের মূল উৎস। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ-উৎস হইতেই নিখিল সচ্চিদানন্দধারা উৎসারিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্য বা জ্ঞান বস্তুর ও সকলেরই মূল কারণ ;—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। (ব্রঃ সং)

অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদির আদি, সুরভি সকলের পরিপালক এবং সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ।

নিরাকার ও নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের পরিপূর্ণ সাকার ও সবিশেষ প্রকাশ যাহা, তাহাই শাস্ত্রে "ভগবান" বলিয়া কীর্তিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্মাদি ভগবন্মূর্তিসকল নির্গুণ ও অখণ্ড বা এক হইয়াও উক্ত প্রকার বিবিধভাবে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় সেই সকল ভগবৎ-বিগ্রহকে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ প্রাকৃত দেবতা, মনুষ্য বা মৎস্য-কূর্মাদির ন্যায় জড়ীয় আকার বলিয়া মনে করে, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথাই গীতায় শ্রীভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ;—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥—(৭।২৪)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবান বলিতেছেন, আমি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য বিষয় নহি। ভক্তের প্রতি কৃপা করিবার জন্য লীলায় যে শ্রীবিগ্রহসকল প্রকট করিয়া থাকি, আমার সেই সর্বোত্তম সচ্চিদানন্দময় নিত্যরূপ অবগত না হইয়া অজ্ঞ লোকসকল আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য, মীন ও কূর্মাদি ভাবাপন্ন মনে করিয়া থাকে।

অতএব মূর্ত বস্তু হইলেও, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবন্মূর্তির উপাসনা ও জড়ীয় অধিষ্ঠানে— জড়ীয় ভাব দ্বারা ব্যবহিত সচ্চিদানন্দের উপাসনা— উভয়ে অনেক পার্থক্য। পার্থক্য থাকিলেও উভয় প্রকার

উপাসনাই যে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট অর্থাৎ বিধিপূর্বক ও অবিধিপূর্বক চৈতন্যেরই উপাসনা— অতএব 'ধর্ম',— তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দের শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠতম "স্বপদ"। চৈতন্যে বিশ্বাস ও ভক্তিই জীবের "স্বপদ" হইলেও, যে বিশ্বাস চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতর স্বরূপের প্রতি যত অধিক বিস্তৃত— তাহা তত শ্রেষ্ঠতর "স্বপদ" বা "ধর্ম"।

জীবশ্রেষ্ঠ সুসভ্য মানবজাতির পক্ষে শ্রীভগবানকেই চৈতন্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তিকেই পরিপূর্ণ "স্বপদ" বা পরম ধর্ম বলিয়া বিদিত হওয়া আবশ্যক। এই ভগবৎ-বিশ্বাস হইতেই জীব ও জড় জগৎ বিধৃত হয় বলিয়াই ইহার নাম "ধর্ম"। (ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। —মহাভারত।) ভগবৎ-বিশ্বাস বা ধর্মপালনের দায়িত্বভার একমাত্র হিতাহিত, ধর্মাধর্ম নির্বাচনসমর্থ মনুষ্যজাতির উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে। এই জন্যই চরাচর সর্বজীব সৃষ্টি করিয়াও বিধাতার চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই, যে পর্যন্ত তিনি চৈতন্য ও জড়ের পার্থক্য বোধসম্পন্ন ও ভগবৎ-আরাধন-সমর্থ মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি না করিয়াছিলেন। বিবেকহীন মনুষ্যেতর প্রাণিসকল অজ্ঞান তমোভাবের গভীর অন্ধকারে নিপতিত থাকায়, তাহারা স্বাভাবিক বিপদগ্রস্ত। যদ্দ্বারা জীব ও জড় জগৎ বিধৃত বা সুরক্ষিত হয়, সেই "ধর্মকে" পালন করিবার দায়িত্ব একমাত্র মনুষ্য সমাজেরই— মনুষ্যেতর অপর জীবের নহে।

ব্যষ্টিজীব বা প্রাণী মাত্রেই (১) জড়ীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়, (২) ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও (৩) চিৎকণ আত্মা— এই ত্রিবিধ ভাবের মিলিত অবস্থা। উক্ত ত্রিবিধ ভাবকে যথাক্রমে ভূতভাব, দেবভাব ও আত্মভাব কহে। জগৎ এই ভাবত্রয়ের সমষ্টি। ভূতভাব, দেবভাব ও আত্মভাব— এই ত্রিবিধ ভাবের সম্মিলিত ও সাম্যাবস্থা হইতে জীব ও জগদ্দেহ ধৃত হয়,— "স্বপদে" প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার নাম

"ধর্ম"। তিনটি দণ্ড যেমন পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরকে অবলম্বন পূর্বক দণ্ডায়মান থাকে কিন্তু কোনরূপে একটি বিচ্যুত হইলে অপর দুইটিরও বিচ্যুতি যেমন অনিবার্য হইয়া পড়ে, তেমনি আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক— এই ত্রিবিধ ধর্মের সাম্যাবস্থার উপর বিশ্ব-চরাচর সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জীবাত্মায় বা জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যসমাজে ভগবৎ-বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক ধর্ম বিন্যস্ত। মানব হৃদয়ে শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তিশিখা যতই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে,— এই আধ্যাত্মিক ধর্মের বিচ্যুতি ঘটিলেই তৎফলে কেবল আধ্যাত্মিক দুঃখসকলই যে বহুল পরিমাণে দেখা দিবে, তাহা নহে, তৎসহ আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক দুঃখেরও প্রবল আবর্তের ভিতর জগতকে ততই আবর্তিত হইতে হইবে,— তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিয়মাধীনে আধিদৈবিক ভাব বা দৈবাধীনে পরিচালিত হইয়া, আধিভৌতিক ভাব বা ভৌতিক জগৎ, আধ্যাত্মিক ভাব বা জীব জগতের, বিশেষভাবে জীব-প্রধান মনুষ্যজাতির ভোগ সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে। মানব হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হইতেই, ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বিবিধ ভোগ সম্পাদনে মানবসমাজকে প্রতিপালন করা সার্থক হইয়া থাকে। ("বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা")। শ্রীভগবান কেবল ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হয়েন। একমাত্র ভক্তিই ভগবানের উপজীব্য; (ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। শ্রুতিঃ) জীব চিদ্‌বস্তু বলিয়া জীবেই ভক্তির উদয় সম্ভব হয়; জড় অচিদ্ বস্তু; সুতরাং জড়ে ভক্তির বিকাশ হয় না। জীবজগৎ অন্তর-সঞ্চারিত ভক্তিমকরন্দের দ্বারা ভক্তিবশ শ্রীভগবানের ভোগ সাধন করিবে বলিয়া এবং সেই সকল ভক্তজীবের আকর্ষণে প্রকটিত শ্রীভগবানের সুদুর্লভ পদকমলের স্পর্শলাভ ঘটিবে বলিয়াই ভূতধাত্রী বসুন্ধরা জীবের ভোগসাধন করিয়া সার্থক হয়েন; দৈবভাব বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও এই উদ্দেশ্যে ভূতভাবকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক আনন্দিত হইয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক ভাব বা জীব জগৎ যদি ভগবদ্ভক্তি ভাব বা 'স্বপদ' হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে,— যদি সমষ্টিগত ভাবে মনুষ্যসমাজ দুর্দৈব বশতঃ চৈতন্যের— শ্রীভগবানের সেবকবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া, কেবল নিজেকে জড়ের সেব্য বোধে জড়ীয় বিষয়-সুখ-সেবন-তৎপর হয়, তবে এইরূপ ভাবে সচ্চিদানন্দের অবমাননাজনিত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ, দৈব প্রেরণায়, ভূতভাবসমূহের মধ্যে এক ঘোরতর বিপ্লব— এক অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলতা জাগিয়া উঠিলে, তৎকালে স্বপদচ্যুত বিশ্বমানবের পক্ষে আধ্যাত্মিক বিপদের সহিত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদাবর্তে নিপতিত হওয়া স্বভাবিক কি না, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা ভাবিয়া দেখুন,— ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

জড়বাদমূলক শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফলে আজ সমষ্টিগত ভাবে মনুষ্য সমাজের অন্তরে নাস্তিকতার বিষবাষ্প প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন-ভাবে সংক্রামিত। ভগবৎ-বিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তিরূপ "স্বপদ" হইতে বিশ্বমানব এইভাবে বিচ্যুত হইয়া পড়ায়, ধর্মবন্ধন বা ধারণরজ্জু শিথিল হইয়া বর্তমান জগতকে ততই বিপদের পর সমধিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। যে পর্যন্ত মূল ব্যাধির প্রতিকার না হয়, যে পর্যন্ত জড়ের উপাসনা-প্রমত্ত বা অস্বাভাবিক বহির্মুখতা-প্রাপ্ত জীবজগৎ ভগবদ্ভক্তি বা স্বপদের দিকে অন্তর্মুখ না হয়, সে পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদিগকে বিপদ হইতে মহাবিপদকে আলিঙ্গন করিতে হইবে।

পৃথিবীর অপর সকল দেশ হইতে পুণ্য ভারতভূমির বৈশিষ্ট্য এই যে কোনও এক স্মরণাতীত কাল হইতে আধ্যাত্মিক ধর্মের সাধন-ভূমিরূপে এই দেশ সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষই ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভক্তির আকর ভূমি। আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্মতম চিন্তা— আত্মধর্মের পূর্ণতম বিকাশ একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীর অপরাপর দেশে আত্মধর্মের

যে কিছু আভাস পরিদৃষ্ট হয়, তাহার জন্য সকল দেশই, যে কোন ভাবে হউক, ভারতের নিকট ঋণী ; ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ভোগের পথে নহে— ত্যাগের দ্বারাই ভারত-ভূমি ভোগ-প্রধান জগতকে বিস্মিত করিয়া নিখিল বিশ্বের নিকট আদর্শ ধর্মক্ষেত্ররূপে সম্পূজিত ও সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের বেদ অনাদি সিদ্ধ সম্পদ। পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মতেও অন্ততঃ উহা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থের স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্য। এই আধ্যাত্মিক ধর্মের সাধন-ভূমি ভারতের সনাতন ধর্মশাস্ত্র পৃথিবীর অপর সমস্ত দেশকে "ভোগভূমি" রূপে ও কেবল ভারতবর্ষকেই "কর্মভূমি" বলিয়া সগৌরবে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; ("অত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্র-মুদাহরন্তি। শ্রীভাঃ ৫।১৭।১১)।

ভারতীয় আর্য ঋষিগণের সন্তান যাঁহারা সমুদয় মানবজাতির মধ্যে তাঁহাদিগের কর্তব্যের অসাধারণ দায়িত্ব আছে। আধ্যাত্মিক জগতের জীবশ্রেষ্ঠ নিখিল মানবাত্মার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে অন্ন ও যে জল একান্তই আবশ্যক ত্যাগের সাধনায় সেই জ্ঞান ও ভক্তি সঞ্চয় পূর্বক, তদ্দ্বারা কেবল নিজেদেরই নহে— বিশ্ব-মানবের ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মার তৃপ্তি বিধান করাই সেই দায়িত্ব। আধ্যাত্মিক ধর্ম-জলধি স্বরূপ ভারতবর্ষ যদি স্বভাবচ্যুত না হয়, তবেই জগদাকাশে ধর্ম-মেঘের সঞ্চার সহজ ও সম্ভব হইতে পারে।

ভারতের আধ্যাত্মিক সূর্য অস্তমিত হইলে তৎফলস্বরূপ কেবল ভারতবর্ষেই নহে,— নিখিল জগতকেই সে অন্ধকার ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই ; সুতরাং ভারত-সন্তানের শিক্ষা ও সাধনা পৃথক,— কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বতন্ত্র— এ কথা কেবল আমাদেরই নহে,— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশবাসিগণের পক্ষেই স্মরণ রাখা একান্তই আবশ্যক। উৎসধারা বন্ধ হইলে যেমন কেবল তাহাকেই শুষ্কতা ভোগ করিতে হয় না, তৎসানুপ্রদেশকেও যেমন সেই শুষ্কতার

জ্বালা পূর্ণরূপেই উপভোগ করিতে হয়, সেইরূপ ভোগ-ভূম্যধিবাসি-গণের নিক্ষিপ্ত ভোগবাদ রূপ মৃৎরাশি দ্বারা জীব জগতের "জীবনোৎস" বা আধ্যাত্মিক ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজ যতই বিড়ম্বিত ও অবরুদ্ধ হইতেছে, তাহার অনিবার্য ফলে, কেবল ভারতেরই নহে,— সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট শুষ্কতা,— আত্ম্যাধিক জগতে এক দারুণ অশান্তি ততই অধিকতর রূপে জাগিয়া উঠিতেছে। "ভোগভূমি" হইতে ভোগবাদরূপ সুরা-প্রবাহের প্লাবন আসিয়া আজ ত্যাগের বিমল সাধন-ভূমিকে— আধ্যাত্মিক যজ্ঞের পবিত্র যজ্ঞশালাকে প্লাবিত করিতেছে— পাশ্চাত্য সভ্যতা রূপ সেই সহজলভ্য মদিরা-পানে প্রমত্ত হইয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতম সাধক জাতি যাহারা,— ভগবৎ-প্রেমভক্তির সংরক্ষক ও প্রবর্তক যাহারা, তাহারাই আজ "স্বপদ"-ভ্রষ্ট হওয়ায়, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে কেবল ভারতবর্ষই নহে— সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক ভাব আজ বিপদাপন্ন। পাশ্চাত্য রীতি, নীতি, শিক্ষা, সভ্যতা, আচার, ব্যবহারের আমূল অনুকরণের ফলে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় আমরা আজ বিপন্ন ও অধঃপতিত হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভারতের জাতীয় চরিত্রের এই ঘোর বিপর্যয় ও অধঃপতন ঘটাইয়া যে-সকল পাশ্চাত্য জাতি বিজেতার গৌরব অনুভব করিয়া থাকে, তাহারা এখনও বুঝে নাই, এই ক্ষতি কেবল ভারতেরই নহে,— বিশ্বের জীবন-উৎসকে এই ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া আজ বিশ্বমানব প্রাণহীন হইতে বসিয়াছে! সমস্ত জগতের মানবাত্মা আজ শুষ্কতার তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছে।

প্রেতাত্মা যেমন নরকাগ্নিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করে, সেইরূপ ভোগবাদকে কেন্দ্র করিয়া চিদাত্মা-বিস্মৃত, সুতরাং প্রগাঢ় জড়াত্মবোধ-নিবন্ধন বর্তমান শবতুল্য মানবসমাজের এই যে অবিশ্রান্ত নর্তন চলিতেছে, ইহা আনন্দের নৃত্য নহে, অতৃপ্ত আত্ম-জ্বালার উল্লম্ফন মাত্র। চৈতন্যের অবমাননা বা নাস্তিকতা হইতে আজ সমস্ত পৃথিবীতে

যে আত্মজ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তৎ-প্রতিকারের জন্য "নগ্ন সমিতি", "সহ-স্নানাগার" প্রভৃতি ভোগবাদের চরম পন্থা অবলম্বনেও সেই অতৃপ্তির আগুন নির্বাপিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একমাত্র আত্মধর্ম বা ভগবৎ-বিশ্বাস রূপ মেঘাম্বুবর্ষণ ভিন্ন বিশ্বব্যাপী তৃষিত জীব-চাতকের এই অভাব-অতৃপ্তি-অশান্তি,— এই তীব্র আত্ম-জ্বালা জুড়াইবার অপর কোনও বারি নাই। যে মেঘাম্বু বিশ্বমানবকে এইভাবে দহন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ সেই মেঘরাশি ভারতের আধ্যাত্মিক সিন্ধু হইতেই জগদাকাশে সঞ্চারিত হইত; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা-সূর্যের প্রখর কিরণসম্পাতে সেই সিন্ধুও আজ শুষ্কপ্রায়; আত্মাবমাননার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই অশান্তির আগুনে কেবল ভারতবর্ষকেই পরিদগ্ধ হইতে দেখিলে, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে যাহারা আজ জয় করিয়াছে, সেই সকল পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে উহা কিছুই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত না-ও হইতে পারিত, কিন্তু সেই অনলে আজ পাশ্চাত্য জগতের অন্তরাত্মাকে আরও অধিকতর রূপে সন্তপ্ত করিতেছে, সুতরাং এই বিপদে— এই ঘোরতর দুর্দিনে আত্ম-ধর্মের সিন্ধুস্বরূপ ভারতের দিকে তৃষিত নেত্রে তাকাইবার দিন আগত-প্রায় হইলেও, পাশ্চাত্য জগতের এই অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁহারা ভারতের দিকে চাহিলেও সেখানে বালুকাস্তূপ ভিন্ন যে বিশেষ আর কিছু দেখিতে পাইবেন না, হয়তো একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

বিগত ১৯৩৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইতালীর রোম নগরে যে প্রাচ্য ছাত্র-সম্মেলন আহুত হয়, তাহাতে ইতালীর প্রধান রাষ্ট্রনায়ক সিনর মুসোলিনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের পূর্বোক্তিসকলের সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে কোনও সহায়তা হয় কি না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই অনুরোধ। সিনর মুসোলিনী তাঁহার বক্তৃতায় একস্থলে বলিয়াছেন, "আজ প্রাণহীন ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তে প্রাণবন্ত আত্মিক বলে বলীয়ান নূতন

সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রাচ্যের সহায়তা কামনা করি।"

— (আনন্দবাজার পত্রিকা। ১২ই জুন, ১৯৩৪ ইং)

প্রাণহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি ফিরাইবার জন্য পাশ্চাত্য আজ প্রাচ্যের সহায়তা চাহিলেও, জাতীয় ভাবহারা প্রাচ্যের নিকট হইতে গিলিত পাশ্চাত্য সভ্যতারই অজীর্ণ উদ্গার ভিন্ন এই অদিনে পাশ্চাত্য জগৎ আর অধিক কি আশা করিতে পারে জানি না! যতদিন জগতে জড়ের উপর চৈতন্যের সম্মান প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন জগতের নিকট ভারতসন্তানগণ গুরুর গৌরব অর্জন করিয়াছে। আজ যে-শিক্ষার ফলে চৈতন্যের অবমাননা ও জড়ের সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাচ্য জগৎ আজ তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট-ভোজী শিষ্য; সুতরাং শিষ্যবর্গের নিকট গুরুবর্গ আজ আর কোন্ শিক্ষা লাভ করিবার আশা করেন?

ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল সমুন্নত আধ্যাত্মিকতায়— প্রগাঢ় ভগবৎ-বিশ্বাসে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, রাজ্য— ভারতের সকলই ছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিল ভগবদ্ভক্তি— সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও অনুগতি। ইহাই ছিল জাতীয় জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ আদর্শ; আর যাহা কিছু সমস্তই এই মুখ্য উদ্দেশ্যেরই অধীন বা তৎসাধনরূপেই বিবেচিত হইত। যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান, যে নীতি, যে ধর্ম, যে কর্ম ভগবৎ-সম্বন্ধ-পূত নহে,— তাহা যাহাই হউক— যত বড়ই হউক, আমাদের জাতীয় আদর্শের নিকট কখনই সম্মানিত বা সমাদৃত হয় নাই, বরং বিষবৎ হেয় ও বর্জনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। সকল কার্যের সহিত ভগবৎসম্বন্ধের সংযোজনা— ইহাই ছিল ভারতের মূল নীতি; ('সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ')। লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের আকরস্বরূপ হইয়াও ভারতের পুণ্য বেদ সমস্ত জ্ঞান ও সকল কর্মের একমাত্র ভগবৎ-পরতাই ঘোষণা করিয়াছেন; ('সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি'— শ্রুতি; কঠঃ ২।১৫) অর্থাৎ সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন এবং শ্রীভগবানই

সেই পূজনীয় ("নারায়ণ-পরা বেদাঃ—", শ্রীভাঃ, ২।৫।১৫) এই বলিয়া বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের শ্রীভগবৎ-পরতাই কীর্তিত হইয়াছে। সর্বদা, সর্বভাবে ও সর্বাবস্থায় জীবের পরমাশ্রয় শ্রীভগবানকেই স্মরণ রাখিয়া সকল কার্য করিতে হইবে, ইহাই আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের সকল বিধি ও নিষেধের মূল উদ্দেশ্য।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

— (পাদ্মে, ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮)

অধিক কি, যে মুহূর্ত বা ক্ষণকাল শ্রীভগবান কীর্তিত বা স্মৃত না হয়েন, তাহাকেও ব্যর্থকাল বলিয়া মনে করা হইত ;—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ॥

— (গারুড়ে, ১।২৩৪।২৩)

পৃথিবীর অপর সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের ইহাই— এই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশে ধর্ম-নীতিকে বাদ দিয়াও সমাজনীতি ; রাজনীতি ; অর্থনীতি ; শিক্ষা-নীতি ; প্রভৃতি সমস্ত কর্মই চলিতে পারে ; কিন্তু কেবল এই আধ্যাত্মিক ধর্মের সংরক্ষক ও শ্রেষ্ঠতম সাধক-জাতির জাতীয় চরিত্র যে পর্যন্ত অবিকৃত ছিল— স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে পর্যন্ত উহা অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।

ভারতের জাতীয় আদর্শ ও তাহার বিচ্যুতির বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারা যাইলেও সংক্ষেপে আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ভারতবর্ষে কেবল যে ধর্মগ্রন্থই রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এখানেও কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইলেও পাশ্চাত্য রীতির ন্যায় এই সকল গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া

বিবেচিত হয় নাই। যে কোনও ভাবে হউক, ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট জানিয়া ও ধর্মের সহায়করূপেই এখানে সমস্ত গ্রন্থই রচিত হইত। এই জন্যই এ দেশের প্রায় যে কোন গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভগবৎ-স্মৃতিরূপ মঙ্গলাচরণ দ্বারা বিভূষিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য দেশে এই রীতির কোনও সার্থকতা অনুভূত হয় না। আধুনিক কালে ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত এই ভারতবর্ষে যে-সকল বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে তাহা জাতীয়তার বিরোধী নহে; কিন্তু যদি তাহার প্রারম্ভে ভগবানকে স্মরণ করিবার সৎসাহস ও প্রয়োজনবোধ না থাকে, তবে সেই ভগবৎ-সম্বন্ধ-বর্জিত গ্রন্থসকল যে ভারতের জাতীয় ভাবধারার বিরোধী—একথা বলিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই।

সমস্ত কর্ম বর্জন পূর্বক প্রাচীন ভারতে যে কেবল আধ্যাত্মিক ধর্মই অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, প্রত্যেক কর্মের সহিত ধর্মসম্বন্ধ যুক্ত থাকায়, এখানে "কর্ম" মাত্রেই "ধর্ম" বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইত; সুতরাং এখানে ধর্মহীন কোনও কর্ম ছিল না। জড়বাদের ক্রমিক মিশ্রণে সেই আদর্শ ক্রমশঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া "কর্ম" হইতে "ধর্ম" পৃথক হইয়াও কোন প্রকারে এতদিন পর্যন্ত নিজ সত্তা বজায় রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি জড়বাদের পরিপক্ক ফলস্বরূপ ভোগবাদের এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া, "ধর্ম" বা ভগবৎবিশ্বাসের বিটপীকে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত কেবল "কর্ম" রূপ এক পাষাণ-প্রাচীর আজ জগদ্‌ব্যাপী মানবাত্মার জীবনশ্বাস অবরুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। আত্ম-বিস্মৃত মানবসমাজ জড়ের উপাসনা-পথে যতই কেন উন্মত্তগতিতে ধাবিত হউক,— "স্বপদ"-ভ্রষ্টতার যাহা অবশ্যম্ভাবিত ফল— সেই "বিপদ"— অনন্ত বিপদ নিত্য নব নব রূপে এই পথে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেই,— তাহা বর্তমান বিপদগ্রস্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মানবদেহেন্দ্রিয়াদির উপযোগী যে ব্যবহার বিষয়, তাহার অনেক

ঊর্ধ্ব সীমায় মানবাত্মার যাহা "স্বপদ"— সেই পরমার্থ বিষয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; অর্থাৎ এখানে ধনোপার্জন, সংসার প্রতিপালন, খ্যাতি ও সম্মানাদি অর্জন, স্বজন, স্বজাতি বা সর্বপ্রাণীর ঐহিক উপকার সাধন প্রভৃতি লৌকিক বা ব্যবহার বিষয়ের স্থান, পরমার্থ বিষয়ের অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যের আরাধনা বা ভগবৎ ভক্তির বহু নিম্নে বিবেচিত হইত; কোনও অবস্থায় ব্যবহার ধর্ম পরমার্থের পূজ্যসীমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে না— ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবনের পূর্ণ আদর্শ। ব্যক্তিগত ভাবে— স্থল বিশেষে এই আদর্শের ব্যতিক্রম ঘটিলেও সমষ্টিগত জাতীয় আদর্শের ইহাই ছিল মাপকাঠি এবং ইহাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোগভূমির বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যাহারা, তাহাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ভারতীয় আদর্শের বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় আদর্শের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও সমষ্টিগত জাতীয় চরিত্রের আদর্শে ব্যবহারের আসন পরমার্থের বহু ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেখানে ঐহিক ফলপ্রদ— প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যবহার বিষয়ের সমাদর পরমার্থ হইতে সমধিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাদের ভোগবাদ-মূলক আদর্শের সম্পূর্ণ অনুকরণে যদি আমাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত হয়, তবে হয়ত, আমরাও জড়ের উপাসনা-মন্দিরে— তাহাদিগের পার্শ্বে তদনুরূপ আর একখানি অধিক আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি; কিন্তু জড়োপাসনা-সন্তপ্ত ও মৃতপ্রায় বিশ্বমানবাত্মাকে প্রাণবন্ত করিবার কঠিন ও শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব গ্রহণেই যাহাদের বিশিষ্টতা, সেই জাতি আজ নিজেদের মহান বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অনুকরণে যদি একমাত্র ঐহিক— জড়ের উপাসনাকেই জাতীয় জীবনের আদর্শ-রূপে বরণ করিয়া লয়, তবে কেবল ভারতবর্ষই নহে,— সেই আপরাধে ও সেই অপরাধের সহায়তা করিবার জন্য নিখিল বিশ্বমানবকেই যে অবিরত সন্তপ্ত হইতে হইবে,— বিপদের পর মহাবিপদের পথে ধাবিত

হইতেই হইবে— ইহা অনুমান নহে,— বর্তমান জগৎই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যদি জড়ের উপাসনার পরিবর্তে চৈতন্যের আরাধনা বা অমল ভগবদ্ভক্তি আবার জগতে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি ব্যবহার অপেক্ষা পরমার্থের আসন আবার ঊর্ধ্বে স্থাপিত হয়,— যদি স্বপদচ্যুত ভারত-সন্তান তথা পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মা সমষ্টিগতভাবে আবার ধর্মের বা "স্বপদে" প্রত্যাবর্তন করে,— যদি প্রাণহীন ধর্মের কৃত্রিম অনুষ্ঠান মাত্র বা কঙ্কালসার ধর্মের স্থলে বিশ্বভরা তরুণ তপনের মত আবার সজীব ও সমুজ্জ্বল ভগবৎ-বিশ্বাস উদিত হয়, যদি ভোগের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আবার জগতে ত্যাগের পথ উন্মুক্ত হয়,— তবেই বিপদের ঘনান্ধ-কারগ্রস্ত এই জগতে প্রকৃষ্ট সুখ ও শান্তির মঙ্গলময়ী ঊষা দেখা দিবে, নচেৎ জড় বিজ্ঞান অজস্র ধারায় ভোগবিলাসের জড়ীয় উপকরণ প্রসব করিলেও দিন দিন অধিকতর অশান্তির আত্মজ্বালা লইয়া, শেষে জগৎকে অকালে সাময়িক ধ্বংস অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতর যাহা কল্যাণপ্রদ বিষয় আছে, তাহা যদি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের— ভগবৎ বিশ্বাস ভক্তির পক্ষে অবিরোধী হয়,— বিজাতীয় হইলেও এরূপ বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রাচীন ভারত কোনও দিন কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হইতে পারে না। কিন্তু সে রীতি, নীতি, শিক্ষা ও সভ্যতা— তাহা বিদেশী হউক বা স্বদেশী হউক, যদি তদ্‌বিরোধী হয়, তবে নিজেদের ও জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে উহা অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্তু আজ আমাদের সেই জগৎপূজ্য জাতীয় আদর্শের পরিণতি কোথায়? "ব্যবহার বেদীর উপর পরমার্থের পবিত্র আসন"— এই আদর্শ নমিত হইয়া পরমার্থ এখন কি ব্যবহারের পাদ-পীঠরূপে বিবেচিত হইতেছেন না? হইতেছে বলিয়াই আজ ব্যবহার বিষয়েই জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ ও আদর,

— তাই আজ পরমার্থ বিষয় উপহসিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত বা মৌখিক আদৃত। আমাদের জগৎপূজ্য জাতীয় আদর্শকে বিস্মরণ ও বিজাতীয় রীতি, নীতি, শিক্ষা ও সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ইহাই বিষময় ফল।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশব্যাপী যে এক বিরাট নাস্তিকতা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জন্য আধুনিক জড় বিজ্ঞান ও জড় শিল্প-সঞ্জাত মোহান্ধতা বিশেষ ভাবে দায়ী। যে জড় বিজ্ঞান কর্তৃক নিত্য অভিনব বিষয় সকল আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া, জড়ের নিয়ামক কোন এক অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষের সত্তা সহজেই মানব চিত্তে অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক, জানি না কোন দুর্দৈব ও দুর্নীতির ফলে সেই জড়-বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত ক্ষণভঙ্গুর সুখ-স্বাচ্ছন্দে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ মানব সকল আজ নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাকেই চরম মনে করিয়া, তাহার ঊর্ধ্বে অপর কোন জ্ঞানময় স্বরূপকে স্বীকার করিতে "হীনতা" বলিয়া বোধ করিতেছে। যে শিল্প সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া কোন এক অপূপম— পরম সুন্দর বিশ্ব-শিল্পীর বিদ্যমানতা সহজেই অনুমিত হওয়া উচিত, জানি না, কাহার অভিশাপে— কোন্ কুশিক্ষা ও কুনীতির মোহে মুগ্ধ মানব-সমাজ আজ সেই বিশ্ব-শিল্পীর কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেদের অহমিকায় ও আত্মগরীমায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এই নাস্তিকতা-মূলক শিক্ষা ও সভ্যতার বিষবাষ্প যতই মানব সমাজকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছে জড়বাদ-বিমুগ্ধ মনুষ্য সমাজ ততই জড়তায় অভিভূত হইয়া জড়ের সঙ্গ ও জড়ের সেবায় অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

রোগ যন্ত্রণার অসহনীয় অবস্থায় তাহার সাময়িক প্রতিকার অহিফেন প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হইলেও, সেই প্রযুক্ত অহিফেনই যেমন আবার মূল রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়, সেইরূপ আত্মবিস্মৃত জীব জগৎ তৎস্বজাতীয় ও তদাশ্রয় সেই পরমাত্মা— পরমেশ্বরকে উপেক্ষা বা অস্বীকার পূর্বক, বিজাতীয় জড়সঙ্গের সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া তৎ-

প্রশমনের জন্য আধুনিক "আর্ট" নামে কথিত অহিফেন নির্যাস,— যাহা প্রধান রূপে রঙ্গালয়, ছায়াচিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, নভেল প্রভৃতির ভিতর দিয়া অজস্র ধারায় পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে,— সেই অহিফেন নির্যাস সেবনে শান্তিহারা নরনারী তাহাদের অন্তরাত্মার সুতীব্র জ্বালা সাময়িক ভাবে, ভুলিবার চেষ্টা করিলেও পরক্ষণেই তাহা আরও অধিক রূপে জ্বলিয়া উঠিতেছে; যাহার বিষময় ফলে সমস্ত পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ভাব আজ ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত অবনমিত ও অবমানিত। তাই আজ হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, অসূয়া ও অহমিকা প্রভৃতি দুর্নীতি ও দুর্গতির ধূলিজাল, আধ্যাত্মিক জগদাকাশের উপর প্রতিদিন ঘনতর হইয়া দেখা দিতেছে। যে গতি সমস্ত পৃথিবীকে প্রত্যহ অধিকতর বিপদের পথে— ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। আস্তিক্য ভাবহীন ও অহমিকা-প্রমত্ত মানবগণের নিকট সম্প্রতি তাহা "প্রগতি" নামে পরিগীত ও অভিবন্দিত হইলেও "দুর্গতিই" যে তাহার প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা, একথা আপাততঃ স্বীকৃত না হইলেও অস্বাভাবিক বিপদের অবিরত ঘাত প্রতিঘাতই ক্রমশঃ তাহা জানাইয়া দিবে। আধ্যাত্মিক ভাবহারা বিশ্বমানব আজ নিজেদের সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করিলেও বর্তমান মনুষ্যসমাজের ভিতরে যে লক্ষণসকল ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে,— গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক তাহা স্পষ্টই "অসুর-ভাব" নামে উক্ত হইয়াছে। স্বপদচ্যুত আত্ম-ভাবেরই অপর নাম "অসুরভাব"।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান-মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

— [শ্রীগীতা (১৬।৭—১১)]

অর্থ,— অসুর প্রকৃতির লোকেরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে জ্ঞাত নহে। সেই সকল ব্যক্তিতে শৌচ, আচার ও সত্য নাই। অসুর স্বভাব লোকেরা এই জগৎকে মিথ্যা, নিরাশ্রয়, নিরীশ্বর ও পরস্পর সংসর্গজাত— অধিক কি— কেবল কামজনিত বলিয়া থাকে।

এইরূপ দর্শন বা জ্ঞান আশ্রয়ের ফলে মলিন-চিত্ত, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ভীষণকর্মা অমঙ্গলকারী অসুরগণ জগতের ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে।

ঐ সকল ব্যক্তি দুষ্পূরণীয় কামনাবশে দম্ভ অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অসত্য বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন-পূর্বক কদাচারপরায়ণ হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

তাহারা আমৃত্যু অপরিসীম চিন্তাগ্রস্ত হইয়া কামোপভোগকেই পরম এবং তাহাকেই চরম বলিয়া নিশ্চয় করে।

জগৎ-ব্যাপী আধ্যাত্মিক ভাববন্ধনের শিথিলতা বা আত্মধর্মের উক্ত প্রকার গ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, তাহারই অনিবার্য ফল স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীতে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক দুঃখের সহিত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখসকল বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সংবাদ-পত্রসকল এখন তাই দুঃসংবাদ-পত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। এমন দিন নাই, যে দিন সংবাদপত্রে স্তম্ভের পর স্তম্ভ পূর্ণ করিয়া, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের বার্তা প্রচারিত না হইতেছে। হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ, বিপ্লব, রোগ, শোক, আত্মঘাত, দুর্ভিক্ষ, বেকার-সমস্যা, দস্যুতা, নরহত্যা, অপঘাত, সর্পদংশন, বজ্রাঘাত,

কুম্ভীর, ব্যাঘ্র, ও ক্ষিপ্ত শৃগালাদির উৎপাত প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দুঃখসকল দিন দিন অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ বিহারের ভূমিকম্প, জাপানের ঘূর্ণিবাত্যা, আসামের প্লাবন ও আমেরিকার তপ্তবায়ু-প্রবাহ বা ধূলিমেঘ প্রভৃতির ন্যায় পৃথিবীর নানা স্থানে যে অভূতপূর্ব নৈসর্গিক উৎপাত বা আধিদৈবিক বিপদসকল ঘন ঘন দৃষ্ট হইতেছে,— এই দুঃখ ও বিপদ সকল পৃথিবীব্যাপী অবনমিত আত্মধর্ম বা মানবাত্মার স্বপদচ্যুতিরই অবশ্যম্ভাবিত ফল।

সমষ্টিগত অপরাধের জন্য স্থান বিশেষে অবস্থিত মনুষ্যবিশেষের দণ্ডভোগ ইহা আপাততঃ স্পষ্ট অবিচার বলিয়া মনে হইলেও, স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যেও সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের সুমঙ্গল নিয়ম নিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। সৈন্যদলের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সকলেই প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হইয়াও তাহাদের পুনরায় আত্মশোধনের অবসর প্রদান করিবার জন্য যেমন সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক দশম ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাহা ন্যায়সঙ্গত ভিন্ন যেমন অন্যায় বা অবিচার বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ আজ আস্তিক্য-ভাবহীন— অহঙ্কার-প্রমত্ত মনুষ্য-সমাজে আমরা প্রায় সকলেই সমান দণ্ড ভোগের উপযুক্ত হইলেও, স্থল বিশেষে উক্ত প্রকারে গুরুতর দণ্ড বিশেষের ব্যবস্থা করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম,— নিরপেক্ষ ভাবে সকল মানবকেই বারম্বার আত্মশোধনের অবকাশ প্রদান করিতেছেন।

জগতকে থাকিতে হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস-লক্ষণা ভক্তিকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। "ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)। বিরুদ্ধভাবের তুলনায়, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও এখন পর্যন্ত যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধু-ভক্তগণের বিদ্যমানতা,— এখন

পর্যন্ত জগতের বিদ্যমানতা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির ভিতর এই সকল মহাত্মা অবস্থান পূর্বক আমাদের ন্যায় বহির্মুখ জীবসঙ্ঘের দুর্দশা মোচনের জন্য নিরন্তর শ্রীভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা-পরায়ণ রহিয়াছেন। প্রবল ঈশ্বর-বহির্মুখতার দণ্ডস্বরূপ অস্বাভাবিক প্লাবন, ভূকম্পনাদি ধ্বংসলীলার মধ্যে যে এতাদৃশ ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুদিগকেও জনসাধারণের সহিত একই ভাবে দুঃখভোগ বা প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করিতে দেখা যায়, তাহা তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাকৃতই জানিতে হইবে। সাধুগণ অপরাধী জনসঙ্ঘের রক্ষা বিধানের জন্যই, দণ্ডিতদিগের সহিত স্বেচ্ছায় সমান দণ্ড ভোগ করেন— দধীচির ন্যায় স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করেন বলিয়াই, প্রকৃতির এই সকল ধ্বংসলীলা তৎকালে প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। নিমেষকাল মধ্যে মানবের সকল জ্ঞান-গর্ব— সকল দর্প — সকল অহঙ্কার যাঁহার অপরিসীম প্রভাবের নিকট সহস্রবার ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে— সেই সর্বশক্তিমান— সর্বনিয়ন্তা— সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস ও ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করিয়া, যদি জগতের সকল অনুষ্ঠান— সকল ক্রিয়া-কলাপ, সকল শিক্ষা ও সভ্যতা আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে, তবেই বিপদের পথ হইতে বর্তমান জগতের প্রত্যাবর্তন সহজ ও সম্ভব হইতে পারে,— নচেৎ আমাদিগকে প্রতিদিন বিপদ হইতে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইতেই হইবে।

কলিযুগ-পাবনাবতার— প্রেমের ঠাকুর— শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের মূলনীতি যাহা, তাহাই সার্বজনীন আত্মধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবার পক্ষে যে সম্পূর্ণ উপযোগী,— ইহা স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। ভোগবাদ-প্রমত্ত জীবজগতকে তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবার পর, পৃথিবীতে আবার যে শান্ত ভাব জাগিয়া উঠিবে, তৎকালে নিখিল মানবাত্মার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের মূল নীতিই যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়

ও অবলম্বন বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার অঙ্কুর এখন হইতেই সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্ণ দণ্ডভোগ কাল সমাগত হইবার যত পূর্বে আমরা অকপটভাবে সেই ধর্মের যতই অধিকতর রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, জগতের পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলকর।

২। প্লাবনের খরপ্রবাহের ভিতর নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বীজকণা, তৎকালে অজানার অন্তরালে ভাসিয়া যাইলেও, যেমন কোন একদিন তীর-সংলগ্ন হইয়া, সেই ক্ষুদ্র বীজই মহা-মহীরুহত্ব প্রাপ্ত ও ফলপ্রসূ হয়, তেমনি অভূতপূর্ব বিপদের পথে বর্তমান জগৎ পরিচালিত হইবার কারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে যাহা নির্ণীত হইল, তাহা বর্তমান জড়বাদের খরস্রোতে ক্ষুদ্রতম প্রয়াস যে অদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন ফলপ্রসূ হইবে, আমরা সে-বিষয়ে সন্দেহশূন্য। আমাদের এই উক্তি ক্ষুদ্র হইলেও যাঁহারা অনুমোদন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সুযোগ্য ও যথার্থ শক্তিশালী কেহ যদি জগতের কল্যানার্থ এ বিষয়ে জনমতকে জাগরিত করিবার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলেও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে বহুল পরিমাণে সার্থক বলিয়া মনে করিব।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত। শ্রাবণ ১৩৪১ সাল হইতে পৌষ ১৩৪১ সাল পর্যন্ত।

——

সমষ্টির মহা-অভিসার

স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, কোনও এক মহা আকর্ষণ বা ভালবাসার টান জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছে। শুধু জীব ও ঈশ্বর কেন ?— জড় ও ঈশ্বরের মধ্যেও এই আকর্ষণ অহর্নিশ চলিয়াছে। এক কথায়, সমস্ত জগতে ও জগন্নাথের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য— অবিচ্ছিন্ন প্রীতির আকর্ষণ নিত্যই বিরাজিত। জীবজগতে যে টানকে আমরা ভালবাসা বা প্রেমের আকর্ষণ বলি, সেই একই টান জড় জগতে মাধ্যাকর্ষণ নামে উক্ত হইয়া থাকে। অনন্ত সৌরজগত যে টানে পরস্পর বাঁধা রহিয়াছে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহের মধ্যে যে টানাটানির খেলা নিত্য চলিয়াছে, সেই ব্যষ্টি আকর্ষণগুলি এক মহা-আকর্ষণকে পুষ্ট করে, তদ্দ্বারা সমষ্টির কোন এক "মহা-অভিসার" পথে জগতকে নিয়ত চালিত করিতেছে।

আকর্ষণ গতির উৎপাদক। আকর্ষণ হইতে চঞ্চলতা জন্মে। জগৎ গতিশীল— গতির মূর্তি। কি জীব, কি জড় সকলেই প্রতিনিয়ত গতিশীল বা সচঞ্চল। জগতের কোন জীব— কোন পদার্থই এক মুহূর্তও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সকলই যেন কি এক কিসের টানে নিয়ত চঞ্চল,— নিয়ত ব্যাকুল! অবিশ্রান্ত এই গতি— এই চাঞ্চল্য— এই ব্যাকুলতার কারণ কি? স্থির ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। চঞ্চল হইবার জন্যই কোন কিছু চঞ্চল হয় না,— স্থির হইবে বলিয়াই যে-কোন পদার্থ চঞ্চল হইয়া থাকে। ঢালা জল গড়াইয়া চলিয়া যায় কেন? গড়াইবার জন্যই তাহা গড়ায় না— দাঁড়াইবার জন্যই গড়ায়; যতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইবার মত স্থান না পায়, ততক্ষণ গড়াইয়া চলে। গতিই তাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নহে—

স্থিতিই তাহার প্রয়োজন। রোগী রোগ-যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়; ব্যাকুল হয়; এ-পাশ ও-পাশ করে কেন? ব্যাকুল ভাবে ছটফট্ করাই তাহার উদ্দেশ্য নহে; তাহার একান্ত ইচ্ছা, সে স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে; এই স্থির হইবার চেষ্টাতেই সে অস্থির হয়; সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন।

অপূর্ণ জীব— অপূর্ণ জগত, পূর্ণ হইবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। জীব ও জগত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, তাহাদের এই ব্যাকুলতা— এই অবিশ্রান্ত গতির লক্ষ্য যে স্থিতির দিকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একদিকে আনন্দ জীবকে টানিতেছে; অন্যদিকে জীব আনন্দকে টানিতেছে,— আনন্দ বা সুখকে বেশী বা পূর্ণ মাত্রায় বুকে ধরিবার জন্য নিয়ত চঞ্চল ও ব্যাকুল হইতেছে; একটু নিবিষ্টভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় আমরা যে-ভাবেই হউক না কেন, কায়িক, বাচিক বা মানসিক যে-কোন কাজ করি না কেন, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই করিয়া থাকি। সুখ বা আনন্দের সেবাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুখের অনুরোধেই আমরা ধন, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির কামনা করিয়া থাকি। অতএব ধন-সম্পদাদির সেবা— বিষয়ের সেবা, সে সকলই যে একমাত্র সুখ-সেবনের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি যে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্নাদিকে আমরা ভালবাসি; কিন্তু তাহা নহে, আমরা বাস্তবিক ভালবাসি আনন্দ বা সুখকেই, আমাদের সকল ব্যাকুলতা— সকল গতিরই মুখ্যতম উদ্দেশ্য আনন্দ বা সুখের সহিত সম্মিলন। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, পুত্রকে ভালবাসিয়া ধন-সম্পদাদি ভালবাসিয়া সুখ পাই; সুখ পাই বলিয়াই— সুখকেই ভালবাসি বলিয়া সুখের সাধনের প্রতিও আমাদের ভালবাসা।

আনন্দকেই ভালবাসা যদি জীবের নিত্য ধর্ম হয়, তবে

শ্রীভগবানকেই ভালবাসা জীবের নিত্য ধর্ম একথা আপনিই প্রমাণ হইয়া পড়ে; কারণ যাহা 'আনন্দ' তাহাই 'ব্রহ্ম'; আর যাহা ব্রহ্ম তাহাই শ্রীভগবান— একই তত্ত্বের প্রকাশ ভেদ মাত্র।

শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। যথা, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ "জানিলেন আনন্দই ব্রহ্ম।" "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্।" অর্থাৎ "যাহা আনন্দ, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।" ইত্যাদি— (তৈত্তিরী ৩।৬।১ ও ২।৭)।

সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত অবস্থাই শ্রীভগবানের স্বরূপ। যেখানে যাহা কিছু আছে সকলেরই মূল— সকলেরই আদি শ্রীভগবান। স্বয়ং ভগবান যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ভাগবতের উক্তি। শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরমানন্দ; যথা;—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

— (ব্রহ্মসংহিতা, ৫।১)

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর; স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দই অনাদির আদি ও কারণ সকলেরও মূল কারণ।

তাহা হইলে বিষয়ভোগে আমরা যে অল্প ও ক্ষণিক সুখ পাই, সে সুখের মূল কারণও সেই শ্রীকৃষ্ণ; আর বিষয়-সুখের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ বা ভালবাসা তাহারও মূল শ্রীকৃষ্ণই। কলসী চুঁয়াইয়া ভিতরের জল যেমন অল্প অল্প তাহার বাহিরের গায়ে লাগিয়া থাকে তেমনি জগৎ চুঁয়াইয়া তাহার বাহিরের গায়ে যে অল্প অল্প সুখ বা আনন্দাভাস আসিতেছে, সে সকল আনন্দ— সকল সুখেরই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই মূল কারণ। অতএব জীবমাত্রেরই যে আনন্দ বা সুখের প্রতি ভালবাসা,— আনন্দ বা সুখের অন্বেষণ-তৎপরতা সে ভালবাসা সে সুখান্বেষণ, প্রকারান্তরে যে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণই, তাহাতে

সন্দেহ নাই। আনন্দ ও শ্রীভগবান যখন একই তত্ত্ব, তখন আনন্দের সেবা ও শ্রীকৃষ্ণসেবা একই কথা। সুখের সেবা— সুখের দাস্য না করিয়া জীব এক মুহূর্ত থাকিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল সুখের মূল উৎস; সুতরাং সুখের দাস্য বা শ্রীকৃষ্ণের দাস্য যে জীবের নিত্য ধর্ম একথাও স্থির। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"— শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের এই উক্তির সার্থকতা এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিব।

তবে কথা এই যে, জীব আনন্দের নিত্যসেবক হইলেও, মায়া-মিশ্রিত ও অত্যল্প সুখের দিকে তাহার যে গতি, সে গতি প্রকৃষ্ট গতি নহে। ইহা সেই পূর্ণানন্দের অনুসন্ধানজ্ঞাপক হইলেও এই অপ্রকৃষ্ট গতি,— ইহা মহা-অভিসারের উপযুক্ত পথের নহে।

বিষয়-সুখের প্রতি জীবের যে ভালবাসা, স্বীকার করিতেই হইবে, সে ভালবাসা বিশুদ্ধ ও নির্দোষ ভালবাসা নহে। মায়ান্ধ জীব দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনন্ত আনন্দ যে উৎস হইতে নিঃসৃত হইতেছে, সেই আনন্দময় পুরুষের চরণ-সরোজের প্রতি না চাহিয়া, তাহার বাহিরের দিকের যে চুঁয়াইয়া আসা আনন্দকণা, তাহারই প্রতি এক লক্ষ্য হইয়া, অনাদিকাল হইতে তাহাকেই ভালবাসিয়া— তাহারই অন্বেষণে সচেষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই মহাভ্রমের ফলস্বরূপ মঙ্গলের পরিবর্তে অবিশ্রান্তভাবে অমঙ্গল ও অনর্থ জীবকে ভোগ করিতে হইতেছে। এই অপ্রকৃষ্ট গতি হইতে তাই এত দুঃখ, দৈন্য, অবসাদ!— এই পথে তাই এত মোহ, ভয় ও বন্ধন! অনন্ত জন্ম ও মৃত্যু, অনন্ত সংসার-বন্ধনের এই অপ্রকৃষ্ট গতিই একমাত্র কারণ। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

—(২।২০।১০৪)

অপূর্ণ ব্যষ্টিজীব— অপূর্ণ জগৎ নিরন্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবানের সুশীতল চরণ-ছায়ায় উপনীত হইয়া, তৎসেবা প্রাপ্তিই জীবের 'স্বপদ' বা 'স্বভাব'। 'স্বপদ' বা 'স্বভাব' হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, সংসারী জীব তাই নিত্য "বিপদ" বা "অভাব"গ্রস্ত। পূর্ণ-পিপাসিত জীব, অপূর্ণ বিষয়-সুখ পান করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যে যতই বিষয়-সুখ ভোগ করুক না কেন, আরও পাইবার জন্য তাহার স্পৃহা হইবেই হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই "বেশী-চাওয়া" বা বেশী সুখের আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণানন্দের আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক; পূর্ণানন্দই শ্রীভগবান, অতএব অজ্ঞানান্ধ জীবের অধিক সুখলাভের ইচ্ছারূপ মনোগতিই আত্মার আত্মা যিনি,— জীবনের জীবন যিনি— সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেরই চরণ-সরোজের উদ্দেশ্যে "সমষ্টির মহাভিসার"! শ্রীভগবানের পূর্ণতা ও জাগতিক সুখের অপূর্ণতার ইহাই সমুজ্জ্বল প্রমাণ। তাই শ্রুতিও বলিতেছেন ;—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্ ॥"—(ছান্দোগ্য—৭।২৩-২৪)

অর্থাৎ— অল্পে সুখ নাই— ভূমাই সুখ। যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না, তাহাই "ভূমা"। আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে, তাহাই "অল্প"। যাহা ভূমা তাহাই "অমৃত"; — আর যাহা "অল্প" তাহাকেই "মর্ত্য" (বিনাশ-ধর্মী) কহে।

বেশী সুখের স্পৃহাই পূর্ণানন্দ-স্পৃহার পরিচায়ক। অতএব জীব যতক্ষণ না পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের সেবানন্দ লাভ করিতেছে,

ততক্ষণ তাহার চাঞ্চল্যের তাহার অবিশ্রান্ত গতির নিবৃত্তি নাই। যে যত পূর্ণানন্দের সন্নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছে, তাহার কামনা— তাহার পিপাসা— তাহার ছুটাছুটির ততই নিবৃত্তি হইয়া আসিয়াছে; আর যে হৃদয়ে ভগবৎ পাদপদ্মের স্পর্শ পাইয়াছে, সে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে,— তাহার সব গতি— সব চাঞ্চল্যের অবসান হইয়াছে। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী, সকলি অশান্ত॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ— ২।১৯।১৩২)

আমরা এখন বুঝিলাম, মায়ামুগ্ধ— অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের যে বিষয়-সেবন-স্পৃহা, ইহা অপ্রকৃষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবন-স্পৃহারই পরিচয় দিতেছে। বিষয়-সুখের প্রতি যে আমাদের স্বাভাবিক ভালবাসা, ইহাও শ্রীভগবানের প্রতি নিত্য ভালবাসারই প্রমাণ। যাঁহাদের এই সুখস্পৃহা — এই আনন্দের অন্বেষণ প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানই যাঁহাদের একমাত্র অন্বেষণীয় ও প্রীতির বিষয় হইয়াছেন,— তাঁহারাই শুদ্ধ জীব। তাঁহাদেরই সেই শুদ্ধ ভালবাসা "শুদ্ধাভক্তি" নামে উক্ত হইয়া থাকে,— যাহার পরিপক্ক দশার অপর নাম "প্রেম"। আর যাহাদের সুখ-স্পৃহা অপ্রকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, মূলের দিকে— অন্তরের দিকে— শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত না হইয়া যাহাদের গতি, দেহাত্মবোধহেতু বহির্মুখতা লাভ করিয়াছে, তাহারাই অশুদ্ধ বা বদ্ধজীব নামে উক্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ — ২।২৪।১৩০)

দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ-স্পৃহায় প্রাকৃত বিষয় প্রাপ্তির জন্য বদ্ধজীবের যে অভিলাষ,— তাহারই নাম 'কাম'। কামই অবিরত জন্ম-মৃত্যু ও

সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ। "কাম" অন্ধতম, "প্রেম" নির্মল ভাস্কর।" (শ্রীচৈঃ চঃ)

আর একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীব-মাত্রের স্বাভাবিক ভালবাসা শ্রীভগবানেই। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, অবিদ্যার যবনিকা ফেলিয়া "এককে আর" বুঝাইয়া দিতেছে মাত্র। বাস্তবিক কথা এই যে, আমরা কাহারও প্রীতির জন্য কাহাকেও ভালবাসি না,— যাহা কিছু ভালবাসি, সে কেবল আত্মপ্রীতির অনুরোধেই। ভালবাসার এই নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, শ্রুতি তাই জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি; ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি; ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি; ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।"
— ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক উঃ ৪।৫।৬)

অর্থাৎ জায়া, পতির প্রীতিসাধনের নিমিত্ত পতিকে ভালবাসে না; কিন্তু কেবল আত্মার প্রীতিসাধনের জন্যই পতিকে ভালবাসিয়া থাকে; সেইরূপ পতি যে জায়াকে ভালবাসে, তাহাও জায়ার প্রীতির জন্য নহে, কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই; পুত্রসকলের প্রীতির জন্য পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না; কিন্তু পিতার প্রীতির জন্যই তাহারা পিতার প্রিয় হইয়া থাকে; অর্থের প্রীতির জন্য অর্থ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই অর্থ মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে।— ইত্যাদি।

শ্রুতি বলিতেছেন এই "আত্মার" অর্থ "পরমাত্মাই"। এই যে জীবমাত্রেরই আত্মাকে স্বাভাবিক ভালবাসার কথা বলা হইল, আপাততঃ তাই মনে হইলেও, বাস্তবিক আত্মাতেই এ ভালবাসার অবসান নহে, এই ভালবাসার টান আসিতেছে সেই সকলের মূল—

সকল কারণের আদি কারণ যিনি— তাঁহারই কাছ হইতে। আত্মার আত্মা যিনি, প্রাণের প্রাণ যিনি, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম যিনি, পরমাত্মারূপ নিজাংশে সকল জীবে অবস্থিত যিনি— তিনি-ই সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তিনি-ই নিখিল জীবের একমাত্র প্রীতির বস্তু। তিনি ছাড়া জীবের আর কোনও প্রীতির বস্তু নাই। আমরা এই রহস্য অবিদ্যাদি বশতঃ জানিতে না পারিলেও, তত্ত্বতঃ ইহাই সত্য যে, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই— শ্রীভগবানের সম্পর্কেই আত্মা পর্যন্ত সমস্তই প্রিয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহার চেয়ে প্রিয়তম আর কিছুই নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

প্রাণবুদ্ধিমনঃ-স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্যঃ পরঃ প্রিয়ঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১০।২৩।২৭)

অর্থাৎ— প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি সমুদয় বস্তুই যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাঁহার চেয়ে অন্য প্রিয় আর কে আছে? অতএব জীবমাত্রেই, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে ভাবেই হউক, শ্রীভগবানের প্রতি নিত্য ভালবাসা, প্রীতির নিত্য আকর্ষণ যে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সমষ্টির মহা-অভিসার এই টানেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিত্যই চলিতেছে; কিন্তু এই মহা-অভিসার যেখানে প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই জীব, নিজ জীবনবল্লভের চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া চির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া লইয়াছে; আর সেই অভিসার যেখানে অপ্রকৃষ্টগতিকে অবলম্বন করিয়াছে, চির-অপূর্ণতাকে বুকে করিয়া চির-সংসারপথে তাহাকেই ঘুরিতে হইতেছে।

শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা সেই অপ্রকৃষ্ট গতি পরিশুদ্ধ হইয়া প্রকৃষ্ট গতিকে প্রাপ্ত করায়; তখন জীব "অল্পের" সেবা ছাড়িয়া দিয়া "ভূমা"র অন্বেষণে নিযুক্ত হয়; তখন জীব আর আপনাকে মায়ার সেবক বা সেবিকা মনে না করিয়া "কৃষ্ণ-সেবিকা" বলিয়াই

বুঝিতে পারে। তাই পরম পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন;—

নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, ২।২২।৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিতরিত শ্রীকৃষ্ণনাম গাহিতে গাহিতে, আবার পথহারা জগৎ প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া, ব্যষ্টিত্বের ক্ষুদ্রাভিসারের পরিবর্তে সমষ্টির মহাভিসারে মিলিত হইয়া যেদিন চির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া লইতে একযোগে চলিবে,— সেদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আশ্বিন ১৩৩৭ সাল।

——

চিদানন্দ-জগৎ ও তাহার সন্ধান

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, অগ্নির যেমন (১) প্রভা, ও (২) ধূম— প্রধানতঃ এই দুইটি নিজ শক্তি আছে, সেইরূপ শক্তিমান পরমেশ্বরের দুইটি প্রধানা শক্তি আছে; একটি হইতেছে (১) চিদ্ বা চেতন শক্তি এবং অপরটি অচিদ্ বা অচেতন— জড়শক্তি। এক অগ্নি-স্থানীয় শ্রীভগবান তদীয় প্রভা-স্থানীয় 'চিদ্' এবং ধূম-স্থানীয় 'অচিদ্' এই উভয় শক্তিযুক্ত; ("চিদচিদ্ শক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ"।— শ্রীভাঃ ৭।৩।৩৪); সুতরাং এই দৃশ্যমান জড়-জগৎ যখন তাঁহার অচিদ্ বা জড়শক্তির কার্য হইতেছে, তখন জড়জগতের অতিরিক্ত কোন এক শুদ্ধ চিন্ময় জগৎ অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

প্রভা, অগ্নির মত উজ্জ্বল ও দীপ্তিশীল; অগ্নিরই নিজরূপ বা

স্ব-রূপের মত বলিয়া অগ্নিপ্রভাকে যেমন অগ্নির স্বরূপশক্তি বলা যায়, এবং ধূম, অনুজ্জ্বল ও দীপ্তিহীন বলিয়া উহা হইতেছে যেমন অগ্নির বিপরীত বা বিরূপশক্তি, সেইরূপ চিদ্‌শক্তি শ্রীভগবানের অনুরূপ বলিয়া উহাকে তাঁহার স্বরূপ বা 'অন্তরঙ্গা' শক্তি এবং অচিদ্— জড়শক্তি তৎ-বিপরীত ধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে 'বহিরঙ্গা' শক্তি বলা হয়। চিৎ-শক্তিরই অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি; আর অচিদ্ শক্তিকেই বহিরঙ্গা জড় ও মায়াশক্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অতএব প্রভা বা ধূম একই অগ্নির শক্তি হইলেও যেমন উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিপরীত ভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রভা বস্তুর প্রকাশক এবং ধূম যেমন বস্তুর আবরক হয়,—তেমনি পরমেশ্বরের চিদ্ ও অচিদ্ শক্তি অর্থাৎ চিন্ময় ও জড়-জগৎ— উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন।

জড়বাদীর নিকট জড়ের অতিরিক্ত কোন চিন্ময় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যেহেতু তাঁহাদের বিবেচনায় প্রত্যক্ষ ও তদনুমোদিত অনুমান ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং চিন্ময় জগৎ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন আপাততঃ উহার অপর প্রমাণ না থাকায়, আজিকার জড়বাদ-বিমুগ্ধ জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই নিকট চিন্ময় জগৎ উপেক্ষা ও উপহাসের বস্তুরূপেই বিবেচিত হইতে দেখা যায়। সচেতন প্রাণীজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা, সেই মনুষ্য নামধেয় চেতন বস্তু কর্তৃক এইরূপে চৈতন্য পদার্থের অস্বীকার,— ইহাকেই পৃথিবীর যথার্থ আশ্চর্য ঘটনা বলা যায়। চিদ্-বস্তুকে না জানিতে পারিবার সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ স্বরূপ শাস্ত্র এইটুকু বলিয়া রাখিয়াছেন যে, "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি ত্বং কেন বিজানীয়াৎ"। (বৃহঃ শ্রুতিঃ ৪।৫।১৫) অর্থাৎ যে চৈতন্যের দ্বারা সমস্ত জড়বস্তুকে জানা যাইতেছে, সেই চৈতন্যকে আর কোন্ জড়বস্তু দ্বারা জানা যাইবে?— এই সমস্যার আপাততঃ ইহাই একমাত্র সহজ সমাধান।

নিতান্ত দুর্দৈব বশতঃ শাস্ত্র-প্রমাণকে অন্ততঃ প্রথম হইতেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে না দেখিয়া উক্ত বিষয়ে শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসরণ পূর্বক, যদি আমরা সেই দিকে একটু অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে কেবল শাস্ত্রপ্রমাণেই নহে,— চিন্ময় জগতের বিদ্যমানতা এতই সত্য যে, এই জড় জগতের ভিতর হইতেও চিদানন্দ-জগতের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আপাততঃ শাস্ত্রনির্দেশ মত যদি ধরিয়া লওয়া যায়, এই পরিদৃশ্যমান জড়-জগতের অতীত এক চিন্ময় জগৎ আছে, আর সেই জগৎ হইতেছে মূল বিষয়ে এই জড়-জগতের বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহা হইলে এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড়-জগতের ধর্ম দেখিয়া তাহার বিপরীত ধর্ম যাহা,— চিন্ময় জগৎকে তদ্রূপ বলিয়া আপাততঃ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যেমন আমরা দেখিতে পাই, (১) জড়-জগতের সকল জড়বস্তুই অনিত্য; এখানে চিরদিন বিদ্যমান থাকিতে কোন কিছুকেই দেখা যায় না। সুতরাং জড়-জগতের ধর্ম যখন অনিত্য বা 'অসৎ' রূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তদ্‌বিপরীত লক্ষণ কোন চিন্ময় জগৎ থাকিলে, তাহাকে অবশ্যই নিত্য অর্থাৎ 'সৎ' বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। (২) জড়-জগতের ঘট, পট প্রভৃতি জড়বস্তুসকল অচেতন অর্থাৎ 'অচিদ্'; তাহার বিপরীত হইলে চিন্ময় জগতের সকল পদার্থই যে সচেতন বা 'চিদ্'— ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। (৩) ধূম যেমন নিজে আলোকহীন এবং আলোকের আবরক হইয়া থাকে, সেইরূপ ধূম স্থানীয় জড়-জগতের সকল বস্তুই সুখহীন ও সুখের আবরক। জড়ে অনুভূতি লক্ষণ না থাকায়, উহা সুখহীন এবং সুখহীন বস্তু সুখের আবরকও হয়; জড়ের বিপরীত ভাবযুক্ত হইলে ইহা অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, চিন্ময় জগৎ থাকিলে, উহাকে অবশ্যই আনন্দময় ও আনন্দের প্রকাশক হইতে হইবে।

তাহা হইলে শাস্ত্রনির্দেশ মত কোন চিন্ময় জগৎ বিদ্যমান থাকিলে এবং চিদ্ ও অচিদ্ শক্তিতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম হইলে, আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অচিদ্ অর্থাৎ জড়জগতের ধর্ম বা লক্ষণ দেখিয়া, আপাততঃ দৃষ্ট বিষয় না হইলেও, চিদ্ বা চিন্ময় জগতকে নিম্নোক্ত প্রকারে জড়ের বিপরীত ভাবযুক্ত বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যথা,—

জড় জগৎ।	চিন্ময় জগৎ।
১। অসৎ	১। সৎ
২। অচিদ্	২। চিদ্
৩। আনন্দহীন	৩। আনন্দময়।

পরব্রহ্ম— পরমেশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দময়', (সৎ+চিদ্+আনন্দ) স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রসকল বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বরূপের মতই শক্তি বলিয়া, স্বরূপশক্তিও সচ্চিদানন্দময়ী। তদনুরূপ বলিয়া এই জন্যই স্বরূপশক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। আর তাঁহার বহিরঙ্গা যাহা, সেই জড়শক্তি তৎ বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া উহাকে আমরা অসৎ (অনিত্য) অচিদ্ (অচেতন) ও নিরানন্দ লক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। জড়শক্তির বিকাররূপ এই জড়জগতের অতীত চিদ্-শক্তির বিলাস বা চিদানন্দময় রাজ্যের বিলাসী রাজাধিরাজ যিনি,— তাঁহাকেই 'শ্রীকৃষ্ণ' বলা হইয়া থাকে। ময়ূর যেমন নিজ প্রসারিত পুচ্ছের সহিত ক্রীড়ামোদী হইয়া নটনশীল হয়, সেইরূপ শক্তিমানরূপে শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও আবার নিজ সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ-শক্তির সহিত আনন্দ-লীলা বিলাসী হয়েন ;— ("হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ"— সিদ্ধান্তরত্ন।)

চিনির সহিত মিষ্টতা ও অগ্নির সহিত উত্তাপ যেমন চিরযুক্ত ;— মিষ্টতা লইয়াই চিনির এবং উত্তাপ লইয়াই যেমন অগ্নির অস্তিত্ব, তেমনি যাহা চিদ্-বস্তু, তাহার নিত্যতা ও আনন্দময়তা এবং যাহা

অচিদ্-জড়বস্তু, তাহার অনিত্যতা ও আনন্দশূন্যতা স্বাভাবিক ধর্ম। যাহা কিছু চিদ্‌বস্তু তাহাই সৎ ও আনন্দ; যাহা কিছু আনন্দ তাহাই সৎ ও চিদ্; যাহা কিছু সৎ তাহাকে চিদ্ ও আনন্দময় হইতেই হইবে। অতএব 'চিন্ময়' বলিতে সর্বত্রই 'চিদানন্দময়' বা 'সচ্চিদানন্দময়' বলিয়াই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। চিন্ময় জগতের অর্থ চিদানন্দময় ও সচ্চিদানন্দময় জগৎ।

শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসরণ-পূর্বক আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই, শাস্ত্র আমাদিগকে এমন স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, যেখানে শুধু শাস্ত্রোক্তি দ্বারাই নহে,— এই দৃশ্যমান জড়-জগতের ভিতর হইতেই কেবল অনুভূতি দ্বারা আমরা জড়শক্তির অতিরিক্ত কোন এক চিদ্‌বস্তুর সুস্পষ্ট সন্ধান পাইতে পারি।

শাস্ত্র হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নির যেমন আলোক ও ধূমশক্তি ছাড়া স্ফুলিঙ্গরূপ আর একটি শক্তি আছে; অগ্নি হইতে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গসকল স্বভাবতঃ অগ্নি এবং অগ্নিপ্রভারই মত সমুজ্জ্বল এবং প্রকাশমান বস্তু হইলেও, অগ্নি হইতে বিমুখতা প্রাপ্ত হইয়া প্রগাঢ় ধূমরাশির মধ্যে প্রবেশপূর্বক নিজ অণুত্ব নিবন্ধন সেই ধূমসত্তার ভিতর যেমন নিজ স্বরূপকে হারাইয়া ফেলে, তেমনি শক্তিমান পরমেশ্বর হইতে তৎস্ফুলিঙ্গ স্থানীয় ("যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ"— মুণ্ডক শ্রুতিঃ— ২।১।১) অসংখ্য চিদ্-পরমাণু বা তটস্থা জীবশক্তি, তাহা হইতে অনাদি বহিশ্চরতা প্রাপ্ত হইয়া যখন ধূমস্থানীয় 'মায়া' বা 'জড়শক্তির' অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই 'জীব' নামক চিৎ-কণ পদার্থ সকল জড় সত্তার আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে নিজ 'চিদ্' স্বরূপ আবৃত হইলে, তখন সেই জীব চিদাত্ম— বিস্মৃত হইয়া অর্থাৎ "আমি চিন্ময় বস্তু"— ইহা ভুলিয়া গিয়া জড়-দেহেন্দ্রিয়কেই 'আমি' ও তৎ-সম্বন্ধীয় গেহাদি জড়-বিষয়কে 'আমার' বলিয়া বিমোহিত হয়। সমীরণ যেমন প্রবল দাবাগ্নির দহন কার্যের সহায়ক হইলেও, দুর্বল দীপশিখার

পক্ষে নির্বাপক হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভু-চৈতন্যস্বরূপ প্রবল পরমেশ্বর সমীপে বিলজ্জিতা ও তদধীনা হইয়াও সেই 'মায়া' ঈশ্বর হইতে বিমুখ— সুতরাং দুর্বল অণুচৈতন্য জীবকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করে। একই মায়াশক্তি জীবমায়ারূপে নিজ আবরিকা ও বিক্ষেপিকা নামক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা জীবের চিদাত্মবোধকে আবরণ ও দেহাত্মবোধ জাগরণ করাইয়া, 'গুণমায়া' দ্বারা পরিণত দেহে ও দেহভোগ্য রূপ-রসাদি জড় বিষয়সকলে জীবের অভিনিবেশ ঘটাইয়া থাকে। মায়া ঈশ্বরাধীন হইয়াও এইরূপে ঈশ্বর-বিমুখ জীবকে নিজ অধীন করিয়া থাকে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

— (শ্রীভাঃ ২।৫।১৩)

অর্থাৎ, যে মায়া শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, নির্বোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া (দেহ-গেহাদিতে) 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

অংশের সত্তা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে রাশির সত্তা ও স্বভাব জানা যায়। কলসস্থিত জল দেখিয়া যেমন জলরাশির অবশ্য বিদ্যমানতা বুঝিতে পারা যায়, এবং দেহের একটি শোণিত-কণা পরীক্ষা করিয়া, সেই প্রত্যক্ষ হইতেই যেমন সমস্ত দেহের শোণিতরাশির লক্ষণ বা ধর্ম জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এই জড়-জগতের ভিতর বিভু-চৈতন্য হইতে অনাদি বহির্মুখ 'জীব' নামক চিৎকণের অবস্থিতি-সংবাদ যখন শাস্ত্রই প্রদান করিয়াছেন, তখন কোন প্রকারে যদি এই জগতের অভ্যন্তরে জড়স্তূপের ভিতর হইতে সেই চিৎ-পরমাণুর সত্তা খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে সেই চিৎ-কণের সত্তা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা চিদ্‌রাশি বা চিদানন্দ জগতের সত্তা ও স্বরূপের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে।

কেবল শাস্ত্রপ্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চিন্ময় জগতের লক্ষণাদি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে, এই জড় জগতের ভিতর শাস্ত্রোক্ত সেই চিদ্বস্তু— চিৎ-কণ আবিষ্কৃত হইলে, তাহার ধর্ম বা স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, রাশিচৈতন্য বা চিদানন্দময় জগৎ-বিষয়ক পূর্বোক্ত কাল্পনিক অনুমান এক প্রকার প্রত্যক্ষানুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, এই জড় জগৎ চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিম্বকে আশ্রয় না করিয়া প্রতিবিম্বের সত্তা যেমন ক্ষণকালের জন্যও থাকে না, এবং বিম্ব যেমন প্রতিবিম্বের সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিশ্বাত্মাও পরমাত্মা রূপে বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বর যদি বিশ্বের ও জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান না করিতেন, তবে জীব ও জগৎ কিছুই বিদ্যমান থাকিত না। সর্বান্তর্যামীরূপে বিশ্বে ও জীবে চৈতন্যময় পরমেশ্বরের এই অবস্থিতি-সংবাদ এত নিগূঢ়, ইহা এতই সূক্ষ্ম, যে শাস্ত্রবিহিত সাধনা ভিন্ন উহার উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। রজঃ তমঃ পরিশূন্য ও কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবাপন্ন শুদ্ধ চিত্তেই উহার স্ফুরণ সম্ভব হইতে পারে। দুগ্ধে ঘৃত ও তিলে তৈল সর্বত্র নিহিত থাকিলেও, যেমন সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন, উহা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের পক্ষে অনুভবযোগ্য হয় না, ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

— (কাঠকে।৩।১২)

অর্থাৎ— এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ হয়েন না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা ইঁহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।

বিশেষতঃ শ্রীভগবান অচিন্ত্য বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় বলিয়া, তিনি এই জড় জগতের সর্বত্র অবস্থান করিয়াও আবার একই সময়ে জড়ের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

— (শ্রীগীতা ১৩।৩২)

অর্থাৎ,— আকাশ সর্বগত হইয়াও যেমন সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অপর কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্মে উপলিপ্ত হয়েন না।

সুতরাং সর্বান্তর্যামী রূপে তাঁহার অনুভূতি জড়েন্দ্রিয়াদির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হইতেছে।

চিৎকণ জীব, জড় হইতে অতিরিক্ত বস্তু হইলেও নিজের উপর দেহাত্মবোধরূপ জড়ভাব আরোপ করায় অর্থাৎ জড় দেহেন্দ্রিয়কেই 'আমি' বলিয়া বোধ করায়, বহুল পরিমাণে জড়-সান্নিধ্য প্রাপ্ত; সুতরাং জড়-নির্লিপ্ত বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বর সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও, জড়-সংলিপ্ত— অণু-চৈতন্য জীব-লক্ষণের উপলব্ধি, অনেক পরিমাণে জড়েন্দ্রিয়াদির দ্বারা সম্ভব হইবার আশা করা যাইতে পারে। এই কারণে চিদণু-জীব, পরমেশ্বর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী বিষয়। এখন এই চিদণু জীবের সত্তা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে, রাশি-চৈতন্য বা চিন্ময় জগতের অনুভূতিও সহজ এবং সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু অণুর স্বভাব প্রত্যক্ষ করিলে, তদ্দ্বারা বিভু বা রাশির ধর্ম অবগত হওয়া যায়,— একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই জড় জগতে, কেবল জীবিত প্রাণিদেহ রূপ জড় পদার্থের অভ্যন্তর হইতেই চিৎকণ জীব-লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায়। অণু-চৈতন্য জীব কর্মবশে খনিজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। জীবের খনিজ হইতে জরায়ুজ দেহ পর্যন্ত সকল দেহেই চেতনা-লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও উহা উত্তরোত্তর অধিকতর প্রকাশশীল বলিয়া, জরায়ুজ প্রাণিদেহ ও তন্মধ্যে আবার

মনুষ্য দেহই চেতনা-লক্ষণ প্রকাশের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী হইয়া থাকে।

জড় এবং চৈতন্য যে পৃথক বস্তু, ইহা জীবিত প্রাণিদেহের ধর্ম লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। ইট, কাঠ প্রভৃতি জড় বস্তুর ন্যায় প্রাণিদেহ জড় বস্তু হইলেও সেই সাধারণ জড় বস্তুসকলের সহিত জীবিত প্রাণিদেহের কি কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নাই? অনুভব-লক্ষণরূপ চেতনা-ধর্মের প্রকাশ, জীবিত প্রাণি-শরীর ভিন্ন ঘট-পটাদির মত কোন শুদ্ধ জড় বস্তুতে সম্ভব হয় কি? শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভাল, মন্দ প্রভৃতির অনুভব একমাত্র জীবিত প্রাণি-দেহ ভিন্ন ইট, কাঠ, থালা, বাটির মত কোন শুদ্ধ জড় বস্তুতে কেহ কি কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সমস্ত জড় বস্তুর মধ্যে জীবিত প্রাণিদেহের উক্ত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, কেবল এইখানেই প্রকৃষ্টরূপে অনুসন্ধান করিতে পারিলে চিৎকণ জীবের সত্তা আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রাণি-দেহ শুদ্ধ জড় হইলেও উহার অভ্যন্তরে 'জীব' নামক আত্মা বা চেতন বস্তুর বিদ্যমানতা থাকায় সেই জীবাত্মারই চেতনা-ধর্ম সঞ্চারিত হইয়া জড় দেহ হইতেও অনুভব লক্ষণের প্রকাশ হয়। যে-কাল পর্যন্ত অণু-চৈতন্য জীবাত্মা ("এষোঽণুরাত্মা"— শ্রুতিঃ মুণ্ডক ৩।১।৯) জড়দেহে অবস্থিত হয়েন, সেই কাল পর্যন্তই সেই প্রাণি-শরীরকে 'চিদ্-জড়াত্মক' বলা যায়; এবং কেবল চিদ্-জড়াত্মক প্রাণি-শরীর হইতেই সুখ-দুঃখাদি অনুভব-লক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার চিৎকণ জীব, দেহ হইতে বিযুক্ত হইবা মাত্র, সেই চিদ্-জড়াত্মক দেহে কেবল জড়ের ধর্ম অচৈতন্য-লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। তখন তাহাতে পূর্ববৎ সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বা চেতনা-লক্ষণ আর প্রকাশ পায় না। অতএব জীবিত কালাবধি প্রাণি-দেহরূপ চিদ্-জড়াত্মক পদার্থের মধ্যেই চিদণু বা চিৎকণ জীবের অবস্থিতি জানিতে হইবে। যে চিদ্বস্তু বিযুক্ত হইলে সেই দেহে, ঘট-পটাদি সাধারণ জড় বস্তুর মতই অচেতন-

লক্ষণ ব্যতীত লেশমাত্রও চেতনা-লক্ষণ দৃষ্ট হয় না,— তাহাই 'জীব' নামক শুদ্ধ চিন্ময় চিৎকণ বস্তু।*

জীবাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর যে-দেহ গলিত না হইয়া দিবসকাল মাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, জীবিতাবস্থায় সেই জড় দেহই যে শতাধিক বর্ষকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে,— ইহা দেহের নিজ ধর্ম নহে, তদন্তর্গত চিৎকণ— চিদ্-বস্তুরই স্বভাব। আরক দ্বারা সংমিশ্রিত জল, যেমন আরকেরই শক্তি গ্রহণপূর্বক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া পরিশেষে নিজ ধর্ম পূতিভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি দিবসকাল স্থায়ী অনিত্য জড় দেহকেও যে শতাধিক বর্ষকাল পর্যন্ত অবস্থান করিতে দেখা যায়, ইহা তদন্তর্বর্তী সেই চিদণু জীবেরই নিত্যত্ব-ধর্মের কিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র। জীব এমনই নিত্যবস্তু যে, বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে— জড়তার সহস্র আবর্তে আবৃত হইয়া পড়িলেও— তাহার ভিতর হইতেও জীবের নিত্যতা-ধর্মের প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে। অস্থায়ী জড়দেহ, চিরস্থায়ী চিদ্‌বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া, সেই চিদণুরই প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী হইতে সমর্থ হয়। নিত্যবস্তু জীবাত্মা, অনিত্য জড়দেহকে

*প্রাণিদেহ জড়বস্তু হইলেও উহাতে যে চেতনা-লক্ষণ দেখা যায়, উহা চিৎকণ জীবের ধর্ম; আর জীবাত্মা-পরিত্যক্ত দেহে যে কেবল অচেতন-লক্ষণ দেখা যায়, উহা জড়ের নিজ ধর্ম। আজিকার জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যকে জড়াতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই মনে করিতেছেন। ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে আবার জগতে জড় বিজ্ঞানের উপর চিদ্-বিজ্ঞানের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে,— চিদ্-বিজ্ঞানের অনুশীলন অধিক প্রসারতা লাভ করিবে। তখন আবার আমরা বুঝিতে পারিব,— ভারতের আধ্যাত্মিক ঋষিগণ অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না; তাঁহারা জড় বৈজ্ঞানিক না থাকিতে পারেন, কিন্তু সমুন্নত চিদ্-বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বর্তমান জড়-বিজ্ঞানের শীর্ষদেশ আর একটু উন্নত হইলেই চিদ্-বিজ্ঞানের পাদপীঠকে স্পর্শ করিবে।

তাহার সহিত নিত্যের পথে টানিয়া লইয়া চলিলেও, নিত্যের যাত্রীর সহিত তাল মিলাইয়া অনিত্য জড় কতদিন চলিবে ?

তাই দিবসকাল স্থায়ী জীবদেহ, চিদাত্মারই প্রভাবে দীর্ঘদিন তাহার অনুসরণ করিতে পারিলেও, শেষ পর্যন্ত তাহাতে জড়ের অনিত্যতা-ধর্মই প্রকাশ পায়। তখন অনিত্য সে নিত্যের পথিক জীবাত্মাকে নিত্যের পথে ছাড়িয়া দিয়া, নিজ জীর্ণ, অবসন্ন, ক্ষণভঙ্গুর সত্তাকে অনিত্যের ধূলায় লুটাইয়া দেয়। এইরূপে দেহাত্মবোধ বা দেহকেই আমি-জ্ঞানে বিমুগ্ধ জীবাত্মা নিজ ধর্ম সঞ্চারপূর্বক অস্থায়ী জড় দেহকে নিজেরই মত চিরস্থায়ী করিতে যাইলেও অনিত্য জড় বস্তু সে-দান গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না; না হইলেও অন্ততঃপক্ষে অস্থায়ীকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া থাকে।

চিদ্-জড়াত্মক প্রাণিদেহের এই দীর্ঘস্থায়িত্ব— ইহাই হইতেছে চিদণুর নিত্য-স্থায়িত্বের নিদর্শন এবং চৈতন্য-পরিত্যক্ত জড়দেহের অস্থায়িত্বই জড়ের অনিত্যতার পরিচায়ক। অতএব অস্থায়ী ও অচেতন-লক্ষণ যাহা, সেই জড় দেহে যে-কাল পর্যন্ত তৎ-বিপরীত অর্থাৎ স্থায়িত্ব ও চৈতন্য-লক্ষণ দৃষ্ট হয়,— বুঝিতে হইবে উহাই দেহান্তর্বর্তী— 'জীব' নামক চিদণুর ধর্ম। তাহা হইলে, পূর্বে চিদ্‌বস্তুর লক্ষণ সম্বন্ধে কেবল শাস্ত্রোক্তি হইতে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছিল, এখন এই জড় জগতের ভিতর হইতে জীবিত প্রাণিদেহস্থিত চিদণুর ধর্মে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি; যথা,—

(১) সৎ অর্থাৎ নিত্য, এবং

(২) চিদ্ অর্থাৎ চেতন।

অতঃপর আনন্দ-লক্ষণের কথা। আমরা আর একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে, সেই চিদণুর স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই বুঝিতে পারিব, 'আনন্দ' বা সুখ-লক্ষণ, উহা জড়দেহের ধর্ম নহে,— তদন্তর্গত চিদ্‌বস্তুরই স্বধর্ম। 'জড়' আনন্দের আবরক বা' নিরানন্দ' বস্তু। নিজে সুখস্বরূপ

হইয়াও সুখাস্বাদন করিয়া সুখী হওয়া চিদ্‌বস্তুর স্বভাব। সুখের বিপরীত ধর্মই জড়ে বিদ্যমান; অতএব জড়তার আবরণে জীবের স্বাভাবিক সুখ-লক্ষণ আবৃতই হইয়া পড়ে।

তবে যে জড় বিষয়সকল হইতে আমরা সুখানুভব করি— ধন, ধান্য, সহায়, সম্পদ, পুত্র (পুত্রের জড় দেহ), কলত্রাদি জড় বিষয়সকল যে সুখকর বোধ হয়, তাহা বস্তুত জড়ের নিজ ধর্ম নহে; জড়ের উপর সুখময় 'আত্মভাব' প্রতিবিম্বিত হইলে, তৎসম্পর্কেই সুখহীন জড় বিষয়-সকল সুখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বিম্বের শোভা যেমন দর্পণাদির উপর প্রতিবিম্বিত হইলে উহাকেও সুন্দর করিয়া তোলে,— যেমন শরতের পূর্ণচন্দ্র ও নক্ষত্র-খচিত সুনীল আকাশ, অপরিচ্ছন্ন ও পঙ্কিল জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকেও রমণীয় করিয়া দেয়,— সেই সৌন্দর্য যেমন বিম্বেরই, দপর্ণাদির নহে; সেইরূপ চিন্ময় অন্তরাত্মা বা আত্মবস্তুর এমনই প্রিয়তা, এতই সুখপ্রভাব যে, উহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ — সে দূরের কথা, প্রতিবিম্বিত হইলেও কেবল উহার সম্বন্ধ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখহীন জড় বস্তু সুখকর ও প্রিয় হইয়া থাকে। মিছরি মিশ্রিত হইয়াই তবে জলকে মিষ্ট করে; মিছরির ছায়ার সংস্পর্শে জল কখনও মিষ্ট হয় না; কিন্তু চিন্ময় বস্তুর সুখ-ধর্মের এমনই অত্যাশ্চর্য প্রভাব যে, কেবল মিশ্রনেই নহে,— উহা প্রতিবিম্বিত হইলেও সুখহীন জড় বস্তুও সুখময় হইয়া উঠে। তাই সুখস্বরূপ জীবাত্মা, অবিদ্যাদি নিবন্ধন যখন দেহকে আত্মবোধ অর্থাৎ 'আমি' মনে করে, তখন আত্মার সুখধর্ম দেহে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে সুখময়,— সুতরাং, 'প্রিয়' বোধ করাইয়া থাকে।

আবার জড় দেহে প্রতিবিম্বিত সেই আত্মভাব যখন তাহা হইতে উচ্ছলিত হইয়া পুনরায় গেহাদি জড়বিষয়ে সংলিপ্ত হয়, তখন আত্মার সম্বন্ধাভাস বশতঃ উহাদিগকেও 'আত্মীয়' অর্থাৎ 'আমার' বলিয়া প্রতীতি জন্মে;— তখন উহারাও সেই চিৎকণ সুখময় জীবাত্মার

সম্পর্কেই সুখকর ও প্রিয় হইয়া উঠে। ('আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।' —বৃহদারণ্যকে ৪।৫।৬)। এইরূপে দেহ হইতে আত্মভাবের সেই উচ্ছলিত প্রতিবিম্ব বা 'আভাস' যখন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধন, ধান্যাদি বিষয় স্পর্শ করিয়া, যে-পর্যন্ত উহাকে 'আত্মীয়' অর্থাৎ আত্ম-সম্পর্কিত বা আমার বলিয়া বোধ না করায়, সে-পর্যন্ত কোন বিষয়ই কাহারও নিকট সুখকর ও প্রিয় হয় না, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ কাহারও নিকট কোন বিষয়-সম্পদ, ধন, রত্ন, খ্যাতি, সম্মান, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কিছুই সুখকর ও প্রীতিকর হয় না, যে-পর্যন্ত তাহার সহিত একটি 'আমার'— এই সুখময় আত্ম-সম্বন্ধের সংযোগ না ঘটে। যাহার উচ্ছলিত প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আভাসের সংস্পর্শ লাগিয়াই সুখহীন জড়-বিষয়ে সুখ-লক্ষণ ফুটিয়া উঠে,— 'আনন্দ' যে সেই চিন্ময় জীবাত্মারই স্বধর্ম,— উহা যে জড়দেহের ধর্ম নহে,— এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে চিদণুতে, 'আনন্দ'-লক্ষণ যখন স্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন চিদ্‌রাশি কিম্বা বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বর যে পরমানন্দ বস্তু, একথা অধিক বলিবার আর আবশ্যকতাই বা কি? জীব চিৎকণ বলিয়া সুখময় বস্তু হইলেও, জীবাত্মার আশ্রয় যিনি,— সেই অন্তর্যামী পরমাত্ম-বস্তুই পরম সুখ-স্বরূপ হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্যামী পরমাত্মার পরমাবস্থা; ("কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্"— শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৫); তিনিই সকল সুখ— সকল আনন্দের মূল উৎস। তাঁহারই সম্বন্ধে আত্মা, দেহ, গেহ, বিত্ত ও পুত্রাদি যেখানে যাহা কিছু সুখ-সম্বন্ধ আছে, সমস্তই সুখকর ও প্রিয় হইয়া থাকে; শাস্ত্রও এই কথাই আমাদিগকে বিদিত করাইয়াছেন, যথা,—

"প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥"

— (শ্রীভাঃ ১০।২৩।২৭)

অর্থাৎ— যাঁহার প্রিয়তার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদি বিষয়সকল প্রিয় হইয়া থাকে, তাঁহা হইতে আর অন্য কে প্রিয় আছে!

তাহা হইলে এই জড় জগতের ভিতর প্রাণি-দেহ নামক জড় বস্তুর অভ্যন্তর হইতে চিদণুর ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা এখন অনায়াসে নিম্নোক্ত বিষয় স্বীকার করিতে পারি ; ঃ—

(১) যে বস্তুর অংশ উপলব্ধি করা যাইতেছে, তাহার রাশি বা পূর্ণ অবশ্যই কোথাও বিদ্যমান আছে ; সুতরাং এই জগতে অণু-চৈতন্যের উপলব্ধিতে শাস্ত্রোক্ত রাশি-চৈতন্যের অবস্থিতির কথা অপরিহার্যই হইতেছে। জীবকে বিশেষভাবে স্ফুলিঙ্গের স্থানীয় 'তটস্থা শক্তি' ধরিলেও, স্ফুলিঙ্গের বিদ্যমানতায়ও যেমন প্রভা ও অগ্নির অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জীবের সত্তা উপলব্ধি করিলে, প্রভাস্থানীয় স্বরূপশক্তির ও অগ্নিস্থানীয় শক্তিমান পরমেশ্বরের সত্তাও অপরিহার্য হইয়া উঠে।

(২) অণু-চৈতন্যের ধর্ম দেখিয়া, চেতন ও অচেতন যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম-বিশিষ্ট সুতরাং পৃথক বস্তু,— শাস্ত্রোক্ত এই সত্যও সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

(৩) এই জড় জগতের প্রত্যেক জড় বস্তুকেই যেমন অসৎ (অনিত্য), অচিদ্ (অচেতন), এবং আনন্দহীন-লক্ষণেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তেমনি চিৎকণ চিদ্বস্তুতেও তৎ-বিপরীত অর্থাৎ 'সৎ,' 'চিদ্' ও 'আনন্দ'-লক্ষণই দেখা যাইতেছে।

অতএব

(৪) এই অসৎ, অচিদ্ ও নিরানন্দ-লক্ষণ জড় জগতের অতিরিক্ত যে এক সৎ, চিদ্ ও আনন্দময় জগৎ বিদ্যমান আছে,— ইহা কেবল শাস্ত্রের কথাই নহে, উক্ত প্রকারে অংশের ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ণেরও সন্ধান ও স্বভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।

অতঃপর প্রশ্ন এই যে, চিদানন্দ জগৎ যখন জড় জগতের বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন, তখন উহা সবিশেষ বা সাকার না হইয়া নির্বিশেষ বা নিরাকার হওয়াই সম্ভব; কারণ এই জড় জগৎ সাকার ও সবিশেষ। চিন্ময় জগৎ তৎ-বিপরীত হইলে উহাকে অবশ্য নিরাকার — নির্বিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ নমুনা-স্বরূপ চিৎকণ পদার্থের যখন কোন বিশেষ আকারাদি দেখা যায় না, তখন রাশি-চৈতন্য বা চিন্ময় জগৎও যে নিরাকার ও নির্বিশেষ বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ সবিশেষ এবং সমূর্ত হইলেও, ইহার মূলে যে ত্রিগুণা জড়শক্তি নিহিত রহিয়াছে, উহা সাকার বা সবিশেষ নহে,— নিরাকার— নির্বিশেষ। এই সমূর্ত জগৎ, অমূর্ত প্রকৃতি বা মূল জড়শক্তির কার্যাবস্থা। তাহা হইলে জড় জগৎ কেবল সাকার ও সবিশেষ নহে,— মূলে ইহা নিরাকার ও নির্বিশেষ বস্তু। সুতরাং জড় জগতকে কেবল সাকার ও সবিশেষ ধরিয়া লইয়া চিন্ময় জগতকে তৎ-বিপরীত অর্থাৎ কেবল নিরাকার— নির্বিশেষরূপে কল্পনা করা যুক্তি-বিরুদ্ধই হইতেছে।

এস্থলে চিদ্-জড় জগতের পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবটি এই প্রকারে নির্ধারণ করিতে হইবে ;—

জড় জগৎ যেমন মূলে অর্থাৎ কারণরূপে নিরাকার ও নির্বিশেষ এবং কার্যরূপে সাকার— সবিশেষ, চিন্ময় বা চিদানন্দ জগৎ তাহার বিপরীত লক্ষণ বলিয়া, উহা মূলে কারণরূপে সবিশেষ ও সাকার এবং কার্যরূপে নির্বিশেষ ও নিরাকার। অতএব জড় ও চিন্ময় জগতে উক্ত বিষয়ে পরস্পর নিম্নোক্ত প্রকারে অবস্থিত বুঝিতে হইবে ; যথা—

জড় জগৎ	চিন্ময় জগৎ
কারণরূপে··· নির্বিশেষ।	কারণরূপে··· সবিশেষ।
কার্যরূপে··· সবিশেষ।	কার্যরূপে··· নির্বিশেষ।

— ইহাই হইল জড় জগতের ও চিন্ময় জগতের পরস্পর বিরুদ্ধভাব।

তাহা হইলে বুঝিলাম, সবিশেষ ও তদূর্দ্ধে নির্বিশেষ জড় জগতের পর এক শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় জগৎ অবশ্যই বিদ্যমান— যাহার বাহিরে নির্বিশেষ ও ভিতরে বা ঊর্দ্ধে সবিশেষ— সাকার। যাঁহারা এই প্রাকৃত জগতের পর কেবল এক নির্বিশেষ— নিরাকার সচ্চিদানন্দ সত্তামাত্র স্বীকার করেন, বুঝিতে হইবে, সেই নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দই হইতেছেন, তৎকারণ-স্বরূপ ও তন্মূলে অবস্থিত সবিশেষ সমূর্ত সচিদানন্দ-স্বরূপেরই কার্যাবস্থা। ("ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"— শ্রীগীতা, বা "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।"— ব্রহ্মসংহিতা।)

চিদ্ ও জড়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই চিদ্-জড়াত্মক জগতে চিদণুর স্বভাব উপলব্ধি করিলে, সেই শাস্ত্রোক্তিরই যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন সেই চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে অপর সবিশেষ সংবাদ যাহা মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর— তদ্বিষয়ে জানিতে হইলে, অতঃপর কেবল শাস্ত্র-নির্দেশকেই সুসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনই বাধা থাকিতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞাত বিষয়সকল যাহা হইতে জানা যায়, তাহাকেই 'শাস্ত্র' কহে ; — ("অজ্ঞাত জ্ঞাপনং শাস্ত্রম্।")।

শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি,— সবিশেষ ও সমূর্ত জড়-জগতের মূলে, নির্বিশেষ জড়শক্তি বা প্রকৃতি। প্রকৃতির ঊর্দ্ধে 'পরব্যোম' নামক শুদ্ধ চিন্ময় জগৎ। সেই পরব্যোমের আবার নির্বিশেষ ও সবিশেষভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ। প্রকৃতি বা "দেবীধামের" প্রান্ত সীমার পর 'বিরজা' নামক 'কারণ-সমুদ্র' যাহা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের মধ্যে সীমারেখারূপে বিরাজিত। ("প্রধান-পরমবৌম্নোরন্তরে বিরজা নদী।"— পাদ্মে)। তদূর্দ্ধে নির্বিশেষ পরব্যোম বা চিচ্ছক্তির সীমা। ইহাকে 'সিদ্ধলোক' বা 'মহেশধাম' বলা হয়। সাযুজ্যমুক্তির অধিকারী জীবসকলের এই পর্যন্ত গতি। তাহার ঊর্দ্ধে কমলাকার— সবিশেষ পরব্যোম বা চিন্ময় জগতের

আরম্ভ। দলস্থানীয় উহার বহির্বিলাস সকলকে 'বৈকুণ্ঠলোক' বা 'হরিধাম' কহে। অনন্যাপেক্ষী— স্বয়ং ভগবানের শ্রীনারায়ণাদি বিলাস-মূর্তিসকল ও শ্রীরাম-নৃসিংহ, মৎস্যাদি স্বাংশাবতার সকলের যেখানে নিত্য অবস্থিতি। কর্ণিকার বা পদ্মবীজকোষস্থানীয় সমষ্টিকেন্দ্রের নাম 'গোলোক' বা 'কৃষ্ণধাম' যাহার মধ্যভাগ শ্রীবৃন্দাবন ও উভয় পার্শ্বে মথুরা দ্বারকা নামক পুরীদ্বয় শোভিত। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহার আবির্ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। এই স্থলেই কেবল স্বয়ং-রূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান পরিকরগণের সহিত নিত্য-লীলাপরায়ণ। নিরাকারের ঊর্ধ্বে বা অভ্যন্তরে সাকার— সবিশেষ সচ্চিদানন্দ জগৎ ও জগন্নাথের অবস্থিতি সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত মর্ম; যাহার অপরোক্ষ অনুভূতি কেবল ভজন সাপেক্ষ। সেই সকল শাস্ত্রোক্তিরই সারমর্ম আমাদিগকে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার নিম্নোক্ত প্রকারে বিদিত করাইয়াছেন।

"যাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥"
"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎ-স্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তির বিকার॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।

সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥”

(১।২।৮-৯ ; ১।৫।২৮-৩২)

ভক্তির অধিকার ব্যতীত নির্বিশেষ চিচ্ছক্তির গহন অভ্যন্তরে, সেই সবিশেষ সচ্চিদানন্দ জগৎ ও সাকার জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার, সে বহু দূরের কথা,— সন্ধান পর্যন্তও অবগত হওয়া যায় না। বস্তুর বাহ্যাবরণ সাধারণ আলোকে প্রকাশিত হইলেও তদভ্যন্তরস্থিত বিশেষ বিশেষ ভাবসকল যেমন একমাত্র ‘রঞ্জন-রশ্মি’ দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হয়, সেইরূপ নির্বিশেষ চিৎশক্তির অভ্যন্তরে সবিশেষ— সচ্চিদানন্দ জগৎ ও সমূর্ত জগন্নাথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া কেবল ভক্তি-রঞ্জনালোকেই সম্ভব হইয়া থাকে ; (“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—।” শ্রীভাঃ ১১।১৪।২১)— এই কথা শ্রীভগবান আরও সুস্পষ্টরূপে নিজেই বলিয়াছেন ;

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥”

— (শ্রীভাঃ ১১।১৪।১৯)

ইহার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিদ্বারা বশীভূত আমি, কেবল ভক্তের নিকট যেরূপ সাকার— সবিশেষ প্রকাশ হই, অষ্টাঙ্গ-যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না বলিয়া, আমি সেখানে কেবল নিরাকার— নির্বিশেষাদিরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকি।

সুতরাং ভক্তিভাবের আনুকূল্য ব্যতীত, নির্বিশেষ ঊর্ধ্বে সবিশেষ চিদানন্দ জগতের সন্ধান পর্যন্তও পাওয়া যায় না বলিয়া, উহাকে কেবল নিরাকার— নির্বিশেষ বলিয়া মনে করিবার কারণ ঘটিয়া থাকে।

অতঃপর এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, জড় শক্তির বিকার এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতের পক্ষে সবিশেষ অর্থাৎ নানাভাবে ও নানারূপে প্রকাশ হওয়া, প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিভাগহেতু সম্ভব হইয়া থাকে।

মূল প্রকৃতি নির্বিশেষ হইলেও, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সংমিশ্রণের ভিন্নতা অনুসারে নানারূপে ও নানাভাবে এই সমূর্ত জগতের প্রকাশ। যেমন সাদা, লাল ও কাল, এই তিনটি বর্ণের নানাভাগে সংমিশ্রণ দ্বারা অসংখ্য প্রকার বর্ণ উৎপাদন করা যাইতে পারে, তেমনি প্রকৃতি বা জড় শক্তির মূলে তিনটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায়, সেই গুণত্রয়ের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ নিবন্ধন, এই জগৎ-বৈচিত্র্য বা সবিশেষ জড় জগৎ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চিদ্বস্তু নির্গুণ। তাহাতে যখন প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের গন্ধমাত্র নাই, তখন ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন এই সাকার জগতের ন্যায় ত্রিগুণাতীত চিদ্‌রাশির পক্ষে কি প্রকারে সবিশেষ ও সাকার হওয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং চিন্ময় জগৎ বলিতে, কেবল নির্বিশেষ চিদ্-সত্তামাত্রই বুঝিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, চিন্ময় জগতে এক চিচ্ছক্তি ভিন্ন অপর নানা কিছু না থাকিলেও ("নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" শ্রুতিঃ বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯), এক চিদ্‌বস্তুরই 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ'— এই ত্রিবিধ ধর্ম বা ভাব-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে, এবং যাহা চিদ্বস্তু হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে,— একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক চন্দনেরই যেমন শ্বেতত্ব, সৌগন্ধ্য এবং শীতলতা,— এক চিদ্বস্তুরও ভাব-বৈশিষ্ট্য সেইরূপ।

'সত্ত্ব' হইতে সুখ বা আনন্দ জন্মে; ("সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি—।" শ্রীগীতা, ১৪।৯); চিদ্বস্তুই যখন যথার্থ সুখ-স্বরূপ, তখন সেই সুখরূপ চিদানন্দ জগৎ-বিকাশের মূলে 'সত্ত্ব' নামক একটি বিশেষ ধর্ম যে অবশ্যই বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় জড় বস্তু। ইহাদের মধ্যে রজঃ ও তমঃ, সুস্পষ্টরূপেই দুঃখ-মোহাদির জনক; ("রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।"— শ্রীগীতা, ১৪।১৬)। প্রাকৃত সত্ত্ব গুণ

হইতে যে সুখ জন্মে, উহাও যথার্থ সুখ নহে,— "সুখাভাস" মাত্র। তমঃ ও রজঃ গুণ হইতে সত্ত্বগুণ নিজ স্বচ্ছতা বশতঃ সুখস্বরূপ চিদ্‌বস্তুর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিষয় বলিয়া, সেই যথার্থ সুখের কিঞ্চিৎ গন্ধমাত্র উহাতে সংলিপ্ত হওয়ায়, উহার সত্ত্বত্ব কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই 'সত্ত্বের' সুখধর্ম ও 'গুণের' বা জড়ের দুঃখধর্ম— এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, মধ্যাবস্থা যাহা— সেই 'সুখাভাস' সত্ত্বগুণ বা জড়সত্ত্ব হইতে সঞ্জাত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-বিমোহিত জীবের নিকট যথার্থ 'সুখ'-বস্তু অপরিচিত বলিয়া প্রাকৃত সত্ত্বগুণ-সঞ্জাত সুখাভাসকেই 'সুখ' নামে উল্লেখ করা হয়।

চিদ্‌বস্তুর অন্তর্গত 'সত্ত্ব'— যাহা হইতে সুখময় জগতের সত্তা বা বিকাশ, তাহা 'সত্ত্বগুণ' বা প্রাকৃত 'সত্ত্ব' নহে; উহা নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত 'শুদ্ধসত্ত্ব'। এই 'শুদ্ধসত্ত্বের' অপর নাম 'বসুদেব' ('সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং।'— শ্রীভাঃ ৪।৩।২৩)। লীলায় যেমন বসুদেব হইতে সমূর্ত আনন্দঘন শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়, তত্ত্বেও সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের ত্রিবিধ ভাব-বৈশিষ্ট্য হইতে আনন্দময় জগৎ-বৈচিত্র্য বা সবিশেষ— সমূর্ত চিদানন্দ জগতের সহিত চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের প্রকাশ হইয়া থাকে।

চিচ্ছক্তি সেখানে কেবল নির্বিশেষ, সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশাভাব; এবং তদবস্থায় সেই নির্বিশেষ চিৎ-সত্তাকে কেবল 'চিদ্' বা 'সচ্চিদানন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। আর তদূর্ধ্বে যেখানে চিচ্ছক্তি বিলাসময়ী অর্থাৎ সবিশেষ সমূর্ত, সেখানে সেই চিৎশক্তির সৎ, চিদ্ ও আনন্দ— এই ত্রিবিধ ভাবকে যথাক্রমে 'সন্ধিনী' 'সম্বিৎ' ও 'হ্লাদিনী' নামে নির্দেশ করা হয়, এবং সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বের সম্যক প্রকাশ। সন্ধিনীর সারকেই শুদ্ধসত্ত্ব কহে। প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণভেদ হইতে যেমন এই জগৎ-বৈচিত্র্য সম্ভব হয়, তেমনি স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সবিশেষ সচ্চিদানন্দ জগতের সকল বৈচিত্র্যই

সুখরূপ আনন্দমূর্তি বলিয়া, তৎসমুদয়ের সত্তা, শুদ্ধসত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে একই শুদ্ধ-সত্ত্ব, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী— এই ভাবত্রয়ের সংযোগে ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া ত্রিগুণ হইতে এই জগৎ-বৈচিত্র্য সম্পাদনের ন্যায়, তদ্দ্বারা সবিশেষ চিদানন্দ জগৎ-বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রাকৃত অপকৃষ্ট জড় শক্তিত্রয়ের পক্ষে সম্মিলিত হইয়া যদি এতাদৃশ বিচিত্রতাপূর্ণ সমূর্ত জগৎরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে সর্বোৎকৃষ্টা স্বরূপশক্তির পক্ষে জড় জগৎ হইতেও অধিক বৈচিত্র্যময়— সবিশেষ চিদানন্দ জগৎরূপে প্রকাশ হওয়া কোন প্রকারেই যে অসম্ভব নহে, একথার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ— যারে জ্ঞান করি মানি॥"
"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ)

এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জড় জগৎ অনিত্য বলিয়া, জড় জগতের উৎপত্তি ও বিলয় আছে; কিন্তু চিন্ময় জগতের সমস্তই নিত্য বস্তু; উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জড় ও চিৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া নির্বিশেষ জড় শক্তি বা প্রকৃতি হইতে সবিশেষ জড় জগতের প্রকাশ এবং সবিশেষ চিন্ময় জগৎ হইতে নির্বিশেষ চিচ্ছক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। সবিশেষ সূর্য হইতে যুগপৎ প্রকাশিত নির্বিশেষ জ্যোতির ন্যায়, সাকার— চিদানন্দ জগৎ, নিরাকার চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা কারণ হইয়াও উভয় প্রকাশই যুগপৎ অনাদি এবং নিত্য।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, চিদানন্দ-জগৎ নিরাকার ও নির্বিশেষ নহে; সেখানে তরু, লতা, ফল, পুষ্প, নদী, পর্বত, মেঘ, বিদ্যুৎ, শিশির, বসন্ত, বায়ু, জল, অগ্নি, দেবতা, পিতা, মাতা, কান্তা, সখা, স্বজন, বসন, ভূষণ, প্রাসাদ, কানন, যান, বাহন, ধাতু, রত্ন, ভোক্ষ্য, পানীয় প্রভৃতি এই জগতের মত সকল পদার্থ ও তদতিরিক্ত যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না,— এমন অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ সে স্থান।

অধিকন্তু চিন্ময় জগতের সকল বস্তু— সকল বিষয়ই কেবল কল্যাণগুণাত্মক; ("সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মকোহি।"— বিষ্ণুপুঃ ৬।৫।৮৪)। সেখানে প্রাকৃত হেয় গুণের ন্যায় দুঃখ বা অমঙ্গলকর কিছুই নাই; ("বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিঃ"— বিষ্ণুপুঃ)— এ বিষয়ে জড়-জগৎ হইতে চিন্ময়-জগতের ইহাই বিপরীত লক্ষণ।

যেমন পৃথিবীতে পার্থিব উপাদানে, বায়ুলোকে বায়বীয় উপাদানে, বরুণলোকে জলীয় উপাদানে ও সূর্যমণ্ডলে তৈজস উপাদানে সকল পদার্থ নির্মিত,— সেইরূপ সবিশেষ আনন্দ-চিন্ময়-লোকের সকল বস্তুই আনন্দময়— আনন্দে গড়া মূর্তি। সুতরাং জড়-পদার্থের সহিত চিন্ময়-পদার্থ সকলের নাম ও রূপে ভিন্নতা না থাকিলেও উপাদনে উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সে-কথা সর্বভাবে স্মরণ রাখিয়া, শাস্ত্রে যেখানেই চিন্ময় জগতের যে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইবে, সেখানেই উহার সহিত "আনন্দে গড়া" বা "আনন্দময়" — এই কথাটি যুক্ত করিয়া যে-অর্থ প্রকাশ হয়, তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

সর্বরস-ভূপ— স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে যে সবিশেষ আনন্দ-জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তাহারই নাম সবিশেষ স্বরূপ-শক্তি বা চিদানন্দ জগৎ; ("রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"— শ্রুতিঃ তৈত্তিরী ২।৭।১)। সেখানে রসঘন শ্রীভগবানের

অধর-সুধা-সিক্ত; আনন্দের মুরলী হইতে আনন্দ-ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া চরাচর সর্বাত্মাকে সম্মোহিত করে; আনন্দ যমুনা আনন্দের লহরী তুলিয়া উজান প্রবাহিত হয়; সেখানে আনন্দ কদম্ব ও আনন্দ কমল হইতে আনন্দ মধুধারা ক্ষরিত হইতে থাকে,— যাহা পান করিবার জন্য আনন্দ-অলিকূল চতুর্দিক হইতে আনন্দ-গুঞ্জন করিয়া ধাবিত হয়; আনন্দের ময়ূর-ময়ূরী আনন্দ 'কেকা' রবে আনন্দ পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া সেখানে আনন্দ-নৃত্যে রত হইয়া থাকে; আনন্দ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত আনন্দ-শীতল যমুনা-পুলিনে আনন্দময়ী অসংখ্য গোপ-সুন্দরী কর্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীভগবান আনন্দ-রাস-নৃত্যোৎসবে নিত্য নিমগ্ন থাকেন। সেখানে আনন্দের বৃক্ষ আনন্দের ফুল-ফলে পরিশোভিত হইয়া আনন্দ-সমীরণের মধুর হিল্লোলে মৃদু আন্দোলিত হয়; আনন্দের ধেনুসকল আনন্দ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে;— ইত্যাদি প্রকারে সমস্তই আনন্দ-চিন্ময় বলিয়া বুঝিতে হইবে; নচেৎ নাম ও রূপে সমতার জন্য চিন্ময় পদার্থসকলকে জড়ময় পদার্থ হইতে পৃথক উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না।

চিদানন্দময় শ্রীভগবান ও তদীয় চিদানন্দধাম সবিশেষ ও সমূর্ত হইলেও, শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে "নির্গুণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় এই "নির্গুণ" অর্থে "সর্ব্বগুণশূন্যতা" অর্থাৎ সেখানে কোন গুণ— কোন ধর্মই নাই— ইহার এইরূপ 'নির্বিশেষ' অর্থ গ্রহণীয় নহে। প্রাকৃত গুণের নিষেধই এই নির্গুণ শব্দের অভিপ্রায়; অর্থাৎ সেখানে প্রাকৃত সত্ত্বাদি কোন হেয় গুণ নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত চিদানন্দময় অনন্ত গুণসম্পদে উহা পূর্ণ, — উক্ত নির্গুণ শব্দের এই অর্থই শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। যথাঃ—

"যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয়-সংযুক্তৈ র্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥"

— (পাদ্মে, উ ৯১ অঃ)

অর্থাৎ, পরমেশ্বর বিষয়ে শাস্ত্রে যে নির্গুণ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে,

তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণেরই অভাব বলা হইয়াছে; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণের নিষেধ করা হয় নাই।

সেই প্রকার তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে স্থলবিশেষে যে 'অরূপ,' 'অনাম' প্রভৃতি নির্বিশেষবোধক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, "ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।"— শ্রীভাঃ ৮।৩।৮), সে স্থলে উহাকে নির্বিশেষ অর্থে না বুঝিয়া, পূর্বোক্ত 'নির্গুণ' শব্দার্থের মতই অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য শাস্ত্র নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন; যথা:—

"অনামাঽসৌঽপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জ্জনাৎ"

— (পাদ্মে পাঃ, ৫১ অঃ)

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নামসকল হইতে অতিরিক্ত তদীয় নাম অপ্রাকৃত বিধায় অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে 'অনামা' এবং সেই অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত ভূতবর্জিত বলিয়া, উহাকে 'অরূপ' বলা হয়।

এইরূপ "সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, ("ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং—।" কঠ শ্রুতিঃ ২।২ ১৫) ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি দেখিয়া চিদানন্দ-জগতকে নিরাকার নির্বিশেষ মনে না করিয়া, ইহারও পূর্বোক্ত প্রাকৃতত্ব নিষেধ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ সেখানে প্রাকৃত সূর্য-চন্দ্রাদি নাই, কিন্তু তথাকার সূর্য-চন্দ্রাদি গ্রহ-নক্ষত্রসকল সমস্তই অপ্রাকৃত— চিদানন্দময়; ("চিদানন্দ-জ্যোতি—" ব্রহ্ম সংহিতা।)— ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

এখন আমরা 'বিদ্বদনুভব' রূপ প্রমাণ দ্বারা, অর্থাৎ চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে যাঁহারা অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন,— সেই মহৎগণের সাক্ষাৎ অনুভব হইতেও, চিদ্‌বস্তুর সুখ-লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত শাস্ত্রোক্তিরই যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টাশীল হইব।

চিদ্ ও জড় পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া, জড়বিষয়-সুখ অর্থাৎ 'সুখাভাস' হইতে চিন্ময় বিষয়-সুখের বিপরীত লক্ষণই, অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন মহৎ-গণের বর্ণনা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

সুখাভাস হইতেছে ক্ষয়শীল। তাই প্রতিক্ষণ পুরাতনের দিকে উহার গতি। প্রাকৃত বিষয়-সুখমাত্রেই প্রথম প্রাপ্তিকালে যে নূতনত্ব অনুভব হয়, পরমুহূর্ত হইতে উহা প্রতিক্ষণে পূর্বাপেক্ষা পুরাতন হইয়া, পরিশেষে তাহাতে আর সুখবোধ হয় না। তখন অপর কোন সুখকর বিষয় প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা হয়। ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষয়শীল প্রাকৃত বিষয়-সুখের এই লক্ষণ।

কিন্তু চিন্ময় বিষয়-সুখ যাহা, তাহাই যথার্থ সুখস্বরূপ বলিয়া, উহাতে পূর্বোক্ত সুখাভাস লক্ষণের ঠিক বিপরীত ধর্মই অনুভূত হইয়া থাকে। তাই মহাভাগবতগণের সাক্ষাৎ অনুভব মাখা লেখনীর বর্ণনার ভিতর দেখা যায়, নিজ প্রিয় সখিগণ শ্রীরাধিকাকে তদীয় প্রাণকান্তের সহিত বিলাসসুখের অনুভূতি সম্বন্ধে জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে, শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,—

"সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত—
তিলে তিলে নূতন হোয়॥"— বিদ্যাপতি।

অর্থাৎ, সখি! সে অনুভবের কথা আর কি-ই-বা জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? সেই তাঁহার প্রীতিরস— আর কি বলিব,— তাহা নূতন হইয়াও যেন তিলে তিলে নূতনতর হইতে থাকে।

জড় বিষয়-সুখের প্রতিক্ষণ পুরাতন হওয়া, আর চিন্ময় বিষয়-সুখের প্রতিক্ষণ নূতন হওয়া,— চিদ্ ও জড়ের পরস্পর ইহাই বিপরীত লক্ষণ। শ্রীভগবৎ-স্বরূপের আনন্দ ধর্মের মতই তদীয় স্বরূপ-শক্তি-নির্মিত সবিশেষ ধাম বা চিদানন্দ জগতের সুখ-লক্ষণ একই জাতীয়।

এই সংসারে দেখা যায়, লোকে কোন সুখকর দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে যখন সে বিষয়ে আর কোন সুখাস্বাদ থাকে না, তখনই বলা হয়— "তৃপ্ত হইলাম।" যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া, পরিবেশক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে 'পরিতোষ পূর্বক ভোজন করুন' বলিয়া

বহু মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতে থাকিলে ভোক্তা উহা আকণ্ঠ ভোজন-পূর্বক পরে নিষেধ সূচক বাহু-সঞ্চালন পূর্বক বলিয়া থাকেন, "আর না! যথেষ্ট তৃপ্ত হইয়াছি!" এই তৃপ্তির অর্থ হইতেছে— তদ্বিষয়ে 'বিরাগ'; অর্থাৎ সেই বস্তুতে এতই বিরাগ বা বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে যে, আর ভোজন করা দূরের কথা,— উহার নাম পর্যন্ত শ্রবণেও বমনের উদ্রেক হইতেছে। যতক্ষণ উদর পূর্ণ হয় নাই— সেই অতৃপ্ত অবস্থায় যে সুখানুভূতি ছিল, উদর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখানুভূতি অন্তর্হিত হইয়া পরিশেষে উহা যখন দুঃখজনক হইয়া উঠে, তখনই বলা হয় "আর না! তৃপ্ত হইয়াছি"— ইত্যাদি। এই প্রকারে মিষ্টান্নে তৃপ্তি নামক সুখতৃষ্ণাশূন্যতা উপস্থিত হইলে লোকে তখন পুনরায় সুখলাভের জন্য বিষয়ান্তর কামনা করে; যেমন সেরূপ স্থলে "জল আনুন" বা "পান দিন" প্রভৃতি বলিয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, প্রাকৃত বিষয়-সুখ বা 'সুখাভাস' অল্প ও ক্ষয়শীল বলিয়া, উহা অন্তর্হিত হইলেই তৎকালে লোকে তাহাতে 'তৃপ্ত' হইয়া পুনরায় অপর কোন বিষয়-সুখ অন্বেষণ করে। এই প্রাকৃত সুখ বা সুখাভাস-লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।" (শ্রুতিঃ, ছাঃ ৭।২৪।১) অর্থাৎ যে বিষয় সুখভোগ-পূর্বক তাহাতে বিতৃষ্ণ হইয়া লোকে অন্য বিষয় দেখিতে চায়, অন্য শুনিতে চায়, অন্য জানিতে চায়, তাহাই 'অল্প' বা পরিছিন্ন ক্ষয়শীল প্রাকৃত সুখ।

চিদানন্দ বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য বলিয়া সেই সুখানুভূতির নিবৃত্তি হয় না; তাই তাহাতে 'তৃপ্তি' নামক বিতৃষ্ণা আসে না। চির তৃষ্ণা বা চির অতৃপ্তিই হইতেছে সেই সুখাস্বাদের লক্ষণ।

সুখাভাসে এবং যথার্থ সুখের মধ্যে পরস্পর বিপরীত ধর্ম হইতেছে ইহাই। অর্থাৎ ক্ষয়শীল জড় বিষয়-সুখ ভোগে 'তৃপ্তি' নামক বিতৃষ্ণা বা অবসাদ আসে, আর বর্ধনশীল চিন্ময় বিষয়সুখ ভোগ

করিয়া 'অতৃপ্তি' লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে; তাহাতে কখন বিতৃষ্ণা বা অবসাদ আসে না বলিয়া বিষয়ান্তর প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় না। এই চিন্ময় সুখ সম্বন্ধে শ্রুতি পূর্বোক্ত প্রাকৃত সুখ-লক্ষণের ঠিক বিপরীত লক্ষণই প্রকাশ করিয়াছেন,— "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।" (ছা ৭।২৩।১) অর্থাৎ, যে সুখ ভোগ করিয়া আর কোন বিষয় দেখিবার থাকে না, আর কিছু শুনিবার থাকে না, আর কিছু জানিবার থাকে না, তাহাই 'ভূমা'— তাহাই অধিক— অনন্ত।

বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ লক্ষণ না হইলে তাহাকে কি 'সুখ' বলা যায়! তাই ভক্তগণের বর্ণনায় দেখিতে পাই, চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণরূপ ও সঙ্গ আস্বাদন-পূর্বক শ্রীরাধিকা, সেই চির অতৃপ্তি— বিরামহীন চির-তৃষ্ণার অনুভূতিই সখিগণ সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

"জনম অবধি হাম রূপ নিহারল,
নয়ন না তিরপিত ভেল;
সেহো মধুবোল শ্রবণহি শুনল,
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গঙাওল,
ন বুঝল কৈসন কেল;
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল,
তইও হিয়া জুড়ন ন গেল॥

—(বিদ্যাপতি।)

প্রাকৃত সুখে 'তৃপ্তি' নামক বিতৃষ্ণা এবং অপ্রাকৃত বা চিন্ময় সুখে 'অতৃপ্তি' নামক চিরতৃষ্ণা,— জড় ও চিদ্ বিষয়সুখের পরস্পর ইহাই বিপরীত লক্ষণ।

প্রাকৃত জগতের কোন প্রিয়জনের 'নামে' যে সুখ পাওয়া যায় তদপেক্ষা 'দর্শনে' অধিক সুখ এবং তাহা হইতেও অধিক সুখ তাহার স্পর্শনে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। প্রাকৃত সুখ বা সুখাভাস ক্ষয়শীল বলিয়া

উহার গতি, ভূমার দিকে— অধিকের দিকে নহে,— প্রতিক্ষণ অল্পের দিকে, অর্থাৎ নিম্নাভিমুখী। এইজন্য এখানে প্রিয়জনের নামে যে সুখ, উহা সেই সীমা পর্যন্তই অবরুদ্ধ থাকিয়া পরক্ষণ হইতে নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে অর্থাৎ 'নামে' যে সুখ হয়, উহা নাম হইতে যে পরিমাণ হওয়া সম্ভব, সেই পরিমিতই হইয়া,— ক্রমে অল্পের দিকে নামিতে থাকে, কিন্তু অধিকের দিকে বাড়িয়া উঠে না। তাই 'নাম' হইতে অধিক যে 'দর্শন-সুখ'— সে সুখ নামে পাওয়া যায় না। সেইরূপ দর্শনে যে পরিমিত সুখ হওয়া সম্ভব, সেই পরিমিত হইয়াই ক্রমশঃ তদপেক্ষা অল্প হইতে থাকে, কিন্তু তাহা হইতে অধিক যে 'স্পর্শ-সুখ'— সে সুখ দর্শনে হয় না। এইরূপ স্পর্শ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

চিন্ময় বিষয়-সুখ— কিন্তু তৎ-বিপরীত বলিয়া, উহা আধিক্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও প্রতিক্ষণ বর্ধনশীল; অর্থাৎ অচিন্ত্যরূপে উহার গতি প্রতিক্ষণ ঊর্ধ্ব-গামিনী— অনন্তেরই দিকে। এইজন্য সেখানে প্রিয়জনের নামের সুখ— নামের সীমাতেই আবদ্ধ নহে; উহার বর্ধনশীলতা বা ঊর্ধ্বগতি নিবন্ধন, সেখানে নামেই দর্শন-সুখ এবং দর্শনেই স্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার স্পর্শে যে কিরূপ সুখ হয়, তাহার উপর বলিবার বিষয় কিছু না থাকায়, মহানুভবগণ সে বিষয়ে আর অধিক বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। চিদানন্দময় সকল বস্তুতেই একই ধর্ম— একই প্রকার লক্ষণ। তাই চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের নাম, দর্শন ও স্পর্শসুখের কিঞ্চিৎ অনুভূতির কথা মহাভাগবতগণের প্রেমমাখা লেখনীমুখে উক্ত লক্ষণেরই প্রকাশ হইতে দেখা যায়; যথা,—

"যা কর নাম দরশ-সুখ সম্পদ,
দরশ পরশ রসপূর।
পরশে যে সুখ তার কেমনে কহিব গো,—
সে যে বাণী অনুভব দূর॥"

—(শ্রীমন্নরহরিদাস ঠাকুর।)

অর্থাৎ যাঁহার নামই দর্শনসুখ সম্পদ স্বরূপ, দর্শনই স্পর্শন সুখে পরিপূরিত,— সেই তাঁহার স্পর্শে যে কি সুখ, তাহা আর কি করিয়া বলিব ?— সে যে ভাষার সীমায় নাগাল পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের ললিত শ্রীঅঙ্গমাধুরী দর্শন করিয়া, ঠিক উক্ত প্রকার অনুভূতির কথাই শ্রীরাধা নিজ সখিগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

"লখিএ ললিত তাসু গাতে,—
মনে ভেল পরশিয়ে সরসিজ পাতে।"

— (বিদ্যাপতি।)

অর্থাৎ আমি যখন তাসু— তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ললিত গাতে— শ্রীঅঙ্গে লখিএ— লক্ষ্য করিলাম, অর্থাৎ দর্শন করিলাম, তখন মনে ভেল — মনে হইল, সরসিজ পাতে— কমল পাতা, পরশিয়ে— স্পর্শ করিতেছি।

এখানেও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই, স্নিগ্ধ-শীতল পদ্মপত্রের আলিঙ্গন তুল্য স্পর্শ-সুখের অনুভূতির কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ রহিয়াছে।

মোটকথা, স্থিরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে সকল দিক দিয়াই বুঝা যায় এই যে, যে সুখ সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা-বর্জিত ও অনুকূলতাযুক্ত তাহাই চিদানন্দ জগতের সুখ। আর সকল প্রকারে অনুকূলতা বর্জিত ও প্রতিকূলতাযুক্ত যাহা, তাহাই হইতেছে এই জড় জগতের প্রাকৃত বিষয়-সুখ, যাহার প্রকৃষ্ট নাম— 'সুখাভাস'। ইহাই চিদ্ ও জড়ের পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণ।

সবিশেষ চিদানন্দ জগৎ যে কি প্রকার সুখময় স্থান,— বিশেষতঃ উহার সমষ্টি কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণলোক বা শ্রীবৃন্দাবনের আনন্দ সম্পদ যে কি প্রকার, তাহা জীব-জগতের উপলব্ধির জন্য অন্য উপায় না পাইয়া, প্রাকৃত জগতের যে বিষয়ে যাহা সর্বোত্তম বস্তু বলিয়া প্রসিদ্ধ, — তাহারই দৃষ্টান্ত দ্বারা শাস্ত্রসকল উহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র

প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নেত্রাদির সৌন্দর্য্য, প্রাকৃত সুধাকর ও উৎপলাদি হইতে কোটিগুণ অধিক হইলেও, প্রাকৃত জগতে উহার উপর অন্য সুন্দর বস্তু না থাকায়, শাস্ত্রসকল নিরুপায় হইয়াই যেমন 'শ্রীমুখচন্দ্র' 'নয়নোৎপল' 'চরণকমল' প্রভৃতি প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরাশির কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করিয়াছেন, তেমনি সেই স্বয়ং-ভগবল্লোক বা আনন্দ-চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন-ধামের মহাসুখ-সম্পদের সন্ধান কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদিগকে বিদিত করাইবার জন্য, কতিপয় সর্বোত্তম প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্ত দ্বারা তথাকার সর্বাপেক্ষা অনুত্তম বস্তুর সহিত তুলনা করিলেও, বুঝিতে হইবে ইহার উপর দৃষ্টান্ত দিবার মত অন্য শ্রেষ্ঠতর বস্তু জড়-জগতে না থাকায়, নিরুপায় হইয়াই শাস্ত্রসকলকে এই প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতে হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে অপ্রাকৃত আনন্দ-চিন্ময় বৃন্দাবনের সুখ-সম্পদের পরিমাণ সেই সকল প্রাকৃত সম্পদ হইতে কোটিগুণ অধিক বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীবৃন্দারণ্যের সুখৈশ্বর্যের বিষয় শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয় সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

তাৎপর্য,— লৌকিক জগতের নায়ক নায়িকা বিষয়ক সুখকেই সাধারণতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহার সহিত তুলনা করিয়াই বলিতেছেন,— সেই প্রাকৃত কান্তা ও কান্ত উভয়ে মরণধর্মী; জরা, ব্যাধি, দুঃখ, ভয়, ভাবনাদি ক্লিষ্ট এবং শৃগাল-কুক্কুরাদি ভক্ষ্য— রক্ত-মাস-অস্থি-মজ্জাদিময় জড় শরীর বিশিষ্ট; সুতরাং এরূপ বস্তুদ্বয়ের বিলাসাদি-জনিত আনন্দ আর কতদূর হইতে পারে? কিন্তু সেই চিদানন্দ-জগতের কান্তাগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী— প্রেমঘনমূর্তি;

আর কান্ত হইতেছেন সচ্চিদানন্দ মূর্তি— নিত্য ও চির নূতন— স্বয়ং পরম পুরুষ। সুতরাং সেখানকার সুখ-বিলাসাদি বিষয়ে আর কি বলা যাইবে। শ্রীবৃন্দাবনের সুখ-সম্পদের সহিত মনুষ্য-লোকের সুখ-সম্পদের আর কি-ই বা তুলনা দিব ?— দেবলোকের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ — সেই কল্পতরু হইতেছে শ্রীবৃন্দাবনের বন-জঙ্গলের সাধারণ বৃক্ষ; সুতরাং সেখানকার যত্নে রোপিত উদ্যানাদির তরু-লতা সকল যে কি প্রকার এবং তদুপরি সেখানকার কল্পতরু যে আবার কিরূপ হইতে পারে,— তাহা আর কোন দৃষ্টান্ত দিয়া প্রকাশ করা যাইবে ? যে চিন্তামণি দেবলোকের সর্বোত্তম রত্ন, শ্রীবৃন্দাবনের সাধারণ মৃত্তিকাই সেই চিন্তামণি; সুতরাং তথাকার চিন্ময় মণিরত্নাদি যে কিরূপ বস্তু এবং সর্বোপরি তথাকার চিন্তামণি যে আবার কি মহাসম্পদ, তাহা কোন্ দৃষ্টান্তে বুঝান যাইবে ? যে অমৃত দেবলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়, সেই অমৃতই যখন শ্রীবৃন্দাবনে পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য বারির ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন সেখানকার পানীয় জল যে কিরূপ উপাদেয় এবং অমৃত যে আবার কিরূপ বস্তু, তাহা বুঝাইয়া দিবার কোন উপায় নাই। দেবলোকের সঙ্গীত হইতেও সুমধুর যাহাদিগের সাধারণ বাণী, — নৃত্য হইতেও মনোরম যাহাদিগের সাধারণ গতি,— সেই শ্রীবৃন্দাবন — বিলাসিনীদিগের গীত ও নৃত্য যে কি পরিমিত মাধুর্য-মণ্ডিত তাহা আর কি দিয়া বুঝান যাইবে। চিন্ময় বংশীই সেখানে মনোজ্ঞা প্রিয় সখীর মতই অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল এবং সকলই চিদানন্দময়; সুতরাং সমস্তই পরমানন্দ পরম আস্বাদ্য বস্তু। মহৎগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনুভূতি হইতেও বুঝা যায়, তাঁহারাও পূর্বোক্ত একই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অচিন্ত্য— অবর্ণনীয় চিদানন্দ জগতের,— শ্রীকৃষ্ণধামের আনন্দ সিন্ধুর আভাস মাত্র প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহানুভব শ্রীল বিল্বমঙ্গল কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের সুখ-সম্পদ বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণ মঙ্গলানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরানাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১৭৩)

তাৎপর্য,— যেখানে অঙ্গনাগণ চিন্তামণিকেই চরণভূষণের অধিক সম্পদ মনে করেন না, কল্পতরুকে মাল্যাদি কুসুমভূষণের উপযোগী পুষ্পবৃক্ষের অধিক কিছু বিবেচনা করেন না, কামধেনু হইতে যেখানে দুগ্ধের অধিক আর কিছুই গৃহীত হয় না,— সেই শ্রীবৃন্দবনের বিভূতি যে সিন্ধু-প্রায় কিরূপ অসীম সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন,— অহো! তাহা আর কি প্রকারে বলিব।

উক্ত বর্ণনাই পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় আরও সুমধুর সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; যথা,—

"পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি, রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসীর চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন॥
সহজ লোকের কথা, যাহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহা মূর্তিমান॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ॥"

বাস্তবিক পক্ষে চিদানন্দ রাজ্যের 'রাজপাট' শ্রীবৃন্দা-বিপিনের সুখ-

সম্পদের যথার্থ পরিচয় প্রদান করা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। এতাদৃশ শ্রীবৃন্দাবনধাম অফুরন্ত— অনন্ত আনন্দ সিন্ধুস্বরূপ হইলেও, আবার সেই বৃন্দাবন-সুখসিন্ধুর সুধাকর স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণেই উহা নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া, চিদানন্দ জগতের সকল সুখবস্তু হইতে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা-সুখের প্রতিই সেখানে অধিক আকর্ষণ দেখা যায়; সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে কেবল শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের সেবা-সুখাভিলাষ ভিন্ন অপর কোন সুখের প্রতি সেখানে কাহারও কোন বাসনা বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। জড় জগতের বিষয়-সুখ নামক 'সুখাভাস' যাহা, তাহা বাঞ্ছা করিয়া পাইতে হয়। উহা পরিচ্ছিন্ন বা 'অল্প' বলিয়া কামনা ও কলহাদি দ্বারা উহার অধিকার লাভ করিতে হয়। কিন্তু চিদানন্দ জগতের বিষয়-সুখ তৎ-বিরুদ্ধ লক্ষণ বলিয়া, উহা অপরিচ্ছিন্ন বা অধিক অনন্ত। না-চাওয়া হইতে এই সুখ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, তাই উহার জন্য কোন বাসনা কিম্বা অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন হয় না। প্রকৃষ্ট পূর্ণানন্দের ইহাই প্রধান লক্ষণ। কেবল কৃষ্ণসেবা-সুখ ভিন্ন স্ব-সুখের অনুসন্ধান সেখানে না থাকিলেও— "সুখ বাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ"। অর্থাৎ বাঞ্ছা করিয়া পাওয়া প্রাকৃত সুখ হইতে, এই না-চাহিয়া পাওয়া চিন্ময় সুখ, কোটিগুণ অধিক আনন্দদায়ক হইলেও, কৃষ্ণসেবা-সুখের আকর্ষণ তদপেক্ষা অধিক হওয়ায়, স্ব-সুখানুসন্ধান-শূন্য কৃষ্ণ-সেবক-সেবিকাগণ সেখানে কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য লইয়াই মগ্ন থাকেন; সুতরাং সেই সেবা-সুখার্ণবে নিমজ্জিত ও সম্পূর্ণ আত্মহারা তাঁহাদিগগের পক্ষে নিজের বলিয়া আর কিছু দেখিবার— শুনিবার— জানিবার অবশেষ থাকে না। ইহাই আনন্দের চরম ও পরম অবস্থা— যাহার অপর নাম "প্রেমানন্দ"।

আরও বিশেষ কথা এই যে, কেবলমাত্র 'কারণের' সুখ পোষণ দ্বারাই উহার আনুষঙ্গিক ফলে 'কার্যের' সুখ বিধানও প্রকৃষ্টরূপে

সুসিদ্ধ হইয়া যায়; অথচ তাহার জন্য কার্যভাবের পক্ষে কোন স্বতন্ত্র ও পৃথক সুখবাঞ্ছা সংরক্ষণের আবশ্যকতাই থাকে না। কিন্তু কারণের সুখ-পোষণ চেষ্টা না করিয়া, যেখানে কার্যভাবের পক্ষে স্বতন্ত্ররূপে স্বসুখ-পোষণ-স্পৃহা— আত্মসুখ-তাৎপর্য বিদ্যমান দেখা যায়, সেখানে কখন পূর্ণ ও অনাবিল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আনন্দ-বিজ্ঞানে ইহাই সূক্ষ্মতম ও সর্বোচ্চ সংবাদ। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই, আত্মসুখ-তৎপর্যময় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হইতে পরমাত্মসুখ-তাৎপর্যময় প্রেমকে পঞ্চম স্থানীয় অর্থাৎ "পঞ্চম-পুরুষার্থ" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মভাবের পূর্ণ অবস্থা। অপর যে-কোন পুরুষার্থে আত্মসুখানুসন্ধান মুখ্যভাবে বিদ্যমান থাকায়, বাঞ্ছা করিয়াও পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপই হইয়া থাকে; যেহেতু যে-পর্যন্ত নিজেকে দেখিয়া, নিজসুখ চাওয়া রূপ 'কৈতব' বা সর্বোচ্চ আনন্দ বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকিবে, সে-পর্যন্ত প্রকৃষ্ট সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না; আর যে অবস্থায় নিজ সুখের কথার সহিত নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, কেবল সর্বকারণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখের কথাই স্মরণ হইবে,— আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার স্থলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই যখন জয়যুক্ত হইবে,— তখনই হইবে পরমানন্দ বা পূর্ণ সুখের সাহজিক উদয়;— যাহার অন্য নাম 'প্রেমসুখ'।

কার্যভাবের সুখ-পোষণ প্রয়াস না করিয়া কারণের সুখপোষণ করিলেই যে, কার্যভাবের পক্ষে পৃথকরূপে আর স্ব-সুখবাঞ্ছাসংরক্ষণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, এবং এই প্রকারে আত্মসুখ-সন্ধান-শূন্যতাই যে যথার্থ সুখ-প্রাপ্তির লক্ষণ, শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা আনন্দের সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্বটিই প্রকাশ করা হইয়াছে যথা,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ, যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

— (শ্রীভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, যেমন জঠরে আহার্য সমর্পনরূপ প্রাণবায়ুর তর্পণেই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হইলেই সকল আত্মা সম্যকরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব যেখানে সুখ-সন্ধানের পরিবর্তে সুখ-বিস্মরণ এবং আত্মসুখ-তাৎপর্য স্থলে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, জানিতে হইবে, প্রকৃষ্ট সুখ-সম্পদ সেখানেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এই অনাবিল পূর্ণ সুখই 'প্রেম' নামে পরিকীর্তিত হয়েন।

চিদানন্দ জগৎ-মালার মধ্যমণিস্বরূপ শ্রীব্রজভূমেই প্রেমভাবের সর্বোৎকর্ষতা বিষয়ে সর্বশাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে গোপরামাগণেই বিশেষভাবে তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাতেই সেই প্রেমের অবধির কথাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়। কৃষ্ণসেবার অভিলাষে সম্পূর্ণ আত্মহারা— পাগলপারা সেই অনাবিল প্রেম লক্ষণের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে ;—

দেহত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত (চিন্ময় ক্ষিত্যাদি) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি ; যথা,—

"পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং,
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥"

— (উজ্জ্বলনীলমণি— ১৪।১৮৯)

তাৎপর্য, [শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণ যদি

বৃন্দাবনে আর না-ই আগমন করেন, তবে নিশ্চয় আমি আর তাঁহাকে পাইব না, এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতি কষ্টে আর রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না।]— আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি অবনত মস্তকে বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি— যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দীর্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গণাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া, সম্যক প্রকারে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হয়।

নিজত্বের অণু পরমাণু পর্যন্ত কৃষ্ণসেবায়— কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যে এমনি করিয়া বিলাইয়া দিবার যে অভিলাষ,— ইহাই পরিপূর্ণ 'প্রেম' বা পূর্ণ সুখোদয় লক্ষণ।

চিদানন্দ রাজ্যে— সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা সুখোদয়ের নিকট, অপর যেখানে যে কিছু আনন্দ থাকুক— সমস্তই নিষ্প্রভ ও তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দও যে প্রেমসুখ-সিন্ধুর তুলনায় গোষ্পদ-তুল্য মনে হয়, তাহার সহিত প্রাকৃত বিষয়সুখের কি তুলনা দিব! এ বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ; যথা,—

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
> ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
> ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ॥
>
> — (শ্রীভাঃ— ১১।১৪।১৪)

অর্থাৎ— আমাতে অর্পিত-চিত্ত ভক্ত, আমার সেবাসুখ ভিন্ন অন্য

ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব, কিম্বা পাতালের আধিপত্য অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্বাণ মুক্তি, কিছুই পাইতে ইচ্ছা করেন না।

অধিক কথা কি ? শ্রীভগবান ইহাও বলিয়াছেন,—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

— (শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ— আমার সেবাসুখে নিমগ্ন সেই ভক্তদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একত্র বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সামীপ্য (আমার সান্নিধ্য), সারূপ্য (আমার সমরূপতা), এবং একত্ব (সাযুজ্য) দিতে চাহিলেও, তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন এই সকলের কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না।

প্রেমানন্দের অসমোর্দ্ধ মহিমা বিষয়ে আর কি বলিব,— প্রেম-সেবা-সুখের এতই পরাক্রম যে, অখিল-রসামৃত-মূর্তি সর্বানন্দধাম ও সর্বসেব্য হইয়াও সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ সেবাসুখ পাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। তাই সেবাসুখের 'বিষয়' হইয়াও, আবার যে সুখের 'আশ্রয়'হইবার জন্য প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমভাবের আশ্রয় লইয়া, — সেই সর্বসেব্যকেও সেবকভাবের নিজ সেবাসুখ আস্বাদন করিবার জন্য যখন ব্যাকুলিত হইতে হয়, তখন সেই প্রেমানন্দের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যে ইহার পর আর কোন বক্তব্যের অবশেষ থাকে না, এ-কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। প্রেমের এই নিগূঢ় কথা,— প্রেম-সেবা পাইয়া সুখী শ্রীভগবানের, আবার নিজেকে প্রেমসেবা করিয়া সুখী হইবার এই লালসার সংবাদ— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমানন্দ অবলোকনে স্বয়ং শ্রীভগবানেরও মনে হয়,—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমাকে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি শিষ্য—নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আনন্দ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥"
"সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদন।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদন॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকী॥"

সেই প্রেমসেবা-সুখ-প্রলুব্ধ— শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই, শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্ররূপে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরের সেই নিত্য অভিলাষ নিত্যই পূর্ণ করিয়া থাকেন; যথা—

"সেই রাধিকার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ— সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।

আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

— ইত্যাদি।

প্রেমাবতারী অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণানুগত্য ভিন্ন ব্রজের সেই সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেমরস প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং প্রেমের অনুদয়কাল পর্যন্ত চিদানন্দ জাগতিক বস্তু মাত্রেই অপ্রকাশ থাকে।

জড়েন্দ্রিয় সমক্ষে জড় বস্তু ও চিদেন্দ্রিয়ে চিন্ময় বস্তু মাত্রই গ্রাহ্য হওয়া স্বাভাবিক। যেমন নেত্রে লোহিত বর্ণের চশমা ধারণ কালে, তৎসম্মুখস্থ রক্তজবা ও শ্বেতজবা উভয়ই লোহিতবর্ণে দৃষ্ট হয়, তেমনি এই জড় জগতের মধ্যে চিদানন্দ বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, জড়েন্দ্রিয়াদির সমক্ষে জড় ও চিদ্ উভয় বস্তুই এক জড় বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ জড় ও চিদ্ উভয় বস্তুই এক জড় বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ চিদানন্দ বস্তু প্রত্যক্ষ হইলেও, জড় বস্তু হইতে উহার কোন পার্থক্যই বুঝা যায় না। আবার শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ও সাধুগণাচরিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল পরিশুদ্ধ হইলে তখন সেই প্রেমভক্তি-বিভাবিত ইন্দ্রিয় সমক্ষে চিন্ময় বস্তু যথাযথরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥"

— (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৬)

অর্থাৎ,— আমার পবিত্র কথাসকল শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত যেমন পরিমার্জিত হইতে থাকে,— অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করে, উহাও সেইরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন করিয়া থাকে।

চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত চিদানন্দ বস্তুও যে

মায়িক বা জড়ের ন্যায় বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতেও ইহা আমরা সুস্পষ্টরূপেই জানিতে পারি। যথা,—

"চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা নিত্য-লীলারাস॥"

তথাপি, চিন্ময় বস্তুর সত্তা এতই সত্য যে, বিমূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তকে তমো ও রজোগুণ হইতে মুক্ত করিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে স্থাপন করিতে পারিলে অর্থাৎ অন্ততঃ পক্ষে যদি কিছুকালের জন্যও অপেক্ষা অবলম্বন পূর্বক বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তকে চিদ্‌ভাবের নিকটবর্তী করিতেও পারা যায়, তাহা হইলেও এই জড় জগতের অভ্যন্তর হইতেই জড়াতিরিক্ত জীবাত্মা ও সর্বাত্মারূপে চৈতন্যের সত্তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; যাহার আবিষ্কারে তৎকারণ ও সর্বকারণ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দরসঘন শ্রীভগবান ও তদীয় চিদানন্দ জগতের সুস্পষ্ট সন্ধান মিলিতে পারে।

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥"

— (শ্রীভাঃ ২।২।৩৫)

প্রথম প্রকাশঃ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-ই-শ্রীশ্রীসোনারগৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা হইতে ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত।
আষাঢ়, ১৩৪৬ হইতে আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল।

আশার আলোক

ত্রিতাপের তীব্র তুষানলে অহরহ পরিদগ্ধ জীব, নিরন্তর তৎ-প্রতিকারে সচেষ্ট; এই প্রতিকার চেষ্টার ফলস্বরূপ কর্মজগতের সমুদ্ভব,— একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয় পথের পথিকগণই এই একই উদ্দেশ্য বুকে করিয়া, এই সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ পথদ্বয় অবলম্বন পূর্বক নিরন্তর প্রধাবিত হইতেছে। মরীচিকা-গ্রস্ত পথহারা পথিকের মত পরিছিন্ন, ক্ষণভঙ্গুর, মায়াময় প্রাকৃত জগৎ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া একদল বলিতেছে,— ধর! ধর! আশার অসীম গগনে মন-প্রাণ ভাসাইয়া দিয়া উৎসাহের সহস্র তরঙ্গ তুলিয়া, প্রাণপণে ধর! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ— স্তূপের পর স্তূপ আহরণ করিয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান কর, শান্তি অবশ্যই মিলিবে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুনিচয় নিরন্তর সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভাণ্ডারের প্রসার যে যত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম,— সংসার- সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়মাল্যের অধিকার তাহারই।

আর অপর পক্ষ, এই দলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ— নিবৃত্তিপথের মুষ্টিমেয় পান্থগণ এই বিশাল জনসঙ্ঘের অদম্য বিষয়াসক্তি পরিদর্শনে, করুণ-হৃদয়া জননী যেমন মধুচক্র আহরণোদ্যত জ্ঞানহীন তনয়কে সদ্য দংশনোন্মুখ মধুপকুলের তীব্র হলাহল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতিশয় ত্রস্ত ও ব্যাকুল প্রাণে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হয়েন, সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে, উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,— ছাড়! ছাড়! অমৃতবিন্দুর প্রলোভনে গরল-সিন্ধুমাঝে ডুবিতে যাইও না! ত্রিতাপের তীব্র দহনে পরিদগ্ধ ইন্দ্রিয়সকল, প্রাকৃত বিষয়ের উত্তপ্ত সলিল-সিঞ্চনে সুশীতল করিবার অযথা প্রয়াস ছাড়িয়া দাও। তোমার আকাশ-

ব্যাপিনী আশা ও প্রাণভরা উৎসাহের গতি যে পথে প্রধাবিত, সে পথ ছাড়িয়া বর্ত্মান্তর গ্রহণ কর; উত্তপ্ত সংসার-মরুপথের হে পরিশ্রান্ত পথিক! তোমার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অতীতের কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া হৃদয়ের যে বহ্নি নির্বাপিত করিতে তুমি অহর্নিশ অবিচ্ছেদে কতই-না চেষ্টা করিয়াছ, তোমার সেই ত্রিতাপ জ্বালার আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় এই পথে। ত্রিবিধ দুঃখের মধুপ দংশনের নিবৃত্তিই যে কেবল এই পথের চরম লক্ষ্য, তাহা নহে,— মায়াগন্ধ-পরিশূন্য অপ্রাকৃত আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে এই পথ তরঙ্গায়িত। সে আনন্দ অফুরন্ত, অনন্ত, চিরনূতন। সে আনন্দ ভাব ও ভাষার ক্ষুদ্র সীমায় সংবদ্ধ নহে, বাক্য ও মনের অগোচর— কেবল অনুভববেদ্য। জীবের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার অবসান এই স্থানে।

একটু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরাও বুঝিতে পারি, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত সুখ যাহা, তাহা বাস্তবিকই সুখপদবাচ্য হইতে পারে না। দুঃখের সাময়িক প্রতিকারকেই অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমরা সুখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, ভূমানন্দের সংবাদ সাধারণতঃ আমাদিগের নিকট অবিজ্ঞাত বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের সাময়িক প্রতিকারকেই আনন্দের চরম সীমা মনে করিয়া থাকি। পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনাদি দ্বারা রোগযন্ত্রণা হইতে পুনঃ পুনঃ অব্যাহতি লাভ করাকে যেমন স্বাস্থ্য বা সুখ নামে অভিহিত করা যায় না, সেইরূপ উপাদেয় অন্ন, সুশীতল পানীয়, সুকোমল শয্যা, সুরম্য সৌধ-যানাদি ভোগ্য বস্তুরূপ ঔষধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা, পিপাসা, তন্দ্রা, শীতাতপাদির প্রতিকার চেষ্টারূপ সহস্র বাসনা-ব্যাধির ক্ষণিক নিবৃত্তিকে সুখ বা আনন্দ নামে অভিহিত করা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, একথা কে না স্বীকার করিবেন? দেহাতিরিক্ত আত্মার সংস্কার নাই বলিয়াই আমরা দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করি ও নিরন্তর তৎপ্রতিকারে

সচেষ্ট হই। সেই প্রাণপাত চেষ্টায় যাহা আহরণ করি, সেই প্রাকৃত বিষয়সমূহের দ্বারা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির সাময়িক পরিতোষ হইতে পারে। কিন্তু আমি— আমি সেই পিপাসিত, সেই তাপিত, সেই মর্মাহত! দেহেন্দ্রিয়াদির পরিতোষে আমার সুখ নাই; কারণ আমি তদতিরিক্ত, নির্মল, বিশুদ্ধ, ত্রিগুণাতীত, চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা। এই আত্মার আত্মা যিনি, সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের চির সহচর ইহ- পরকালের নিত্য-সখার সন্দর্শন লাভ করিতে ও তদীয় চরণতলে যতদিন না আমাকে বিকাইয়া দিতে পারি, ততদিন আমার বিরহ-বিধুর চিরতাপিত আত্মার সকরুণ ক্রন্দনের বিরাম সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আত্মার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, তাহাকেই "শ্রেয়" বলা যায়, আর দেহেন্দ্রিয়াদির পক্ষে যাহা সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা "প্রেয়" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মী বলিয়া, এক সঙ্গে এই উভয়কে লাভ করা যায় না। প্রেয় দ্বারা আত্মার কোন মঙ্গল সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যিনি নিজের যথার্থ মঙ্গল কামনা করেন, তিনি প্রেয়ের পরিবর্তে অবশ্য শ্রেয়কেই লাভ করিবেন। তাই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে
উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

— (কাঠকে, ১।২।১-২)

যম, নচিকেতাকে ধন রত্ন সুন্দরী প্রভৃতি আপাতরমণীয় কাম্য বস্তু-সমূহে প্রলোভন দেখাইলেও যখন তিনি তাহাদিগের অনিত্যতা, অসারতা ও আত্মার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া, তৎসমুদয় অত্যন্ত হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা পূর্বক একমাত্র আত্মার পক্ষে মঙ্গলজনক যাহা তাহাই জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন যম তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, আত্মার পক্ষে সুসংবাদস্বরূপ যাহা পরমতত্ত্ব তাহাই তাহাকে উপদেশ করিলেন। যম বলিলেন,— হে নচিকেতা, শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় (সুখকর) উভয়ে পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়কে যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে; আর, যে ব্যক্তি প্রেয়কে আশ্রয় করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় সম্যক পর্যালোচনা করিয়া, ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। আর, হীনবুদ্ধি যাহারা, তাহারা 'যোগক্ষেম' (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) কামনা করিয়া প্রেয়কেই গ্রহণ করে। ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি, প্রাকৃত সুখ বা সাংসারিক ভোগ-বিলাস আমাদিগের দেহেন্দ্রিয়সকলের দুঃখ-যন্ত্রণাদির সাময়িক প্রতিকারে সক্ষম হইলেও, আত্মার পক্ষে কোনও কার্যকর হয় না। জীবাত্মা যাহা প্রার্থনা করে, যাহা পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহা এই পরিচ্ছিন্ন, ক্ষণভঙ্গুর, ভৌতিক জগতের বস্তু নহে। সুতরাং 'প্রেয়কে' সম্পূর্ণ পরিহার পূর্বক 'শ্রেয়ের' শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য। একমাত্র শ্রেয়ঃ অবলম্বনে সেই ভূমানন্দময় পুরুষের সুশীতল চরণতলে উপনীত হইয়া চিরশান্তি লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার ইচ্ছা হয় না, যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিবার

ইচ্ছা হয় না, যাঁহাকে দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, আত্মার সেই চিরাভীষ্ট, চিরবাঞ্ছিত, চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ প্রেয় দ্বারা কোন কালে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রাকৃত বৈষয়িক সুখ অমৃতাভাসে সমুদ্ভূত ও অনন্ত গরলে পর্যবসিত। বর্তমানে ক্ষণসুখকর হইলেও উহা ভয়াবহ পরিণাম বা ভবিষ্যদ্‌বিশিষ্ট। আর ভূমানন্দ-সম্ভোগরূপ পরমানন্দ যাহা, দুঃখাভাস হইতে তাহার উৎপত্তি, অমৃতের অনন্ত জলধিগর্ভে তাহার অবসান। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা এই সংবাদ বিদিত হইলেও আপাত-রমণীয় বস্তু যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আনন্দ- সলিলে নিমজ্জিত হইতে প্রস্তুত নহি; সংসারাবদ্ধ জীবের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম। তাই যে ভবিষ্যৎ প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণে বর্তমানে পরিণত হইয়া, অতীতের অসীম গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, সেই সম্মুখস্থ অনন্ত অসীম ভবিষ্যৎ-কে আমরা উপেক্ষার চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকি। যে ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের অস্তিত্ব, আমরা তৎপ্রতি আস্থাবান না হইয়া, বর্তমানের ক্ষণস্থায়ী সুখলব পরিত্যাগপূর্বক ভবিষ্যদ্‌গর্ভে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন সুখের সংবাদ নিহিত থাকিলেও তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধনা যাহা, তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করি না। শ্রেয়রূপ অমৃতের পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে সাময়িক দুঃখ বা কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, পরমার্থ পথের পথিক যিনি, তাঁহার পক্ষে সেই কঠোরতা অতি সুখকর ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও— বহির্মুখ—সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে সে-পথ দাবদগ্ধ অপার মরুভূমির ন্যায় অতীব ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইজন্য প্রাকৃত বিষয়-সুখ-ভোগের দ্বারা পূর্ণকাম হইবার ভ্রান্ত সাধনায় শতবার পরাজিত হইলেও, সেই মরীচিকাময় প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, নিবৃত্তির চিরশান্তিময় পথ অবলম্বন করিতে আমরা কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। শ্রেয় ও প্রেয় বা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি,—এই পথদ্বয়ের পরস্পর

বিভিন্নতা নির্দেশ করিবার জন্য শ্রীভগবান স্বয়ংই অর্জুনকে বলিয়াছেন,

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্॥
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

— (শ্রীগীতা ১৮।৩৭-৩৮)

অর্থাৎ যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতস্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে তাহাই সাত্ত্বিক সুখ,— যাহা হইতে নির্গুণ সুখের হেতুভূত "শ্রেয়ঃ" লাভ হইয়া থাকে। আর যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগবশতঃ অগ্রে অমৃততুল্য ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহাই রাজস-সুখ বা "প্রেয়" নামে অভিহিত। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, ত্রিতাপ-পরিতপ্ত জীবসকল যে কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ শ্রীভগবানের সুশীতল চরণচ্ছায়া লাভে চিরবঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নহে; সেই শান্তিময় পথে অগ্রসর হইবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উপাদেয়তা অনুভব করিলেও তজ্জন্য যে আপাতকঠোরতা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তাহা স্মরণ করিয়া সে-পথে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি ও সাহস তন্মুহূর্তেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাধু ও শাস্ত্র অবিরতভাবে আমাদিগকে সেই শ্রেয়-পথ অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিলেও আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, ক্ষণ-সুখকর বিষয়-সুখেই মগ্ন থাকিতে সচেষ্ট হই ও তাহার সাধনায় জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত করি। কিন্তু এই ঘোর সংসার-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই সদানন্দময়ের সর্ব-দুঃখ-প্রশমন শমন-ভয়-নিবারণ, শান্তিময় পাদপদ্ম লাভ করিবার যদি কোনও সহজ ও সুগম পথ থাকিত, যাহা কঠোরতার কঠিন কঙ্করে সমাবৃত নহে,— তাহা হইলে কে বলিতে পারে এই মরজগতের বিশাল

জনসঙ্ঘের প্রবৃত্তি-স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত না হইত? সাধনার কঠোরতাই যদি ত্রিতাপ-জ্বালাময় সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ হয়, তবে আমরা হতাশার মর্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার পূর্বে আর একবার অন্বেষণ করিয়া দেখিব, এমন কোনও সুগম ও সরল পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে কি না, যে-পথ কঠোরতার তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাচ্ছন্ন নহে— কোমলতার কুসুম-স্তবকে আবৃত। কোনও একটি অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যে সামান্য পরিমিত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষাও অল্প সাধনায় এই পথে অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না? যদি সন্ধান মিলে, যদি সেরূপ সাধনার সংবাদ পাই, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে বাধ্য,—তাহাই—তাহাই সমগ্র জীব জগতের আশার-বাণী! তাহাই সমগ্র মানব জাতির পক্ষে "সাধনার সুসংবাদ!" অভিলষিত পথের সন্ধানে এইবার আমরা প্রবৃত্ত হইব। শাস্ত্রে আছে,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

—(শ্রীভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নির্বিশেষ সত্ত্বারূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন; আর সর্বশক্তিসমন্বিত ষড়ৈশ্বর্যশালী সচ্চিদানন্দঘন-মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকেই শ্রীভগবদ্-রূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি যে নামেই অভিহিত বা যিনি যে ভাবেই দর্শন করুন না কেন, কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, এই একই "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের" অন্বেষণ ও আশ্রয় ব্যতীত সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার গত্যন্তর নাই।

জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী— এই ত্রিবিধ সাধকই যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সাধন-পথ অবলম্বনে যখন সফলকাম হইতে পারেন, তখন অবশ্যই স্বীকার্য যে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি— এই ত্রিবিধ পথই জীবের শ্রেয়ার্থে সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। অতএব সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে হইলে, তাহার সাধন-পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সাধন-পথ প্রধানতঃ তিনটি; যথা,— (১) জ্ঞানমার্গ, (২) যোগমার্গ, (৩) ভক্তিমার্গ। অতঃপর আমরা ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে জ্ঞান ও যোগমার্গের প্রথম সোপান যাহা, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিব, ক্ষণ-সুখমগ্ন, বিষয়াসক্ত, দুর্বল জীব আমরা— আমাদিগের নিকট এই পথ, দুর্গমতার পরিবর্তে সহজ ও সুগম বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিনা ?

জ্ঞানের অনুশীলন জ্ঞানযোগীর অবশ্য কর্তব্য। বেদান্তই পরা বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আকরগ্রন্থ; কেবল বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে,— প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী সাধক, প্রথমতঃ গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে নিদিধ্যাসন দ্বারা যথাসময়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইবেন। কেবল ইহাই নহে, বেদান্ত শ্রবণের পূর্বে গুরুর নিকট সেই বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম কি বস্তু, কেবল এই প্রথম প্রশ্নটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিতে হইলেও তৎপূর্বে যে সকল সাধনায় অবশ্য সিদ্ধ হইতে হইবে, বেদান্তের প্রথম সূত্রটি মাত্র আলোচনা করিলেই তাহা কিঞ্চিৎ আমাদিগের বোধগম্য হইতে পারে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥"—এইটি বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র। (অথ + অতঃ + ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।) অর্থাৎ ক্রিয়াফল (স্বর্গাদি) অনিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিত্য (মোক্ষ)। এই হেতু অধিকারী হইবার পর ব্রহ্ম কি জানিতে ইচ্ছা করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অধিকারী না হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না।

অধিকারী লক্ষণ কিরূপ তাহাই বলিতেছেন,— "অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদর্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিত্যান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা"— বেদান্তসার।

অর্থাৎ যিনি যথাবিধি ঋক্-আদি চতুর্বেদ ও শিক্ষাদি ছয়টি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া যথার্থরূপে বেদার্থ বিদিত হইয়াছেন, ইহ কিংবা পূর্বজন্মেও যিনি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্মসকল পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা অখিল কলুষ নির্মূল করিয়া নিতান্ত নির্মল হইয়াছেন, যিনি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ও যিনি তত্ত্বনিরূপণে অভিলাষী তিনিই মোক্ষোপায়জনক বেদান্ত শ্রবণে অধিকারী। উক্ত লক্ষণসকলের মধ্যে "সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন," ইহাও অধিকারীর একটি লক্ষণ। সাধন-চতুষ্টয় কি? তাহাই বলিতেছেন, — "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগঃ— শমাদিসাধনসম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি"— (শঙ্কর)

১। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক— একমাত্রই ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতীত অখিল বস্তুই অনিত্য; এইরূপ জ্ঞানের নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

২। ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগ— ইহকালে মাল্য-চন্দন-বনিতাদি ও পরকালে স্বর্গাদি ভোগস্পৃহা-শূন্যতাকে ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগ কহে।

৩। শমাদি সাধন সম্পত্তি— শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্সম্পত্তিকেই শমাদি সাধন-সম্পত্তি কহে।

(ক) শম— মনের নিগ্রহ। বিষয়াদি শ্রবণ, দর্শন ও মননাদি দ্বারা মন তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। যে বৃত্তিদ্বারা সেই চঞ্চল মনকে বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া আনা যায়, তাহাকে শম কহে।

(খ) দম— গ্রহণাদি ব্যাপার হইতে হস্তাদি বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সুসংযত করাকে দম কহে।

(গ) উপরতি— যে বৃত্তিদ্বারা স্বধর্ম-বিষয়ক শ্রবণ-মননাদি পরিত্যাগ করিয়া মন অন্য বিষয়ে আসক্ত না হয়, তাহাকে উপরতি কহে।

(ঘ) তিতিক্ষা— যে বৃত্তিদ্বারা অনায়াসে শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা জন্মে, তাহার নাম তিতিক্ষা।

(ঙ) শ্রদ্ধা— গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

(চ) সমাধান— চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান কহে।

৪। মুমুক্ষুত্ব— সংসার-বন্ধন হইতে আমার মোক্ষ হউক, এইরূপ ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব।

উক্ত সাধন-চতুষ্টয় কি তাহা বুঝাইবার পর বলিতেছেন,— "এতৎ সাধন চতুষ্টয়ং ততস্তত্ত্ববিবেকস্যাধিকারিণো ভবন্তি॥"— শঙ্কর। অর্থাৎ এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন— অপরে নহে।

ইহাই জ্ঞানমার্গের প্রথম সোপান। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সাধনা, সে ত দূরের কথা, উল্লিখিত সাধন-চতুষ্টয় ও তৎসহ অপরাপর মহৎ অধিকারে সুসম্পন্ন না হইতে পারিলে যেখানে ব্রহ্ম কি?—এই প্রশ্নটি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেই কঠোরতাপূর্ণ দুর্গম সাধন-পথ যে সাধারণতঃ আমাদিগের নিকট ভীতিপ্রদ ও সঙ্কটময় বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে আর বিচিত্রতা কি আছে? এই শ্রেয়পথ অবলম্বন করিয়া কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে ভাগ্যবান অনেক মহাত্মা অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হইলেও, বিষয়াসক্ত বহির্মুখ বিশাল জনসঙ্ঘের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা যে অতি সামান্য, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। সাধনার কঠোরতাই এই অল্পতার কারণ। সুতরাং সমুজ্জ্বল জ্ঞানমার্গ,— ক্ষণ-সুখ-লুব্ধ

বিষয়াসক্ত আমরা, আমাদিগের নিকট চির তমসাচ্ছন্নই থাকিয়া যাইতেছে।

তাই শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

যথা,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

—(১২।৫)

অর্থাৎ,— নির্বিশেষ স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ গতি দুঃখেই লভ্য হইয়া থাকে।

অতঃপর যোগমার্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিব, কোনও আশার আলোক, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়-গগনে আবার জাগিয়া উঠে কিনা?

পূর্বে জ্ঞানমার্গের আলোচনায় আমরা উপলব্ধি করিয়াছি— ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সফলকাম হইতে হইলে, জ্ঞানযোগী ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত গুরুসন্নিধানে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবেন। আবার এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে হইলে, তদগ্রে তাঁহাকে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইবে; কিন্তু এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইবার উপায় কি? সে সম্বন্ধে ইহাতে বিশদভাবে আর কোনও উপদেশ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা কয়িয়া দেখিলে— বুঝিতে পারা যায়, ভগবান পতঞ্জলির যোগসূত্রে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে।

বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণে ব্যপৃত থাকায় আমাদিগের চিত্ত-বৃত্তি প্রতিক্ষণেই সচঞ্চল। বেদান্তোপদিষ্ট সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইলেও সেই সচঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে যে সর্বপ্রথমেই সংযত ও শান্ত করা অবশ্য প্রয়োজন, এ-কথা কে না স্বীকার করিবেন? সেইজন্য মহাযোগী পতঞ্জলি, তদীয় যোগসূত্রেব প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,— "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-

নিরোধঃ।"— (১।২)

বায়ু-প্রকম্পিত জলাশয়ের ন্যায় জীবের চিত্ত, স্বরূপ অবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক বহির্মুখতা অবলম্বনে বিবিধ বিষয়াকারে আবর্তিত হইয়া থাকে,— ইহাই চিত্তের বৃত্তি। সেই বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ ও অন্তর্মুখী করিয়া, সাম্যাবস্থায় রাখার নাম যোগ। ইহার পরবর্তী সূত্রসকলে (সমাধিপাদে) তিনি, চিত্তের স্বরূপ, পঞ্চবৃত্তি, বৃত্তির নিরোধের উপায়, অভ্যাস, সাধনকল্পাদি সমাধি-চতুষ্টয় ও তাহার লক্ষণ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানান্তর্গত সুগভীর চিন্তাপূর্ণ তত্ত্বসমুদয়ের অবতারণা করিয়া, একমাত্র চিত্তবৃত্তির নিরোধই যে যোগের প্রকৃষ্ট উপায়, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অতঃপর প্রশ্ন এই— চিত্তবৃত্তির নিরোধই যদি সাধনার প্রথম অঙ্গ হয়, তবে এমন কোন উপায় নির্ধারণ করা কর্তব্য, যে উপায় অবলম্বনে চিত্তবৃত্তি সহজেই নিরুদ্ধ হইতে পারে! পাতঞ্জল-দর্শনের 'সাধনপাদ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার উপায় বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরবিবেকখ্যাতেঃ।" — সূত্র ২৮ ॥

অর্থাৎ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইয়া, বিবেক-সাক্ষাৎকার অবধি ক্রমশঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য, সেই যোগাঙ্গ কি? যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা প্রভৃতি দোষ অপসারিত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

"যমনিয়মাসন প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি ॥" সূত্র ২৯ ॥

অর্থাৎ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই আটটি অঙ্গ। এই অষ্টাঙ্গ-যোগের মধ্যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় "বিভূতিপাদ" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত

হইয়াছে। যম হইতে প্রত্যাহার পর্যন্ত বহিরঙ্গ পাঁচটি সাধনা সম্বন্ধে, "সাধনপাদ" মধ্যে যাহার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে উল্লেখ করিব।

সাধক প্রথমতঃ "যম" অভ্যাস করিবেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ,—এই ছয়টি যম নামে অভিহিত। ইহার পরেই নিয়মের অনুষ্ঠান। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানকে নিয়ম কহে। সাধকের পক্ষে অতঃপর আসনের ব্যবস্থা আছে। যে উপায় নিরুদ্‌বেগে ও অচলভাবে সুখোপ-বেশনের সামর্থ্য জন্মে তাহারই নাম 'আসন'। আসন সিদ্ধ হইলে, তদনন্তর প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামে রেচক পূরক ও কুম্ভকের নিয়মানুসারে শ্বাসপ্রশ্বাস আয়ত্ত করিতে হয়। এই প্রাণায়াম প্রভাবেই চিত্তের ধারণাশক্তি জন্মে ও অভিলষিত বিষয়ে মন একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম সংসিদ্ধ হইলে, তাহার পর প্রত্যাহার। চিত্ত স্বরূপভাব প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়সকল আর বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় না, তখন তাহারা অন্তর্মুখী হইয়া স্বকীয় বীর্যপ্রদ ও আধারস্থানীয় চিত্তেই যখন বিশ্রাম লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ঘটে। তাহাকেই ইন্দ্রিয়-গ্রামের পরম বশীভূততা বলা যায়। তখন বিষয়-রস-সংশ্রবে তাহারা আর মনকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে না।

এই সকল উপায় অবলম্বনে— এই যোগাঙ্গসকল সাধনায় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ,যথাক্রমে সাধকের অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবার পর পরমাত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ও মনুষ্যের সকল দুঃখের অবসান হয়। ইহাই যোগমার্গের সাধন সংবাদ। বেদান্ত ও পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত "সাধন-চতুষ্টয়" ও "অষ্টাঙ্গ-যোগ" সম্বন্ধে যে-সকল বিধি-নিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্থির চিত্তে একে একে মিলাইয়া দেখিয়া, তৎপরে যদি কলিহত জীব আমরা নিজ মনকে জিজ্ঞাসা করি— উক্ত সাধনদ্বয় তাহার নিকট সহজ ও সুগম বলিয়া বোধ হয় কি না? তবে সে কী

উত্তর দিবে? নিরাশা ও আশঙ্কার গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিয়া সে নিশ্চয় বলিবে— "না!" জ্ঞান ও যোগমার্গের প্রকৃত সাধক বিরল হইলেও, বেদান্ত কিম্বা যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা খুব অল্প নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলকেই যখন দেখিতে পাই, উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের পর তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া, পুনরায় উৎসাহভরে বৈষয়িক সুখান্বেষণে ব্যাপৃত হয়েন, তখন তাঁহাদিগেরও মন যে আমাদের মতই জ্ঞান ও যোগের সাধনাকে কঠোরতাপূর্ণ বোধ করিয়া, তাহা হইতে আপাতমধুর বিষয়-সুখে ফিরিয়া আসে ইহা বুঝাইবার জন্য অপর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি?

জ্ঞান ও যোগের কঠিন পথ আমাদের নিকট যতই দুর্গম ও ভয়াবহরূপে প্রতীয়মান হউক না কেন, কিন্তু ইহা স্থির যে, শাস্ত্র উক্ত সাধনদ্বয়কে যে দুর্লভ সম্পদের মূল্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দুর্লভ সম্পদ লাভের তুলনায় এই মূল্য— এই ত্যাগস্বীকার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। নির্দিষ্ট আয়ের উপর পাঁচটি মুদ্রা অধিক অর্জনের আবশ্যক হইলে লোকে অশেষ অধ্যবসায়, পরিশ্রম বা অহর্নিশ ছুটাছুটি করিয়া, এই সামান্য বস্তুও অনেক সময় লাভ করিতে পারে না; আর সেই শ্রেয়াভিলাষিগণের অমূল্য সম্পদ্, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদানরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি ভ্রূভঙ্গমাত্র সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ে সমর্থ, যিনি সীমাহীন বিশ্বরাজ্যের একমাত্র রাজাধিরাজরূপে সম্পূজিত, মহাযোগেশ্বর মহাদেব অনাদিকাল ধরিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিয়াও যাঁহার আদি নির্দেশ করিতে অসমর্থ, যাঁহার ভয়ে যম, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সকলে নিজ কার্যে নিয়োজিত, নিখিল ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমা যাঁহার শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্তা, সেই জ্ঞানীর পরমানন্দ, যোগীর হৃদয়-বিহারী, **ভক্তের চন্দন-চর্চ্চিতবপু, বনমালা-বিভূষিত নবঘনরূপ শ্রীভগবানকে** লাভ করিবার জন্য কোনও কঠোরতাপূর্ণ সাধনার আশ্রয়

গ্রহণ করিব না— ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাই বলিতেছি, জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনা আমাদের নিকট যতই কঠিন বলিয়া বোধ হউক না কেন, কিন্তু সেই "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু" লাভের তুলনায় এ-মূল্য যে অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ, ইহা কে না স্বীকার করিবেন?

কিন্তু মুখে স্বীকার করিলেও মন এ-যুক্তি শুনে কৈ? ধূলায় গড়া, দুঃখে ভরা, যাহাই হউক না কেন, সে তাহার পাতান সংসার-মমতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোনও অজানা আনন্দের সন্ধানে, অন্ধকার-ঘেরা সঙ্কটময় পথে অগ্রসর হইতে একেবারেই প্রস্তুত নহে। আহার-বিহারের সামান্য ব্যতিক্রমেও যেখানে অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়া উঠে,আমরা সেখানে কি প্রকারে শীতাতপাদি সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া, দেহ-গেহাদি বিস্মরণ পূর্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের কঠোরতা মধ্যে স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে বিসর্জন দিতে সমর্থ হইব? অপার দুঃখ ভোগ করিয়াও যে সুখবিন্দুর আশা স্বপ্নেও পরিত্যাগ করিতে পারি না, সেই আমরা কোন্ শক্তিপ্রভাবে কেবল ইহকালের নয়—পরকালেরও সমুদয় সুখভোগ-স্পৃহা চিরদিনের মত বিসর্জন দিব? যাঁহারা পারেন, তাঁহারা আমাদিগের শতবার পূজ্য ও প্রণম্য; তাঁহারা অসীম ভাগ্যবান। কিন্তু হায়! আমাদের ন্যায় মায়াহত, সংসার-বদ্ধ, ত্রিতাপ-দগ্ধ, সাধন-ভজনবিহীন অসংখ্য অগণ্য জীবের উপায় কি করিলে, জগদীশ? আমরা কি এই অপার ভব-সমুদ্রের উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ তটভূমে দাঁড়াইয়া, পারের আশায় চিরদিন সাশ্রুনেত্রে চাহিয়াই থাকিব? যদি ইহাই হয়, তবে তোমার "অগতির-গতি" নামের সার্থকতা কোথায়? যে-হৃদয় অনন্ত মাতৃস্নেহে ভরা, যে-হৃদয় অনন্ত দয়ায় গড়া, কলিহত জীবের সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি যে সে-প্রাণে বাজিবে না, সে-কানে পৌঁছিবে না,— ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? সম্ভব নহে বলিয়াই আজ কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্বের কলির জীবের ভাগ্য ধন্য করিতে স্থল, জল, আকাশ, পবন

প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই পূর্ণতম ভগবানের জলদগম্ভীর "মা ভৈঃ" ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল,—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪।৬৫-৬৮)

সেই প্রেম ও অমিয়-সিঞ্চিত মূরতি—সাক্ষাৎ রসরাজ ও মহাভাব-মিলিততনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিয়া ও এই আশার বাণী,—মা ভৈঃ ধ্বনি অনুসরণপূর্বক অতঃপর আমরা আর একবার খুঁজিয়া দেখিব— কোনও আশার আলোক এই পথে মিলে কি না ?

অতঃপর আমাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনার প্রথম অঙ্গস্বরূপ— সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য "সাধন-চতুষ্টয়" ও "অষ্টাঙ্গ-যোগের" ন্যায় কোন সাধন বিষয়ক বিভীষিকা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিত কি না ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি সাধনার সম্বন্ধে এরূপ কোন কঠোরতার সংবাদ, এই সমুন্নত প্রেম-ধর্ম বা আত্ম-ধর্মেরও মূলদেশে অবস্থিত দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সেই দয়ার অনন্ত পারাবার— সেই পতিতপাবনাবতারের প্রকৃত উপদেশ না বুঝিয়া, আমরাই ভ্রমবশতঃ এই অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি।

একটি পরম মঙ্গলময় শ্লোক, যাহা একদিন শ্রীমুখাব্জ হইতে

উদ্গীত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সৌন্দর্য-ভাণ্ডারের একটি অসামান্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, জানি না,— কবে, — কাহার দ্বারা— কোন্ অশুভ মুহূর্ত হইতে তাহা বিপরীতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আজ এই সুপবিত্র ভক্তিধর্মের সাধনপথের পরম বিঘ্ন-স্বরূপে দণ্ডায়মান ?— যাহার বিষময় ফলে, এই সমুজ্জ্বল প্রেমধর্ম-সাধন-পথে অগ্রসর না হইবার কৈফিয়ৎস্বরূপ আজকাল অনেকেই গম্ভীর ভাবে বলিয়া থাকেন,—

"বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ।
'তৃণাদপি' শ্লোকেতে পড়ি গেল বাদ ॥"

অনেকেই অবগত আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটির যথার্থ অর্থ বিকৃতভাবে গ্রহণ করাতেই, শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্মের সাধনার মূলে এই বিভীষিকাময় ঘনান্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে; কিন্তু যদি কেহ কেবল স্বমত-পোষণে কৃতসংকল্প না হইয়া, নিরপেক্ষ ভাবে এই মহান ভাবপূর্ণ শ্লোকটির উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া দেখেন, তবে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি,— এই সমুজ্জ্বল প্রেমধর্মের সাধনার "সাধে" বাদ পড়িবার মত অণুমাত্রও কারণ দেখা যাইবে না। শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটি এই,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ, যিনি তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু এবং স্বয়ং মানাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি কর্তৃক সর্বদা শ্রীহরি কীর্তনীয় হয়েন। এই শ্লোকার্থ হইতে যদি আমরা এইরূপ মনে করি যে, "সাধন-চতুষ্টয়ে" সর্বাগ্রে সুসিদ্ধ না হইতে পারিলে যেমন জ্ঞানমার্গাভিলাষী সাধকের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা, যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দূরের কথা,— "ব্রহ্ম কি বস্তু ?"— গুরু-সমীপে এই প্রশ্নটি মাত্রও জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার জন্মে না,

সেইরূপ ভক্ত বা বৈষ্ণব হইতে হইলে, তৎ-সাধনার প্রারম্ভেই "সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন" বা "অষ্টাঙ্গ-যোগসিদ্ধির" ন্যায় যে ব্যক্তি স্বকীয় সামর্থ্যে, তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু এবং নিজে সম্পূর্ণ-রূপে অমানী হইয়া অপরকে বিশিষ্টরূপে সম্মান দান করিতে ও তৎসহ নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিতে সমর্থ, তিনিই বৈষ্ণব হইবার— ভক্তি-সাধন-পথে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার অধিকারী,— অপরে নহে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে নিঃসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনার তুলনায় এই ভক্তিমার্গের সাধনার কঠোরতা কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং তদপেক্ষা সর্বাংশেই কঠিনতর। সুতরাং ক্ষণ-সুখলব্ধ— সংসারাসক্ত, কলিহত জীবের পক্ষে এই সমুজ্জ্বল প্রেমধর্ম-সাধনার "সাধে" স্বতঃই যে "বাদ" পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?— তবে ইহাই আশ্চর্য যে, যে পরম কারুণিক অবতার, কলিজীবের ভাগ্য ধন্য করিতে, গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,— যিনি ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্য হইয়াও স্ব-কৃপায় নামামৃত যাচিয়া যাচিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন, — কে কোথায় অধম— পতিত— ঘৃণিত বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যিনি প্রেমভরে নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কোনও বিধি-নিষেধের কঠিন বন্ধনে সংবদ্ধ না করিয়া যিনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে— সাধন-মহামন্ত্র হরিনাম— অবিরাম সকলকে কীর্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেই অতীব সরল— অতীব সুগম— অতীব সুন্দর সাধনার পথে অগ্রসর হইবার "সাধ" যদি এত সহজেই "বাদ" পড়িয়া যায়, তবে সেই প্রেমের ঠাকুর— অভিন্ন-হৃদয় দয়াল নিমাই ও নিতাই-এর আচণ্ডাল সর্বজীব-উদ্ধারের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের সার্থকতা কোথায়? তাই বলিতেছি, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে এই সুমহান অবতারের সুমহান ব্রতোদ্‌যাপন—সে কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা চিন্তা করিতেও সাহসী হই যে রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া মদ, মোহ,

মাৎসর্যের ঘাত-প্রতিঘাতে সচঞ্চল মানব, স্বকীয় সামর্থ্যে এই কঠিনতম সাধনায় সুসিদ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের সাধন-পথের পথিক হইবার জন্য কোনও দিন প্রস্তুত হইতে পারে!

বৈষ্ণব হইবার সাধনার প্রথম অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া লইলে এই সাধনা যে বদ্ধ জীবের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্য নহে, কতদূর অসাধ্য— একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা সকলকেই অনুরোধ করি।

তৃণাদপি— অর্থাৎ নিজে উত্তম হইয়াও ধূলির ন্যায় সর্বজীবের নিকট নিরভিমান ও বিনীত হইতে হইবে। তৃণ অপেক্ষা নীচ— একমাত্র ধূলি বা মৃত্তিকা—যাহার উপর তৃণ জন্মে, তাহাকেই বুঝিতে হয়। তৃণের উপর পদার্পণ করিলে, সে দীনতায় মস্তক অবনত করিলেও পরক্ষণে পুনরায় উত্তোলন করে, কিন্তু ধূলিকণা? —তাহারা জীবের পদভরে নত হয়,— আর উচ্চ হইবার চেষ্টাও তাহাদের থাকে না। এই ধূলার ন্যায় সর্বজীব সমক্ষে নত যিনি, কেবল তাঁহাকেই তৃণাদপি সুনীচ বলা যাইতে পারে।

তরোরিব সহিষ্ণু— বৃক্ষের সহিষ্ণুতা কিরূপ? বৃক্ষকে ছেদন করিলেও বৃক্ষ তাহাতে প্রতিবাদ করে না; অধিকন্তু ছেদনকারীকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া, নিজ শাখাপল্লবাদি দ্বারা ছায়া প্রদান ও ব্যজন করিয়া থাকে। সলিলাভাবে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইলেও একমাত্র আকাশের দিকেই চাহিয়া থাকে, অপর কাহারো নিকট জল প্রার্থনা করে না। অন্যের সেবার জন্য ফলভার বহন করিয়া থাকে— যে চাহে সকলকেই নিজ ধন প্রদান করে, কাহাকেও বিমুখ করে না। নিজে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়াও অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করে। বৃক্ষের ন্যায় এই প্রকার যিনি অচিন্তনীয় গুণসম্পদের অধিকারী— একমাত্র তাঁহাকেই তরোরিব সহিষ্ণু বলা যাইতে পারে।

অমানী ও মানদ— যিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে নিরভিমান হইয়া

অপরাপর জীবমাত্রকেই সম্মান প্রদান করিতে সমর্থ,— অমানী ও মানদ ব্রতে তিনিই সিদ্ধ।

কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ— হরিনাম সর্বদা কীর্তনীয় বা গ্রহণীয়। সদা— নিরন্তর, প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত। প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিনাম অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নামই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। তাই শাস্ত্র স্পষ্টভাবে এই 'সদা' পদটির অর্থ বুঝাইতে বলিতেছেন ;—

সা হানিঃ তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ॥

—[গরুড়পুরাণ (পূর্বখণ্ড ২৩৪|২৩)]

উক্ত অলৌকিক গুণ-সম্পদসকল যদি বৈষ্ণব হইবার সাধন-সোপানের প্রথম স্তর বা ভক্তিমার্গে প্রবেশের প্রথম অধিকার হয়, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি,—রক্তমাংসের দেহধারী কোনও জীবের পক্ষে এই পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস সম্পূর্ণ অনর্থক। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, স্বকীয় সামর্থ্যে—স্বকীয়া শক্তিতে স্বকীয় অধ্যবসায় দ্বারা আমরা কোনক্রমে উক্ত সাধনায় সুসিদ্ধ হইতেই পারি না। তাই বলিতেছি, "তৃণাদপি" শ্লোকে যে-সকল পরমোৎকর্ষ গুণ-সম্পদের তালিকা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে বৈষ্ণবের সাধনার পথে অবস্থিত, একথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিবার প্রথম সাধনা স্বরূপ সর্বাগ্রে "সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন" হইবার ন্যায় ভক্তিপথে বা বৈষ্ণব হইবার সাধনার পক্ষে ইহা কখনও প্রথম সাধনা হইতে পারে না। যদি কেহ সেরূপ বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহার সে ধারণা যে অভ্রান্ত নহে, একথা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায়। তাই আবার বলিতেছি, বৈষ্ণব হইতে যাঁহার মনে সাধ আছে, কলিপাবনাবতার—প্রেমের ঠাকুরের পবিত্র মুখাব্জবিনির্গত পরম মঙ্গলময় "তৃণাদপি" শ্লোকে সেই মনঃসাধে বাদ পড়িবার অণুমাত্রও শঙ্কা নাই।

উপস্থিত জিজ্ঞাস্য এই যে, "তৃণাদপি" শ্লোকটি যদি ভক্তিপথে প্রবেশ লাভ করিবার— বৈষ্ণব হইবার সাধনাই না হয়, তবে বৈষ্ণব হইবার পক্ষে সেই প্রথম সাধনা— প্রথম লক্ষণটি কি, যাহাকে আমরা জ্ঞান-যোগাদি অপর সাধনমার্গের কঠোরতার তুলনায় "কোমল কুসুম-স্তবকে আবৃত পথ" বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ? উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে যে-শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন, যাহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাণী— যাহা শ্রীমুখের স্পষ্টই নির্দেশ, তদপেক্ষা অধিক প্রভাবান্বিত প্রমাণ আর কি হইতে পারে, জানি না; সুতরাং সেই সর্বোত্তম প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদের অতঃপর দেখাইতে হইবে, বৈষ্ণবের লক্ষণ কি, বৈষ্ণবের সাধনার প্রথম সোপান কোন স্থানে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, একদা শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কুলীনগ্রাম-নিবাসী শ্রীরামানন্দ ও সত্যরাজ খান, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রভু! আমরা বিষয়ী গৃহস্থ, আমাদের কি সাধন, তাহা কৃপাপূর্বক শ্রীমুখে আদেশ করুন।

"তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৫।১০২-১০৩)

তদুত্তরে কৃপাময় মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ- নাম- সংকীর্ত্তন॥"

— (ঐ,— মধ্য ১৫।১০৪)

এখানেও প্রশ্নের ঠিক অবসান হইল না ; কারণ, কুলীনগ্রামবাসী

ভক্তগণ বুঝিলেন, নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ও বৈষ্ণব-সেবন এই দুইটি বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ। দ্বিতীয় আদেশটি অর্থাৎ নাম-সংকীর্তন সম্বন্ধে এখানে আর কোনও কথা তেমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু "বৈষ্ণবসেবা দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা হয়, সুতরাং বৈষ্ণবের সেবা কর"— এই যে মহাপ্রভুর আদেশ— এই আদেশটি সম্যকরূপে বুঝিয়া লইতে হইলে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে, সেই ভাগ্যবান বৈষ্ণব কি লক্ষণে চিনিব, যাঁহার সেবায় কৃষ্ণ-সেবা হয়? তাই শ্রীসত্যরাজ সবিনয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৫।১০৫)

প্রভু আমার এইবার শ্রীমুখে স্পষ্টরূপে বৈষ্ণব-লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন। শুধু লক্ষণ নহে, সেই লক্ষণদ্বারা বৈষ্ণব হইবার অধিকারও নির্ণীত হইতেছে, যথা—

"প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৫।১০৬)

বর্ষান্তরে আরও দুইবার কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ ঠিক এইরূপ ভাবের প্রশ্ন করিলেন, তদুত্তরচ্ছলে এইবার সর্বসাধারণকে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণব-তমতার লক্ষণ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এইরূপ; যথা—

"তিহ কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
বর্ষান্তরে তাহা পুনঃ ঐছে প্রশ্ন কৈল।

বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৬।৭১-৭৫)

শ্রীমুখের এই অতি সুস্পষ্ট উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অন্ততঃ একবারও কৃষ্ণনাম যিনি উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন, স্বরূপ- লক্ষণে তিনিই পূজ্য— তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ— তিনিই বৈষ্ণব। তটস্থ- লক্ষণে ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য গুণাবলীতে বৈষ্ণব ভূষিত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহাকে বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবেশ পথে এই যে "সামান্য লক্ষণে" যাহা উক্ত হইয়াছে,— আমরা বলি, ইহাই সমগ্র সাধন জগতের সুসংবাদ— ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

পরম কারুণিক শ্রীশচীনন্দন কৃপাপূর্বক কুলীনগ্রামবাসী বা অপরাপর বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহাই কেন আদেশ করুন না, কিন্তু বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম হইবার জন্য নহে— কেবলমাত্র বৈষ্ণব হইবার অধিকারে যে একবার মাত্র বদনে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ব্যতীত অপর কোনও সাধন আছে উক্ত "শ্রীমুখের বাণী" শুনিবার পর আমরা একথা আর কোনও ক্রমে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বদনের সহিত কৃষ্ণনামের সংযোগ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারী। প্রেমের পথে— ভক্তির পথে — বৈষ্ণব হইবার সাধনার পথের আরম্ভ এইখানে,— এই বদনের সহিত কৃষ্ণনামের বারেক সংযোগ হইতে। নিরপরাধ ক্ষেত্রে, এই একবার মাত্র নামের সংস্পর্শ ঘটিলেই, তাহারই অচিন্ত্য প্রভাবে যাহা

সর্বজন-সম্মত বৈষ্ণব লক্ষণ,— তাহারই উদয় হইয়া থাকে।

নিরাশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া সাধন-রাজ্যের এই আশার সংবাদ পাইয়াছি বলিয়া, তাই আজ আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, হে সংসার-মরু-পথের পরিশ্রান্ত পথিক! হে ত্রিতাপের তীব্র তুষানলে পরিদগ্ধ কলিহত জীব! যাহা পাইবার জন্য কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কাঁদিয়াছ,— কত হতাশের মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছ, সেই "শ্রেয়"-রূপ বিশাল বিটপীর সুশীতল সমীরণ-সিঞ্চিত স্নিগ্ধচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া যদি চিরতাপিত— চিরশ্রান্ত— চিরনৈরাশ্যপূর্ণ জীবন-প্রবাহ চিরদিনের জন্য সার্থক করিয়া লইতে চাহ,— যাহা তোমাদিগকে বিনামূল্যে দান করিবার জন্য দয়ার অনন্ত জলধি সেই মহান প্রভু স্বয়ং আসিয়া "মা ভৈঃ"-রবে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন,— সেই সরল-সুন্দর-সুগম-সাধন-তরুর মূল এইখানে,— এই অধুনা অতি সহজলভ্য দুইটি বর্ণ, — অতি সহজসাধ্য একবার মাত্র শ্রদ্ধায় জিহ্বায় উচ্চারণে।

আনায়াস লভ্য কৃষ্ণনাম, একটিবার মাত্র শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবার পর হইতেই নামেরই প্রভাবে সাধক বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হইয়া পরে যথাক্রমে তৃণাদপি সুনীচ ইত্যাদি অভাবনীয় বিবিধ গুণসম্পদে বিভূষিত হইয়া বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমরূপে গণ্য ও চিরাভীষ্ট বস্তুর সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্য হইতে সমর্থ হয়েন। নামেরই প্রভাবে সাধক ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ইত্যাদি সাধন ভক্তির স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, "ভাবভক্তি" অতিক্রম পূর্বক "প্রয়োজনতত্ত্ব" স্বরূপ "প্রেমভক্তির" অধিকারী হইয়া থাকেন। নিরপরাধে একটিবার মাত্র নাম গ্রহণের পর হইতে এই যে স্তরে স্তরে সাধকের সাধন-পথে অগ্রসরণ— ইহা তাঁহার নিজ সামর্থ্য— নিজ শক্তি— নিজ অধ্যবসায় গুণে নহে, ইহা কেবল সেই পরমকারুণিক,— অপ্রাকৃত— অচিন্ত্য, নামীর সহিত অভিন্ন— একমাত্র নামের অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে। ক্রম অনুসারে বৈষ্ণব-সাধক যে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমরূপে পরিণত হয়েন,

— সাধনমার্গের যথাযথ স্থানে উপনীত হইয়া তিনি যে "তৃণাদপি সুনীচ" ইত্যাদি অত্যদ্ভুত গুণগ্রামে বিভূষিত হয়েন, সর্বান্তঃকরণে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই "হওয়া," তাঁহার স্বসামর্থ্যে নহে— নামের অলৌকিক শক্তি, সাধকের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে এইরূপ "হওয়ায়।"

অগতি কলিহত জীবের একমাত্র গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামকে অগ্রবর্তী করিয়া যিনি শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই ধরাধামে প্রকট হইয়াছিলেন এই বর্তমান কলিযুগের সেই পরম উপাস্য দেব শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীনামমহিমার সহিত জয়যুক্ত হউন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

— (বৃহন্নারদীয়, ৩৮।১২৬

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনারগৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।
চৈত্র, ১৩৩৫ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল।

—

নামপ্রচারে নামীর পরমাশ্চর্য কৃপা

কৃপা-কল্লোল বারিধি শ্রীভগবানের সর্বাধিক কৃপার পরিচয় মরজগতে তদীয় অভিন্নাত্ম নাম বিতরণ দ্বারাই সংসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত জগতে গোলোকের গুপ্ত মন্ত্র অপ্রাকৃত নামের অবাধ প্রচার, প্রাকৃত জিহ্বায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামের অবাধ উচ্চারণ,— এই যে জীবের প্রতি তাঁহার অনির্বচনীয় কৃপা প্রকাশ,— এই কৃপার ইয়ত্তা নাই! মায়া-নিগড়-বদ্ধ— ত্রিতাপ-তাপিত— কলিহত জীবের উপর এই যে কৃপামৃত বর্ষণ— ইহা এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু দুর্দৈব আমাদের, আমরা যে তদীয় দয়া-কল্লোল-বারিধির এই মহোচ্ছ্বাস দেখিয়াও আশ্চর্য হই না, বুঝিয়াও স্তম্ভিত হই না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,— তাঁহারই অসীম কৃপায়, সহজলভ্য বা স্বাভাবিক শত শত অত্যাশ্চর্য নিত্য ঘটনার ন্যায় ইহাও আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে বলিয়াই।

পরমাশ্চর্য যে সকল প্রাকৃত ঘটনা প্রতিনিয়ত— প্রতিক্ষণ আমাদের নয়নপথে ভ্রাম্যমান হইতেছে, সে সকল নিত্য ঘটনা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহজলভ্য বিষয় বলিয়া,— তাহা মানসপটে প্রতিফলিত হইয়াও চিত্ত-প্রাঙ্গণে সমুদিত হয় না; সুতরাং সেই সকল বিষয়ের চমৎকারিতাও আমরা অনুভব করি না। স্বাভাবিকতা বা সহজ-লভ্যতাই পরমাশ্চর্যকর বিষয়ে আশ্চর্য বোধ না করিবার একমাত্র কারণ। তাই আমরা বিপণীতে ফল-পুষ্পাদি ক্রয় করিতে যাইয়া বিক্রেতাকে তাহাদের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে শুনিলে হয়তো আশ্চর্য বোধ করি, কিন্তু সামান্য একটি শুষ্ক বীজ হইতে কি কৌশলে এরূপ অত্যাশ্চর্য ফল-পুষ্পাদির উদ্ভব হইল, সে-বিষয় আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে না। নভোমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র

ব্যোমযানকে বিচরণ করিতে দেখিলে আমরা কতই না আশ্চর্য বোধ করি, কিন্তু অসংখ্য জড় ও জীবের নিবাসভূতা আমাদের এই বসুন্ধরা কেমন করিয়া নদ-নদী, পর্বত-সমুদ্রাদির সহিত প্রতিনিয়ত মহাশূন্যে বিঘূর্ণিতা হইতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। সুতরাং তাহাতে আশ্চর্য বোধ করি না। শিল্পচাতুর্যপূর্ণ একটি মৃন্ময়ী মূর্তি দেখিলে আমরা বিমুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু জননী-জঠর হইতে অত্যুৎকৃষ্ট চৈতন্য-শক্তিবিশিষ্ট অসংখ্য মানবশিশু জগতে আবির্ভূত হইয়া,— একই দেহে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় কেমন করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে— এই পরমাশ্চর্য ব্যাপারে আমরা বিমুগ্ধ হই না! বিবিধ বর্ণের স্ফটিকাধারে সংরক্ষিত দীপাবলীর ক্ষীণ রশ্মি দেখিয়া আমরা স্তব্ধ-নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকি, কিন্তু যে পরমাশ্চর্য জ্যোতির্মণ্ডল অত্যুজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া যথা নিয়মে প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন,— তাহা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই না। স্বাভাবিকতা ও সহজলভ্যতাই যে এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপারে বিস্মিত না হইবার একমাত্র কারণ— এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

মরজগতে শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণে শ্রীভগবানের পরমাশ্চর্য কৃপাও সহজলভ্য ও স্বাভাবিক প্রাকৃত ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায়, ইহাও আমাদের নিকট ঠিক সেইরূপ দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেৎ ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্যের— অধিক চমৎকারিতার বিষয় আর কিছুই নাই! প্রাকৃত শব্দের ন্যায় ইচ্ছামাত্রই শ্রীভগবন্নাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়াই আমরা প্রাকৃত সাধারণ শব্দ হইতে শ্রীনামের কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারি না। পারি আর নাই পারি,— কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব— প্রকৃত ব্যাপার ইহাই যে— প্রাকৃত জিহ্বায় এই যে অপ্রাকৃত নামোদয়, ইহা কেবল সেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপ— শ্রীভগবন্নামেরই সুমহান কৃপায় সংঘটিত হইয়া থাকে! যথা,—

অতএব কৃষ্ণ নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৭।১৩৪)

ইহা অপেক্ষা আর অধিক কৃপার বিস্তার,— ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার জগতে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না! তাই শাস্ত্র, প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া দিতেছেন, যথা,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

— (ভঃ রঃ সিঃ, ১।২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামাদি (শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম প্রভৃতি) সমস্তই অপ্রাকৃত— চিদানন্দময়; সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইবার নহেন — ইহাই নিয়ম। কিন্তু পরম দয়াল শ্রীভগবান, অনন্যোপায় জীবের উদ্ধার মানসে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়-সকল নাম গ্রহণে লেশমাত্রও প্রবৃত্ত হইলে স্বপ্রকাশ নাম, কৃপায় স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকেন। দুর্লভ শ্রীভগবন্নামের সহজলভ্যতা হেতু আমরা যথার্থ ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত শব্দের ন্যায় ইহাও স্বকীয় সামর্থ্যে উচ্চারিত কোন শব্দবিশেষ মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে,— নাম প্রচারে শ্রীভগবানের অনির্বচনীয় দয়ার কথা বুঝিতে পারিলে, ইহা অপেক্ষা চমৎকৃত হইবার বিষয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীভগবন্নাম উভয়ই এক বস্তু— দুই-ই চিদানন্দ-ময়। তথাপি নামীরূপে তাঁহার কৃপার অপেক্ষা নামরূপে তাঁহার কৃপার বিস্তার আরও অচিন্ত্য। নামীর ন্যায় নামও গৌরবের বস্তু— উভয়ের মর্যাদা একই। কিন্তু নামীর সেবায়— শ্রীবিগ্রহের অর্চনাদিতে দেশ-কাল-পাত্রাদি ও শুদ্ধাশুদ্ধির যেমন অপেক্ষা আছে, নামের সেবাতেও ঠিক সেইরূপ থাকা যুক্তিসঙ্গত হইলেও নামরূপে যখন

শ্রীভগবান অধম-অগতি-পতিত জীব উদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তখন আর তিনি দেশ-কাল-পাত্র শুদ্ধাশুদ্ধের অপেক্ষা করেন না;— এমন কি নিজ মর্যাদা উপেক্ষা করিয়াও, দূষিত-ভাষণ-দুষ্ট— কুভক্ষ্য- স্পৃষ্ট— উচ্ছিষ্টের জন্মস্থান স্বরূপ পাতকীয় জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়াও স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে থাকেন। নামরূপে তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য করুণার কথা স্মরণ করিলে আশায় ও আনন্দে কাহার না দেহ পুলকিত হয়!

অহো কলিগ্রস্ত জীব! এমন সুদুর্লভ চিন্তামণি এতই সহজে পাইয়াছ বলিয়া, তাই কি তাহার মূল্য বুঝিলে না,— তাই কি তাহাতে অনুরাগ জন্মিল না! ইহা অপেক্ষা দুর্দৈব আর আমাদের কি হইতে পারে জানি না। তাই সেই কলি-পাবনাবতারের জীবের পক্ষ অবলম্বন করা— কাঁদা সুরের— কাঁদা ভাষায়—কেবলই বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

— (শিক্ষাষ্টক—২)

প্রথম প্রকাশঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল।

—

শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্য
ও
তাহার দুইটি প্রধানতম কারণ

নিগূঢ়তম শ্রীগৌরাঙ্গলীলার বিরাট উদ্দেশ্যের এক দিক হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবকে এক কালে পরমগতি দান,— অন্যদিকে স্বমাধুর্য আস্বাদনাদি স্বপ্রয়োজন সাধন; যাহার সংবাদ আরও ঊর্ধ্বে বিন্যস্ত এবং যাহা একমাত্র সাধনগ্রাহ্য ও রসিক ভক্তজনের আস্বাদনীয় বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল শ্রীগৌরলীলার প্রথমোক্ত বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহাপ্রেমাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক তাঁহার প্রকটকালে এই ব্রহ্মাণ্ডগত,— (ইহা ধারণা করিবার পক্ষে আমাদের অযোগ্যতা বশতঃ বলিতেছি।) অন্ততঃ এই জগতের স্থাবর জঙ্গম— সর্বজীবকে যে ভাবে উদ্ধার দান করিয়াছেন, — জীবের প্রতি সেরূপ করুণার বিস্তার বিশ্বের ইতিহাসে যেমন অভূতপূর্ব তেমনি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। কল্পের মধ্যে একবার মাত্র পূর্ণতম শ্রীভগবৎ-স্বরূপ কর্তৃক যে পূর্ণতম কৃপা নির্বিচারে জীব- জগতের উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হইবার কথা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্যকেই জীবের প্রতি শ্রীভগবানের শাস্ত্রোক্ত সেই শ্রেষ্ঠতম কৃপার শ্রেষ্ঠতম দান বলিয়া নির্ধারিত করিতে পারা যায়।

প্রবন্ধ সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে আপাততঃ আমরা সর্ব-ভক্তিশাস্ত্রসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজের উক্তিই প্রাধান্যরূপে

গ্রহণপূর্বক তদ্দ্বারা এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের শাস্ত্রসারত্ব, শাস্ত্রান্তর দ্বারা প্রমাণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় না হওয়ায়, সে-প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল। যাহারা শ্রীচরিতামৃতোক্তিকে শাস্ত্রপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্ততঃ সেই মহানুভব সকলের সেবার জন্য যদি এই প্রবন্ধের কথঞ্চিৎ উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সর্বজীবের প্রেমাধিকার লাভ করিয়া এককালীন উদ্ধার বার্তা, ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসের শ্রীমুখ হইতে অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে ; যথা—

"হরিদাস কহে, তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥
সব উদ্ধার করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, ৩।৩)

এই নিগূঢ় রহস্য বার্তা মহাপ্রভুর সমক্ষেই ঘোষিত হইয়াছিল এবং এই উক্তি তাঁহার অনুমোদন লাভ করিয়াছিল ; যথা—

"এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, ৩।৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সে-সময়কার স্থাবর জঙ্গম সমষ্টির একযোগে উদ্ধার সাধন— (প্রেম-মহাবতারী) মহাপ্রেমাবতারী— পূর্ণতম ভগবান— শ্রীগৌরহরির প্রকট লীলার একটি প্রধান কার্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব জগতোদ্ধাররূপ এই বিরাট কার্যের উল্লেখ করিয়াই ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস নিরস্ত হয়েন নাই, তৎসহ তিনি জীব-জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম কার্যের দুইটি প্রধানতম কারণেরও উল্লেখ

করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে যথাক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার সেই কারণ দুইটির অনুসরণ পূর্বক যুক্তি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব, শ্রীভগবানের যে-লীলার ভিতর উক্ত কারণ দুইটি সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান, কেবল সেই ভগবৎ-স্বরূপ দ্বারাই নির্বিশেষে প্রেমভক্তি প্রদানে সর্ব-জীবোদ্ধার সহজ ও সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলায়— ৩য় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রতি শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসের উক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বজগতোদ্ধার কার্যের সেই প্রধানতম কারণ দুইটির বিষয় এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—

"জগৎ তারিতে তোমার এই অবতার।
(১) ভক্ত ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥
(২) উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার।
স্থির চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ, ৩।৩)

(১) পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপের সহিত পূর্ণতম ভক্ত-স্বরূপের সম্মিলন ও তৎসহ (২) উচ্চ সংকীর্তন, উক্ত বিশ্বোদ্ধার কার্যের পক্ষে এই হেতুদ্বয় যে কতদূর যুক্তিসহ, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। যিনি পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপ, তিনি ছাড়া জীবের প্রতি পূর্ণতম কৃপা বিতরণে আর কেহ-ই সমর্থ নহেন। যিনি স্বয়ং-রূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান, এই অধিকার একমাত্র তাঁহার। অন্যান্য অবতার কর্তৃক এই কার্য সম্ভব হয় না,— ইহা অবতারীর কার্য ; যথা—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা (কৃষ্ণ) বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ধরাধামে প্রকট হইয়া,প্রতি কল্পে

একবার মাত্র যে পুরুষার্থ-শিরোমণি জীব-সমষ্টিকে একযোগে প্রদত্ত হইবার কথা, সেই প্রেম-সম্পদ জগতে সঞ্চার পূর্বক পরিবেশনের আয়োজন করিয়া রাখেন; কিন্তু তৎকালে তাহা বিতরণ করেন না। যথা—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৮)

শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রেমভক্তি দেন না, উক্ত পয়ারের এরূপ তাৎপর্য নহে। তাহা হইলে 'কভু' না বলিয়া 'কভুও' বলাই সঙ্গত হইত। 'কভু' অর্থাৎ কখন— সময় বিশেষে তিনি দান না করিয়া লুকাইয়া রাখেন এবং যথাকালে তাহাই আবার নির্বিচারে অজস্র ভাবে তিনিই দান করিয়া থাকেন।

শ্যামসুন্দর— শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে প্রকটকালে এই প্রেম-সম্পদ গোলোকের গুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে আনিয়া, জগতের নিভৃত প্রদেশে তৎকালের জন্য সুরক্ষিত করিয়া, কিয়ৎকালের জন্য সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েন; পুনর্বার সেই দ্বাপরযুগের ঠিক পরবর্তী কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাংশে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া পূর্বসঞ্চিত সেই প্রেমসুধা সপার্ষদ আস্বাদনপূর্বক সেই আনন্দের অধীরতায়, নির্বিচারে অবাধে সর্বজীবকে তাহা বিতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দররূপে উহা তৎকালে অবাধে বিতরণ করেন না; কিন্তু তিনিই শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকট হইয়া সেই প্রেম জগতের সর্বত্র সকল জীবকে বিলাইয়া দেন। যথা—

"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ * * * * সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥ পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন। যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় উন্মত্ত।

নাচে, গায়, হাসে কান্দে যৈছে মদমত্ত ॥ পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান ॥ * * * * * * উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী বালক যুবক বৃদ্ধ সকল ডুবায় ॥ সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ জগত ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ। তাহা দেখি পঞ্চজনের অধিক উল্লাস ॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭ অঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ও শ্রীগৌরচন্দ্রে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও ভাবগত ভিন্নতা আছে। কোনও কোটীশ্বর যখন দানশীল হয়েন, তাঁহার পূর্বেকার কেবল অধিকারী-ভাব ও পরবর্তী দানকারী-ভাব—এই দুইটি ভাবের ভিন্নতা থাকিলেও যেমন উভয় ভাব সেই একই কোটীশ্বর স্বরূপের অন্তর্গত, তেমনি একই কৃষ্ণস্বরূপ যখন প্রেম-মহা-সম্পদের অধিকারী ভাবে প্রকট হয়েন, তখন তিনিই শ্রীশ্যামসুন্দর কৃষ্ণ এবং যখন তাহা সপার্ষদ আস্বাদন করিয়া অবাধে জগতের সর্বজীবকে দানকারী ভাবে প্রকট হয়েন, তখন তিনিই শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ। একই কৃষ্ণস্বরূপের উভয় ভাবই যুগপৎ ও নিত্য। সর্বভক্ত-শিরোমণি —হ্লাদিনী-মহারত্নমালার মধ্যমণি-স্বরূপিণী —শ্রীরাধা-রাণীর ভাব ও কান্তির সহিত একত্বপ্রাপ্ত কৃষ্ণস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি।

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

তাৎপর্য—শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণস্বরূপ' অর্থাৎ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই গ্রন্থকার বন্দনা করিয়াছেন ; কিন্তু উক্ত কৃষ্ণস্বরূপে যে ভাববৈশিষ্ট্য সংযুক্ত তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা একত্বপ্রাপ্ত যিনি, এমন যে কৃষ্ণস্বরূপ সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন

এক ও অভিন্ন স্বরূপ, তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তৎকালে প্রেম অপ্রদান ও শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রেম প্রদানে সর্বজীবোদ্ধার,— একই অভিন্ন স্বরূপে, এই ভাবদ্বয়ের মহান ভিন্নতা— ইহারই বা হেতু কি ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,— শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর-ভাবে অবাধ প্রেমদানের প্রতিবন্ধকতা ও শ্রীগৌরসুন্দর-ভাবে নির্বিচারে জীবমাত্রকেই প্রেম বিতরণের অপ্রতিবন্ধকতারূপ যে মহান ভাববৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে, এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির সম্মিলনে স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে,— কল্পে একবার— একযোগে জীবসমষ্টিকে পূর্ণতম কৃপাদান করিবার জন্য পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপের কিরূপ ব্যাকুল প্রয়াস এবং একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাবেই কিরূপে তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাও আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস উক্ত সংশয়ের সমাধান করিয়াই বলিয়াছেন—

(১) "ভক্ত ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার।"

শাস্ত্র বলেন, প্রেমভক্তি নির্গুণ, সুতরাং স্বপ্রকাশ বস্তু। কোন সগুণ বা মায়িক দ্রব্যগুণ ও কর্মাদি দ্বারা ইহাকে লাভ করিতে পারা যায় না ; একমাত্র হেতুশূন্যা ভক্তকৃপা অথবা ভগবৎ-কৃপালেশ দ্বারাই জীবহৃদয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। যথা,—

"মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।"

(শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্র। ৩৮)

অর্থাৎ,—ভক্তিলাভের মুখ্য কারণ হইতেছে মহৎকৃপা বা ভগবৎকৃপা-কণিকা।

মহৎ বা ভক্তকৃপা ও ভগবৎকৃপা, প্রেমভক্তি লাভের এই দুইটি মাত্র কারণ উক্ত হইলেও, এস্থলে ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্রভাবে কার্য না করিয়া ভক্তের ভিতর দিয়াই তাহার স্ফুরণ করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীভগবানের এই অস্বতন্ত্রতা—এই ভক্তাধীনতা, তিনি নিজ মুখেই

স্বীকার করিয়া তাঁহার অনন্ত গুণরাশির মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ,—সেই ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় ঘোষণা করিয়াছেন; যথা—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।"

—(শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩)

অর্থাৎ হে দ্বিজবর! আমি স্বাধীন হইয়াও ভক্ত-পরাধীন, আমি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের নিকট অস্বতন্ত্র। ইত্যাদি—

সাধু বা ভক্ত কিন্তু স্বতন্ত্রভাবেও কৃপা করিতে পারেন। তাঁহাদের এই যোগ্যতা ভক্তবৎসল শ্রীভগবানই তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; অতএব কাহাকেও ভক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তকৃপা—মহৎকৃপা— সাধুকৃপা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ভগবৎকৃপা হইতে যে প্রেমোদয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীভগবান ভক্তপরতন্ত্র বলিয়া তাহাও তদীয় প্রেরণায় ভক্তের ভিতর দিয়াই নিঃসৃত হয়; সুতরাং ভগবৎকৃপা হইতেই ভক্তি উৎপন্না হউন বা ভক্তকৃপা হইতেই ভক্তি উৎপন্না হউন, উহা একমাত্র সাধু ভক্তের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্ত ও ভগবান একাত্মা বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্ত-প্রদত্ত বা ভক্তের ভিতর দিয়া ভগবৎ-প্রদত্ত ভক্তির কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ॥

—(শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্র । ৪১)

তাৎপর্য—শ্রীভগবানে ও তদীয় ভক্তজনে কোন ভেদ না থাকায় সাধুর নিকট হইতে ভগবৎকৃপাভক্তিও প্রাপ্ত হইবার কোন বাধা নাই। অতএব মহৎকৃপাকেই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ বলিয়াই জানিতে হইবে। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে; যথা—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।" —(২।২২ কিম্বা)

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।" — (২।২২ ইত্যাদি।)

জীবকে ভক্তিদান করিবার অধিকার শ্রীভগবান একমাত্র সাধু-

ভক্তের হাতেই সমর্পণ করিয়াছেন। এমন কি, এ-বিষয়ে নিজ অধিকার-টুকু সাধুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, স্বতন্ত্র তিনি স্বেচ্ছায় এইরূপে ভক্ত-পরতন্ত্র হইয়া, নিজের ভক্তাধীনতা প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ভক্তজন-মাত্রেরই বরেণ্য ও সেবনীয় হইয়াছেন। মহৎকৃপার অপেক্ষা না করিয়া প্রেমভক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। আবার এতাদৃশী মহৎকৃপা—যাহা ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ হইতেছেন,—তাহাও অহৈতুকী অর্থাৎ হেতুশূন্যা হওয়ায়, মহৎকৃপা প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নাই। স্বাতী নক্ষত্রের জলের ন্যায় মহৎকৃপা কখন কিভাবে কাহার উপর পতিত হইয়া, প্রেমভক্তিরূপ গজমুক্তা বা মহামণির উদয় করেন, তাহার কোন স্থিরতা না থাকায়, জীবসাধারণের নিকট প্রেমভক্তি সুদুর্লভই হইতেছেন। এই কারণে শাস্ত্রও "সুদুর্লভা" বলিয়া ভক্তির একটি লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

"ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।" —ইত্যাদি

—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

মহৎকৃপা ভক্তিলাভের অমোঘ বা অব্যর্থ কারণ হইলেও আবার সেই মহৎসঙ্গ লাভ করাও কোন অনির্বচনীয় অতি ভাগ্যসাপেক্ষ ;—

"মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।"

— (শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্র। ৩৯)

অর্থাৎ, মহৎসঙ্গ ভক্তিলাভের পক্ষে অমোঘ হইলেও তাহা অগম্য ও দুর্লভ।

আবার ভক্তসঙ্গে ভক্তকৃপা দ্বারা প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও যে-ভক্ত যে-ভক্তিভাবের অধিকারী তদীয় কৃপা হইতে সেই প্রকার ভক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রেমভক্তিভাব প্রদানে তিনি সমর্থ হয়েন না। ভক্তি এক হইলেও ইহার ভাবগত তারতম্য আছে। যথা—

"তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম ॥" — (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৮)
বৈধী হইতে রাগভক্তি শ্রেষ্ঠতর ; রাগভক্তির মধ্যে আবার গোপী-অনুগত ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম শ্রেষ্ঠতর। ইহাই জীবের পূর্ণতম পুরুষার্থ। এই পূর্ণতম প্রেম যিনি নিজে প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল সেই প্রকার মহৎ-কৃপা হইতেই ইহা লভ্য হইতে পারে ; অন্যত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। যে সর্বোচ্চ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে, আবার এতাদৃশ মহত্তম ভক্ত, কৃপার একান্ত অপেক্ষা রহিয়াছে, সর্বসাধারণ জীবের পক্ষে সেই প্রেম, প্রাপ্তির মহা-সৌভাগ্য লাভ করিবার পথে যে কিরূপ অনিশ্চয়তা ও অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া উপলব্ধি করিবার বিষয়। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৯ অঃ)

সর্বশক্তির আশ্রয়— পূর্ণতম ভগবান যিনি, হ্লাদিনী মহাশক্তির পরম সাররূপা—সেই পূর্ণতমা ভক্তির একমাত্র তিনিই পূর্ণতম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান; অতএব পূর্ণতম প্রেম তাঁহারই অধিকারে—তাঁহারই আশ্রয়ে নিত্যই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের পূর্ণতম অধিকারী হইলেও, সেই প্রেমদান করিবার অধিকার, তিনি তদীয় ভক্তগণকে স্বেচ্ছায় অর্পণ করায়—ভক্ত-পরতন্ত্র ভগবান ভক্তকে অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎ ও স্বতন্ত্রভাবে জীবকে তাহা দান করেন না। ভক্তাধীনতা বশতঃ এই "দান না করা" তাঁহার পক্ষে দূষণ না হইয়া যে ভূষণস্বরূপই হইয়াছে, চিন্তাশীল ও ভাবগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা সহজেই অনুভব করিবেন।

বর্ষে একবার শ্রাবণের ধারার মত, জগতের বুকের উপর যে প্রেম-ধারা কল্পে একবার পরিপূর্ণরূপে পূর্ণতম শ্রীভগবান কর্তৃক বর্ষিত হইয়া থাকে, সেই কাল সমাগত জানিয়া জীবের প্রতি অনন্ত করুণায় আপ্লুত

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে সমুদিত হইলেন। প্রাণের একান্ত ইচ্ছা, প্রাণ-ভরিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমষ্টিকে যোগ্যাযোগ্য নির্বিচারে পূর্ণতম প্রেম-ভক্তি নিজ হাতে বিলাইবেন। কিন্তু সর্বাশ্রয়— সর্বসেব্য— সর্বা-রাধ্য— স্বয়ং ভগবান তিনি,— পূর্ণতম ভগবত্তায় সমুজ্জ্বলিত শ্রীবিগ্রহ তাঁহার,—সেখানে ভক্তভাব— সেবক ভাবের স্থান নাই; "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।" (১।৫ অঃ) সুতরাং পূর্ণতম প্রেমের তিনি শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় বা অধিকারী হইলেও তদবস্থায় তাহা দানের অধিকারী নহেন; যেহেতু স্বেচ্ছাময় তিনি, তাই স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া নিজেরই সে ক্ষমতা নিজ ভক্তে অর্পণ করিয়াছেন। প্রেমময় তিনি, তাই আজ সর্বজীবকে নিজপ্রেম দান করিবার পূর্ণ প্রয়াস প্রাণে জাগিয়া উঠিলেও, দান করিতে গিয়া, আজ সেই ভক্তা-পেক্ষাই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে। নিজ প্রাণ হইতে প্রিয়-তর ভক্তগণকে, যাহা দান করিবার একমাত্র ক্ষমতা তিনি সানন্দে সমর্পণ করিয়াছেন, আজ আবার সেই ভক্তগণকে অতিক্রম করিয়া, সেই ভক্তিদানের অধিকার কি প্রকারে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন? তাই একদিকে ভক্তমর্যাদা— ভক্তাধিকার রক্ষা আর অন্য দিকে সুদুর্লভা ভক্তিকে একবার সর্বজীবলভ্য করিয়া দিবার ব্যাকুল প্রয়াস— এই উভয় সমস্যার সন্ধিস্থলে, আজ শ্রীভগবানকে আসিয়া দাঁড়াইতেহ ইয়াছে। সমস্যা সুকঠিন হইলেও সর্বজ্ঞ-শিরোমণি তিনি,— এ সমস্যা সমাধান করিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় না। ভক্তবশ ভগবান ভক্তের মহিমা— ভক্ত-মর্যাদা যে অতিক্রম করিবেন না, ইহা স্থির; কিন্তু সাধারণ কালে, যে সুদুর্লভ মহৎ-কৃপাদ্বারা জীববিশেষে যে ভাবে ভক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, আজ এই অসাধারণ সময় বিশেষে— এই কৃপাবিশেষ বিতরণের দিনে, উহা সে প্রণালীতে প্রদত্ত হইলে, শ্রীভগবানের একযোগে এই সর্বজীবোদ্ধার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে পারে না। উভয় সমস্যা পূরণ করিতে, তাই কি যেন ভাবিয়া, সেই ভব-

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেমবারি—যাহা গোলোকের নিভৃত ভাণ্ডার হইতে ভূলোকের জীব-সমষ্টির জন্য বহিয়া আনিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বের স্থান বিশেষে অতি সংগোপনে ও সন্তর্পণে সুরক্ষিত করিয়া, কিয়ৎকালের জন্য লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন ; উদ্দেশ্য এই যে, নিজ সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপটি যদি ভক্তভাব দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ভক্তরূপে আসিতে পারেন, ভক্তের যে প্রেমদান অধিকার,—তিনি স্বয়ংই সেই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রাণের সাধ মিটাইয়া সর্বত্র—সর্বজীবকে অবাধে সেই প্রেমভক্তি দান করিতে পারেন ; ইহার জন্য অপর মহৎকৃপার অপেক্ষা না করিয়াও তিনি স্বয়ংই তাহা প্রদান করিলে একমাত্র ভক্তেরই যে ভক্তিদানাধিকার— তাহা অক্ষুন্নই থাকে ; যেহেতু তখন তিনি কেবল ভগবানই নহেন,— তখন ভক্ত-ভগবান। কেবল ভগবৎ-স্বরূপে সাক্ষাৎভাবে ভক্তিদানের যে অন্তরায়, ভগবান নিজে ভক্ত হইলে তখন ভক্তি দান করিবার পক্ষে আর সে অন্তরায় থাকিতে পারে না। এইরূপে তাঁহার প্রকটকালের স্থাবর জঙ্গম নির্বিশেষে সর্বজীবকে প্রেমদানে উদ্ধার করিবার জন্য, নিজ পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপকে পূর্ণতম ভক্তভাব ও কান্তিদ্বারা আবৃত করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে নদীয়া নগরে সমুদিত হইলেন। শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু। নিখিল ভক্ত-শিরোমণি শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত বলিয়া যে কোন ভক্তিভাব বিলাইবার পক্ষে এখন তিনি শ্রেষ্ঠতম অধিকারী ; তাই—

"ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥" — (শ্রীচৈঃচঃ)

এখন যে-কোন ভক্তিভাব যে-কোন জীবকে বিতরণ করিতে আর কোন বাধা রহিল না— আর কাহারও অপেক্ষা রহিল না ; এখন—

"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান ॥" — (শ্রীচৈঃচঃ)

স্বয়ং ভগবান কেবল নিজেই যে ভক্তরূপে আসিয়াছেন তাহা নহে, নিজ শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ-তত্ত্ব ও স্বাংশ-তত্ত্বকেও ভক্তভাবে নিজ প্রেমদান কার্যের প্রধান সহায়করূপে আনিয়াছেন, তৎসহ নিজ স্বরূপশক্তিবর্গ ও অসংখ্য ভক্তগণ ত' নিত্যসঙ্গী রহিয়াছেনই; সুতরাং সমগ্র জীবজগৎ আজ ভক্তকৃপায় পূর্ণ হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, এমনতর ভক্ত-কৃপার সুলভতা কল্পের মধ্যে আর কখনও হয় নাই। আজ— ভক্তকৃপা-সিন্ধুর মহাপ্লাবনে যেন সারা জগৎ প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণতম শ্রীভগবান আজ ভক্তরূপে পূর্ণতম কৃপাসম্ভার হস্তে লইয়া মহাবদান্য-মূর্তিতে দাঁড়াইয়া, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে, তাঁহারই অভিন্নাত্মা ও নিত্য পার্ষদ যাঁহারা তাঁহারাও আজ সকলেই ভক্তভাবে বিভাবিত, সকলেই বিশ্বব্যাপী এই বিরাট প্রেমদান কার্যের সহায়রূপে প্রভুর আনন্দ বর্ধন করিতেছেন। সুদুর্লভ "ভক্তকৃপা" সুলভ হইতে অতি সুলভ করিয়া দিয়া, সর্বজীবোদ্ধারে বদ্ধপরিকর সেই শ্রীকৃষ্ণই আজ ভক্তভাব অঙ্গী-কার পূর্বক সপরিকর পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রেম বিতরণ করিয়া ফিরিতে-ছেন। তাই আজ—

"মাগে বা না মাগে কেহো পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাই, জানে দিব মাত্র॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ)

সপার্ষদে এইরূপ ভক্তভাবে প্রেমভক্তি বিতরণ চলিতেছে। যে প্রেম তিনি আজ বিশ্ব ভরিয়া দান করিতে আনিয়াছেন, তাহা যে-ভাবেই হউক দিয়া যাইবেন— ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। এমন অসীম করুণা ও শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ লইয়া, এমন গম্ভীর — এমন উদার কেহ, কল্পের মধ্যে আর কখনও জীবজগতের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন নাই। পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপে পূর্ণতম ভক্ত-ভাবের সংমিশ্রণ ব্যতীত, তদীয় চরণরেণুস্পৃষ্ট বসুন্ধরার সর্বজীবকে তৎকালে প্রেমভক্তি দানে একযোগে উদ্ধার করা,— সংসারাবদ্ধ

জীবের প্রতি এরূপ পূর্ণতম কৃপার বিস্তার অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ দ্বারা যে কেন সম্ভব হয় না, ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিবেন। ইহা যেমন শাস্ত্র-সিদ্ধ তেমনি যুক্তি-সিদ্ধ। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ তিনি— তাই কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক তদীয় প্রকট লীলাকালে জীবজগতে এরূপ বিরাট দান সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের সীমা হইলেও তদীয় শ্রীশ্যামসুন্দর ভাব হইতে শ্রীগৌরসুন্দর ভাবে, "প্রেম বিলাস-বিবর্ত্ত" বা প্রেয়সী-প্রধানা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তির দ্বারা পরস্পর একীভূত হওয়ায় কেবল ভাবের উৎকর্ষতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীকার করিতে হয়,—

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

— (শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।৩)

অর্থাৎ,— চৈতন্য কৃষ্ণ হইতে জগতে পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।

উক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জলধি ও জলধরের স্বভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা উহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে অনুপম শ্রীগৌরলীলার কোন উপমাই পূর্ণরূপে সার্থক হইবার নহে; প্রাকৃত দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত তত্ত্বের আংশিক অনুভব হইতে পারে মাত্র, কিন্তু সর্বাংশে মিলন অসম্ভব।

যেমন বসুন্ধরাকে সরস ও সিক্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমুদ্রই প্রধান কারণ হইলেও কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত না হইয়া ঠিক নিজ ভাবে থাকিয়াই সমুদ্রের পক্ষে পৃথিবী সেচন কার্য সম্ভব হয় না, সেইরূপ জগতকে পরিপূর্ণরূপে প্রেমধারা বর্ষনে সঞ্জীবিত করিবার পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-জলধিই পূর্ণতম কারণ হইলেও, কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত না হইয়া,— ঠিক নিজ পূর্ণতম ভগবৎ ভাবে থাকিয়াই তাহা সম্ভব হয় না।

সিন্ধু যেমন নিজ বাষ্পভাব বহুল বারিদাকারে ভাবান্তরিত হইয়াই সর্বজগতে বারিধারা বর্ষণ করিবার উপযোগী হয়, সেইরূপ শ্যাম-সিন্ধু, নিজ বাষ্পময়ী— প্রেমাশ্রুময়ী শ্রীরাধিকার ভাববহুল

গৌর-বারিদাকারে ভাবান্তরিত হইয়া, জীব-জগতে পূর্ণরূপে প্রেমবারি বর্ষণ করিবার উপযোগী হইয়া থাকেন।

নিজ ভাবে অবস্থান কালে সিন্ধুর নিকট লবণাক্ত জলই অধিক রূপে পাওয়া যাইলেও, সেই সিন্ধুই আবার বারিদরূপে যেমন মধুর বারি দান করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্যাম-সিন্ধু হইতে লবণাক্ত ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সহজলভ্য ও প্রেমামৃত দুর্লভ হইলেও (মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং) পরমাস্বাদ্য ব্রজপ্রেমামৃত-রূপ, জীব-চাতকের শ্রেষ্ঠতম পানীয় যাহা, তাহা কেবল গৌর-বারিদের উদয়ে ও তদানুগত্যেই বহুলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জলধর জলধিরই রূপান্তর হইলেও, জলধরই যেমন বাষ্পভাব ও বিজলী-প্রভা একীভূত হইয়া বহুলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীগৌর-জলধরে বাষ্পময়ী শ্রীরাধিকার ভাব ও বিদ্যুৎবরণা শ্রীরাধিকার কান্তি একত্রে বিমিশ্রিত হইয়া তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে; ("গৌরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া গৌরাঙ্গী সরস ভেল।") সৌদামিনী স্ফুরণে যেমন জলধরের শ্যামলিমা অত্যুজ্জ্বল তড়িতালোকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ তড়িৎ-বরণা শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীশ্যামল-সিন্ধু, শ্রীগৌর-বারিদরূপে জগদাকাশে উদয় হইলেও, নিজ কান্তাভাবের আধিক্য বশতঃ সৌদামিনী হইতেও সুন্দর রাধাকান্তি দ্বারা বিমণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়ায়, নিজ শ্যামল বারিদ বরণ ভিতরে ও কান্তার তড়িৎকান্তি বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর, কোনও এক স্থিরা দামিনী-বেষ্টিত মেঘমালা হইতেও মনোরম— শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভক্তোত্তম শ্রীরায় রামানন্দের দর্শনেও ইহাই প্রতিভাত হইয়াছিল। যথা,—

"তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৮)

জলধিই যেমন স্বীয় বাষ্পশক্তিবহুল জলধররূপে ভাবান্তরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীশ্যাম-জলধি যখন নিজ হ্লাদিনীশক্তি-বহুল সর্বভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবান্তরিত হয়েন, তখন শ্রীগৌর-জলধরের আবির্ভাব হয়। জলধি ও জলধর অভিন্ন-স্বরূপ হইলেও জলধর জলধিরই সূক্ষ্মতম ভাব, তেমনি এক ও অভিন্ন-স্বরূপ হইলেও শ্রীগৌর-জলধর শ্রীশ্যাম-জলধিরই নিগূঢ়তম ভাববিশেষ। আবার এক হইয়াও জলধি এবং জলধর যেমন পৃথকভাবে সমকালেই অবস্থিত, তেমনি অভিন্ন-স্বরূপ হইয়াও শ্রীশ্যামসুন্দরভাবে ও শ্রীগৌরসুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণ, সমকালে ও সর্বকালে লীলাপরায়ণ।

খণ্ডিত মেঘবিশেষে ক্বচিৎ কখন স্থানবিশেষে বারিধারা বর্ষিত হইলেও, জগতকে প্রতি বর্ষে একবার সম্যকরূপে পরিসিক্ত করিবার পক্ষে যেমন বর্ষাঋতুর সমাগমেই তাহা সহজ ও সম্ভবপর হয়, তেমনি ভক্তরূপ খণ্ডিত মেঘদ্বারা ক্বচিৎ কখন ব্যক্তিবিশেষে ভক্তিবারি বর্ষিত হইলেও, প্রতি কল্পে একবার— একযোগে এক ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবকে প্রেমভক্তিসলিলে পূর্ণরূপে সিঞ্চিত করিতে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় জগদাকাশে অখণ্ড গৌর-জলধরের উদয়েই সহজ ও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সূর্য মহাকাশে নিরন্তর উদীয়মান থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে তাহার উদয় ও অস্তরূপ পরিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলা ব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টির উপর নিত্য বিরাজমানা হইয়াও ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট ও অপ্রকটরূপে প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জগতোদ্ধার কার্যের দুইটি প্রধানতম কারণের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণটি অর্থাৎ (১) "ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই হেতুটি যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, উক্ত বিরাট কার্যের পক্ষে তাহা যে কতদূর সুসঙ্গত, যুক্তি দ্বারাও আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। অতঃপর দ্বিতীয়

কারণটির বিষয় যাহা উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ (২) "উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার"— এই হেতুটিও উক্ত বিশ্বোদ্ধার-কার্যের পক্ষে যে কতদূর যুক্তিযুক্ত এখন আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব; বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় কারণটির ভিতর, বর্তমান রেডিও (Radio) বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রচার সংবাদ যে অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এখন আর একটি সংশয় হইতে পারে এই যে, বুঝিলাম শ্রীভগবান ভক্তভাব অঙ্গীকার করায়, ভক্তের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, নিজ ইচ্ছামত ও অবাধে তাঁহার প্রকটকালের সর্বজীবকে নিজেই প্রেমদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু জলধর যেমন সমস্ত জগদাকাশে পরিব্যাপ্ত না হইয়া সর্বজগতের উপর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পূর্বদৃষ্টান্ত বর্ণিত জলধরস্থানীয় শ্রীগৌরসুন্দর, তত্ত্বতঃ বিভু বা সর্বব্যাপী হইলেও, লীলায় যখন তাঁহাকে এক বা নিজপরিবার সহ কেবল ভারতবর্ষের স্থানবিশেষেই শুভ গমনাগমন করিতে দেখা যায় ও কেবল তত্রস্থ জীবগণ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানীয় ও অবশিষ্ট জগতের জীবসমূহকে নাম-প্রেম বিতরণ পূর্বক উদ্ধারসাধন কার্য, লীলায় যখন পরিদৃষ্ট হয় না, তখন তৎকর্তৃক সর্ব-জগতোদ্ধার কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে? অবশ্য ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তি-মান্ তিনি,— ইচ্ছার আভাস মাত্রেই, তিনি একস্থানে থাকিয়াও, সকল স্থানের সকল কার্যই নিমেষ মধ্যে, সংঘটিত করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে লীলামাধুর্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া কেবল ঐশ্বর্যের প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং লীলার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের সর্বোত্তম লীলাসকল মাধুর্যময় অর্থাৎ "নরলীলার হয় অনুরূপ।" পূর্ণৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের যে মনুষ্যভাব ও মানবোচিত আচরণ, তাহারই নাম "মাধুর্য"। "মাধুর্য" বা ভগবানের মনুষ্যভাব তদীয় "ঐশ্বর্য" বা কেবল ঈশ্বরভাব

হইতেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মণি-রত্নাদি খচিত মনোরম কোষমধ্যে আবদ্ধ অত্যুজ্জ্বল তরবারির ন্যায়, পূর্ণৈশ্বর্য শ্রীভগবানের মাধুর্যভাবের মধ্যেই আচ্ছাদিত জানিতে হইবে। ঐ মাধুর্য কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নরভাব ও নরোচিত আচরণ-কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নরভাব অতিক্রান্ত হইয়া যখন ঈশ্বরভাবের প্রকাশ হয়, সেই ঐশ্বর্যস্বভাব তদীয় মাধুর্য-ভাব হইতে ন্যূন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভগবানের মাধুর্য লক্ষণ বিষয়ে মহানুভব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্।"

— অর্থাৎ, যেস্থলে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য প্রকাশে বা অপ্রকাশে মনুষ্য-লীলার ব্যতিক্রম হয় না, তাহার নাম মাধুর্য। ইহার দৃষ্টান্ত ঃ—

যেমন ব্রজলীলায়, পূতনার প্রাণহরণরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশকালেও স্তন্যপানরূপ নরশিশুভাবের অনতিক্রম। যেমন মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা বন্ধনের অশক্যরূপ মহৈশ্বর্য প্রকাশকালেও জননীর ভয়ে বিকলতারূপ নরবালকোচিত ভাবের অনতিক্রম। আবার ঐশ্বর্য থাকিলেও তদপ্রকাশকালে যে কেবল মনুষ্যোচিত ভাব তাহাও মাধুর্য— যেমন দধি দুগ্ধাদি চৌর্য, গোবৎসচারণ প্রভৃতি। অতএব শ্রীভগবানের পক্ষে একস্থানে অবস্থান করিয়াও জগতের সর্বস্থানে সকল জীবকে নামপ্রেম বিতরণ করা তদীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অসম্ভব না হইলেও, ঐরূপ আচরণে মাধুর্য বা মনুষ্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া কেবল ঐশ্বর্য ভাবেরই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এই জন্য ঐশ্বর্য হইতে শ্রেষ্ঠ যে ভগবানের মাধুর্যভাব, তাহার সংরক্ষণ জন্য, এইরূপ কার্যে তাঁহার পক্ষেও মানবোচিত কোনও শ্রেষ্ঠতম উপায় অবশ্যই অবলম্বনীয় হইয়া উঠে; কিন্তু তদীয় লীলাকালে যখন পৃথিবীর সর্বত্র— সকল জীব সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নামপ্রেম প্রদান করিতে দেখা যায় নাই, তখন মাধুর্যভাব সংরক্ষণ পূর্বক সর্বজগতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বারিদ কর্তৃক প্রেমবিতরণ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, বর্তমান শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক মানবগণ কর্তৃক যেরূপ শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতে পারিত, চারিশতাধিক বর্ষ পূর্বে, এই জগতের স্থাবর জঙ্গম নির্বিশেষে সর্বজীবকে প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতম কারণ যাহা, সেই শ্রীহরিনাম বিতরণ করিবার জন্য, সর্বজ্ঞ ও সর্ববিজ্ঞান-ময় পুরুষ, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক সেই মানবোচিত শ্রেষ্ঠতম প্রণালীই সূক্ষ্মভাবে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যভাবের আশ্রয় লইয়া তাঁহার জগতোদ্ধার-কার্য সম্পাদন করেন নাই, শুদ্ধ মাধুর্যভাবেই, অর্থাৎ পরমেশ্বরের মনুষ্যোচিত লীলা দ্বারাই যে তাহা সুসম্পাদিত হইয়াছে, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তদীয় উদ্ভাবিত মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে তদীয় প্রবর্তিত উচ্চ সংকীর্তন সেই বিজ্ঞান বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) 'উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার।'—

বর্তমান সময়ে— বিজ্ঞানের এই উন্নততম শতাব্দীতে, যদি কোনও একটি শব্দ বা কথা, জগতের সকল জীবকে একযোগে শ্রবণ করাইবার প্রয়োজন হয়, তবে একমাত্র বেতার বার্তার (Radio)-র সাহায্যেই যে সে-কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে, একথা বেতার বিজ্ঞানের (Wireless) আবিষ্কারের পর, এখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি; সুতরাং বেতার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক প্রকার আলোচনা করিয়া বুঝাইতে অসমর্থ। এ বিষয়ে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই যে, কোনও জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা হইতে যেমন মণ্ডলাকার তরঙ্গ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে জলাশয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত ধাবিত হয়, সেইরূপ কোনও একটি ধ্বনি বা কোনও শব্দ উচ্চারিত হইলে, তাহা প্রথমে তৎস্থানীয় আকাশকে তরঙ্গায়িত করিয়া, আকাশতরঙ্গ-বাহিত সেই শব্দ, মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে সীমান্তের দিকে ধাবিত হইয়া সেই তরঙ্গমণ্ডল আবার

আকাশবক্ষেই ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায়। আকাশস্থিত শব্দতরঙ্গ যতদূর সুস্পষ্ট থাকে ততদূর পর্যন্ত সেই শব্দ বা বার্তা গ্রহণযোগ্য যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে (Receiver) শ্রুতি-গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাধারণ ধ্বনি বা উচ্চারিত শব্দ-তরঙ্গ স্পষ্টাকারে অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও অবশেষে বিলীন হইয়া যায়; সেইজন্য বর্তমান উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিশেষ দ্বারা প্রথমে লঘু শব্দসকলের গুরুত্ব সম্পাদন পূর্বক (Broadcast) প্রেরণযোগ্য যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা (Transmitter) সেই বার্তা প্রেরিত হইয়া তাহার তরঙ্গমণ্ডল বহু দূরগামী হইয়া থাকে। ইহাই বেতার বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত মূলকথা।

কোনও একটি ধ্বনি বা বার্তা দূরস্থিত জীবগণের শ্রবণ-গ্রাহ্য করিবার পক্ষে বর্তমান আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রসকলের আবশ্যকতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু যন্ত্রাদির ব্যবহার না হইলেও, সাধারণভাবে উচ্চারিত শব্দ বা ধ্বনিসকল আকাশ-গাত্রে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গমণ্ডল অধিক দূর গমন করিবার পূর্বেই বিলীন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থা হইতে তাহা সূক্ষ্মাকারে— অব্যক্তভাবে আকাশ-বক্ষে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মাকারে প্রবাহিত এই সকল অব্যক্ত শব্দতরঙ্গ শ্রবণযোগ্য না হইলেও উহার একটা অজ্ঞাত স্পর্শ, সকল পদার্থই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবন্নামের মহিমাদির সম্বন্ধে অবগত যাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হইবে যে, শ্রীভগবন্নাম কেবল যে কীর্তিত হইলেই তাহার অচিন্ত্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন, তাহা নহে, উহা শ্রবণে বা স্মরণেও সেই শক্তিই প্রকাশ করেন; এমন কি ভগবন্নাম ধ্বনিত হইয়া সেই ধ্বনির সংস্পর্শ ঘটিলেও ইহাতে নামের প্রভাব প্রতিহত হয় না। অতএব পৃথিবীর সমস্ত জীবকে অন্য কোনও বার্তা প্রদান করিতে হইলে, বর্তমান উদ্ভাবিত বেতার বার্তা প্রেরণের

আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত তাহার কোনই সার্থকতা হইত না ; কিন্তু নাম-ধ্বনিত আকাশতরঙ্গ অব্যক্তভাবে— সূক্ষ্মতম আকারেও প্রবাহিত হইয়া অজানিত ভাবে তাহার সংস্পর্শ ঘটিলেও, সেই নামধ্বনি সার্থকতামণ্ডিত হইয়া থাকে। জগতের অপর সমুদয় শব্দ বা ধ্বনি হইতে শ্রীভগবন্নাম শব্দের ইহাই মহান বৈশিষ্ট্য।

স্বভাবতঃ শ্রীহরিনামের এতাদৃশ প্রভাব হইলেও নামাপরাধাদি অনর্থের সংযোগ ঘটিলে, সেই সকল অপরাধগ্রস্ত জীবের প্রতি নামের অপ্রসন্নতা নিবন্ধন নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া সহজসাধ্য হয় না ; কিন্তু কল্পের মধ্যে একবার যখন সেই পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপ পূর্ণতম ভক্তভাব বিভাবিত হইয়া জগতে প্রকট হয়েন, তাঁহার সেই পুণ্যতম প্রকটকালে, (অন্য কোন সময়ে নহে) নামাপরাধেরও বিচার থাকে না। তদীয় শ্রীমুখাব্জ-বিনির্গত "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ধ্বনি, যে-কোন ভাবে শ্রুত বা তৎস্পন্দিত আকাশ-তরঙ্গের সূক্ষ্ম সংস্পর্শ ঘটিলেও সেই মণ্ডলাকার নামপ্রবাহের অব্যক্ত আলিঙ্গনে, স্থাবর জঙ্গম নির্বিশেষে সর্বজীবোদ্ধার সংসিদ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভগবান স্বয়ং সর্বত্র না যাইলেও, আকাশ-তরঙ্গে নামধ্বনি প্রেরণ পূর্বক, পৃথিবীর সর্বজীবকে তাহার মঙ্গল স্পর্শ প্রদান করিবার জন্য, মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; সুতরাং অখণ্ড জলধরের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্তৃক একযোগে জগতের সর্বত্র— সর্বজীবকে উদ্ধারের কারণ-স্বরূপ নাম-প্রেম বিতরণ কথা যুক্তিদ্বারাও সম্ভাবিত হইতেছে। সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক বেতার বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া, তাহার সহায়তায়, তদীয় নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য যে সংসিদ্ধ হইয়াছিল, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথোপকথন প্রসঙ্গে তাহার আভাস পাওয়া যায়। জীব-জগতের এই নিগূঢ় মহাভাগ্যের কথা জগতে প্রকাশ রাখিবার জন্য জগতোদ্ধার-ব্রত শ্রীগৌরসুন্দর হরি, ভক্তোত্তম শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে

কিছু ভঙ্গিমা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥" (৩।৩)

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্ন হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি কেবল ভারতবর্ষের কতিপয় স্থানের কতকগুলি জীবের উদ্ধার সাধন বিষয়েই চিন্তা করিয়াছেন তাহা নহে, পৃথিবীর সমস্ত জীবের উদ্ধার সাধন নিমিত্ত তাঁহার প্রেমময় সকরুণ হৃদয় ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়াছিল ; — সমষ্টি জীবোদ্ধারই তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় ছিল।]

তদুত্তরে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিবেদন করিলেন, —

"..... যাতে সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি করিয়াছ যাতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ে ত শ্রবণ ॥" (৩।৩)

তাৎপর্য— "আগে করিয়াছ নিস্তার" পূর্বেই উদ্ধারের কারণ বিধান করিয়াছ এই কথোপকথন শ্রীক্ষেত্রে হইতেছে ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, "আগে"="পূর্ব্বে" ; অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভৃতি স্থলে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া, নবোদ্ভাবিত মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে তিনি যে উচ্চ সঙ্কীর্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই স্থাবর জঙ্গম সমূহের নাম-শ্রবণকার্য পূর্বেই সুসিদ্ধ হইয়াছে ; অর্থাৎ নামশ্রবণের যাহা ফল,— নাম-ধ্বনি আকাশ-তরঙ্গের সংস্পর্শেও, স্থাবর জঙ্গম সেই ফল পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

"শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয় ॥"

তাৎপর্য— জঙ্গম— যাহারা শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট, শ্রীহরিনাম শ্রবণে তাহাদের সংসারবন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে ; স্থাবর জীব যাহারা, শ্রবণের পরিবর্তে শ্রীহরিনামের শব্দতরঙ্গ, তাহাদের দেহে স্পর্শিত হইলেও

সেই শ্রবণের ফলই লাভ হইয়া থাকে। নাম শ্রবণ ও নাম শব্দের স্পর্শ উভয়েরই সমফল বিধায়, নামধ্বনির সংস্পর্শ দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েরই সেই ফল লাভ হয়। "শব্দ শোনা" এইরূপ উক্তিই প্রসিদ্ধ, "শব্দ লাগে" এইরূপ অপ্রসিদ্ধ উক্তি দ্বারা শ্রীহরিনাম-ধ্বনিত আকাশ-তরঙ্গের সংস্পর্শের কথাই সূচিত হইয়াছে। "প্রতিধ্বনি" শব্দটি এই স্থলে "প্রত্যাবর্তিত ধ্বনি" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। নামকীর্তন হইতে সমুত্থিত যে আকাশ-স্পন্দন,— এই "প্রতিধ্বনি" শব্দের তাহাই উদ্দেশ্য। উচ্চারিত শব্দ কোন পদার্থবিশেষে প্রতিহত হইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনরূপ যে সুপ্রসিদ্ধ প্রতিধ্বনি (echo) ইহা যে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, পরবর্তী উক্তিতে তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৎকালে আকাশের শব্দ-তরঙ্গকে এক কথায় প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কোন শব্দ না থাকায়, "প্রতিধ্বনি হয়", "শব্দ লাগে" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই সেই অভিনব বেতার-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বটি প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বর্তমান আবিষ্কৃত রেডিও বিজ্ঞানের প্রকাশ উদ্দেশ্যে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার অনেক শব্দ সম্ভবতঃ পূর্বেকার অভিধানে পরিদৃষ্ট না হইবারই কথা। এ স্থলে তদ্রূপ জানিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহাতে উক্ত বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে ঃ—

"সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥" (৩।৩)

তাৎপর্য,— ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের গৃহাদিতে পূর্বে সর্বরাত্রি ব্যাপী যে উচ্চ সঙ্কীর্তন হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে নবদ্বীপের স্থানবিশেষেই শ্রুত হইবার কথা ; কিন্তু তাহাতে "সকল জগতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন হওয়া" কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? অথচ "সকল জগত" কথাটি স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ-কথার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীবাস-ভবনাদিতে

সে সময় উচ্চ সঙ্কীর্তন হইতেছে, সেই সঙ্কীর্তন-ধ্বনি আকাশকে প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, আকাশ-তরঙ্গরূপে— ব্যক্তভাবে না হউক সূক্ষ্মাকারেও সর্বজগতে ব্যাপ্ত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিশেষ দ্বারা তাহা যথারীতি প্রেরিত হইলে ও যন্ত্রবিশেষ সাহায্যে তাহা গৃহীত হইলে সকল জগতে উচ্চ সঙ্কীর্তনই শ্রবণগোচর হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কথা বা গল্পাদি হইলে তাহা কথা বা গল্পাকারেই শ্রবণগোচর হইত। উচ্চ সঙ্কীর্তন দ্বারা, সকল জগতে অব্যক্তভাবে —সূক্ষ্মাকারে উচ্চ সঙ্কীর্তনই হইয়াছে, তবে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে শ্রবণগোচর না হইলেও শ্রীভগবন্নামকীর্তন বলিয়া ইহার শব্দ না শুনিয়া "শব্দ লাগা" তেও শ্রবণের ফলই লাভ হইয়া তাহাতেই জীবের সংসার-পাশমুক্ত হইবার কারণ হইয়াছে। অতএব উচ্চ সঙ্কীর্তন স্পন্দিত আকাশবাহিত সূক্ষ্মাকার সঙ্কীর্তন বার্তাকেই উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন, —

"সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥"

—ইহা বাহ্য দৃষ্টির কথা নহে,— অন্তর্দৃষ্টির বিষয়। স্থাবর জঙ্গম নির্বিশেষে সর্বজীবের উদ্ধার প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে; সুতরাং ইহা দেহ সম্বন্ধীয় নহে, দেহাতিরিক্ত চিৎকণ জীবাত্মার সংসার-পাশ-মুক্তি প্রসঙ্গেই বুঝিতে হইবে। সংসার-মুক্তির মহামন্ত্র-স্বরূপ সেই অব্যক্ত বা সূক্ষ্মাকার শ্রীভগবন্নাম-ধ্বনি স্থূলকর্ণে শ্রবণগোচর না হইলেও, চিন্ময় ভগবন্নাম, চিন্ময় আত্মার স্বজাতীয় বিষয় বলিয়া আত্মার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। জীবাত্মার স্বরূপভাব যে প্রেমভক্তি, তৎপ্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ নামামৃতের সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে-সময়কার সর্বজীবের অন্তরাত্মা উৎফুল্লিত ও আনন্দে নৃত্যপরায়ণ হইয়াছিল; ইহা তর্ক ও বিচারাদির বিষয় নহে,— কেবল কৃপা ও সাধন-গ্রাহ্য বিষয়।

উক্ত বিষয়গুলি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বর্তমান

আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞানের কথা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। ভগবন্নাম-মহিমার অনুরূপ তৎপ্রচার উদ্দেশ্যে যতটুকু ব্যবহার প্রয়োজনীয়,— বেতার-বিজ্ঞানের সেই মূল নীতি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বেতার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই বিষয় নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার বিনীত অনুরোধ। ইহার সহিত আর একটি কথাও বিশেষভাবে চিন্তনীয় এই যে, আমাদের স্বদেশীয় কোন এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র মৃদঙ্গধ্বনিই "Perfect sound" অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ধ্বনি; অন্যান্য বাদ্য "Noise" অর্থাৎ শব্দ মাত্র; একথা সত্য হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত মৃদঙ্গ-বাদ্য আকাশ-তরঙ্গ উৎপাদন করিবার পক্ষে কি পরিমাণে উপযোগী ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পূর্বেকার কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান সময়েও এমন অনেক সুযোগ্য মৃদঙ্গ-বাদক আছেন, যাঁহারা মৃদঙ্গ হইতে সুস্পষ্টরূপে "হরে" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি শ্রীভগবন্নাম ধ্বনিত করিতে পারেন।

প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্বে আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যে দুইটি প্রধানতম কারণের বিদ্যমানতা ঘটিলে নির্বিশেষে জগতের জীবসমষ্টির উদ্ধার সাধন সম্ভব হয়, একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-ভগবানে সেই কারণ দুইটির সুস্পষ্টরূপে সংযোগ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কলিহত জীব প্রায়শঃ নামাপরাধগ্রস্ত; সুতরাং নামের অপ্রসন্নতা নিবন্ধন নামধ্বনির সংস্পর্শ মাত্রে বা অল্প নাম গ্রহণে নামাপরাধ মুক্ত হয় না; এইজন্য একান্তভাবে বহুল নাম গ্রহণের আবশ্যক হইয়া থাকে। নামাপরাধশূন্য জীবের পক্ষে যথা কথঞ্চিৎ নাম, যে কোনও ভাবে সংস্পৃষ্ট হইলেও নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভগবন্নামের ইহাই স্বাভাবিক শক্তি। পরমকারুণিক প্রেমদ

ভগবান শ্রীগৌরহরি, তদীয় প্রকটকালে নামাপরাধের বিচার পর্যন্ত না রাখিয়া অবাধে নাম-প্রেম দান করিয়াছেন। নামাপরাধ পর্যন্ত উপেক্ষা করা,— ইহা কেবল তদীয় প্রকটকালেই সম্ভব হইয়া থাকে বলিয়াই, নাম-ধ্বনিত আকাশ-তরঙ্গের অব্যক্ত স্পর্শমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও, অপরাধী ও নিরপরাধ নির্বিশেষে সর্ব জীবের পক্ষে উদ্ধার লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার অপ্রকট কালে বা অপর সকল সময়েই নামাপরাধের বিচার আছে। এই জন্যই তদীয় অপ্রকট কালের ভাবী জীবগণের সতর্কতা সম্পাদন নিমিত্তই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার লীলার মধ্যে গোপাল চাপাল, দেবানন্দ প্রভৃতির নামাপরাধ খণ্ডন করাইয়া লইয়া অতঃপর তাঁহাদের কৃপা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা বস্তুত তাঁহাদের জন্য নহে, ইহার যথার্থ উদ্দেশ্য ভাবী জীবগণের সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত, নচেৎ সমষ্টিজীব উদ্ধারের আয়োজনে ব্যষ্টিজীবের অপরাধ খণ্ডন-প্রসঙ্গ— ইহা অর্থ-শূন্য। মহাপ্রেমাবতারীর প্রকটের সঙ্গেই তৎকালীন জীবসমষ্টির উপর কৃপার অজস্রধারা বর্ষিত হইয়াছিল; সুতরাং জীববিশেষের নামাপরাধ খণ্ডন করা বা না করার কোন অপেক্ষা ছিল না; ইহা কেবল ভবিষ্যতের জীবগণের শিক্ষা ও সতর্কতার নিমিত্ত; অধিক কি, লীলাচ্ছলে নিজ জননীকেও নামাপরাধে সাবধান করাইয়া ভাবী জগতকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন; নচেৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-জননীর অপরাধ কল্পনা, ইহা সূর্যে শীতলতার ন্যায় অসম্ভব। অতএব এখন আমাদিগকে নামাপরাধ হইতে সাবধান হইয়াই নামাশ্রয় করিতে হইবে। (১)

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখন।"

— (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি আমাদের উদ্দেশেই সার্থক

(১) গ্রন্থকার-কৃত শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ) বা নামাপরাধ-দর্পণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হইলেও, যে সুযোগ চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর সহজে ফিরিবার নহে। তথাপি শ্রীগৌর-প্রকটিত এই কলিযুগের জীব আমরা,— আমাদের এখনও এমন কোনও সুযোগ রহিয়াছে, যাহা প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য, সত্যাদি যুগের জীবগণও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখনও যদি আমরা পূর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরহরির বিতরিত শ্রীভগবন্নাম নিরপরাধে গ্রহণ করিতে পারি, তবে ব্রহ্মাদিরও দুষ্প্রাপ্য প্রেম-মহাসম্পদ এখনও আমাদের করতলস্থ হইতে পারে; তবে চাই তাহার সহিত শ্রীগৌর-অনুগতি। কলিগ্রস্ত জীবের প্রতি যাঁহার এতাদৃশ অপার অপরিসীম করুণার বিস্তার,— তিনি ছাড়া কলিজীবের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা আর কেহ-ই হইতে পারে না। তদীয় আনুগত্যে ভজন না করিলে প্রতিকল্পে যাহা একবার মাত্র বিতরিত হয়— সেই শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। অতএব আমাদিগকে সর্বদা সর্বভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়-পাদসেবাং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

॥ সমাপ্ত ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
দশম বর্ষ— ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল।

শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা

বা

প্রেম-যুগের অভ্যুদয়

শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা জয়যুক্ত হউন! ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুভ অবির্ভাব তিথি। কল্পের মধ্যে যত দিন আছে — যত স্মরণীয় দিন হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল দিনগুলির মধ্যে, ইহাই শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় ও পূজনীয় দিন। শ্রেষ্ঠতম 'পুরুষার্থ' এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের মধ্যে অজস্রভাবে দান করিবার সূচনা, পূর্ণতম ভগবান এই দিন স্বয়ং আসিয়া করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহার চেয়ে শুভদিন কল্পের মধ্যে আর কি হইতে পারে? অপর আর একটি দিন— যে দিবসে এই একই পূর্ণতম ভগবান শ্রীমথুরা মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের পবিত্র পদরজ যে দিবসে আমাদের এই পুণ্যময়ী বসুন্ধরা এমনি ধারাই বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন,— স্বীকার করিতেই হইবে, ফাল্গুনী পূর্ণিমার মত সেই দিনটিও শ্রেষ্ঠতম গৌরবমণ্ডিত। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা— এই দুইটি তিথিই তত্ত্বতঃ এক। সুতরাং শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় দিন হইলেও, জীবের সৌভাগ্যের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-দিবস হইতেও শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব দিনটিকে নিশ্চয় অধিক বড় বলিয়া মনে করিতে পারি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ধরাধামে প্রকট হইয়া, যাহা পরম পুরুষার্থ, সেই সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেমরস যে কি বস্তু তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা যথা তথা অবাধে দান করেন নাই; — "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং।" (শ্রীভাঃ ৫।৬।১৮) অর্থাৎ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া॥

(শ্রীচৈঃ চঃ। আদি, ৮।১৮)

কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে কলির প্রথম সন্ধ্যায়, এই ধরাধামে প্রকট হইয়া নিজ ভাববিশেষ আস্বাদনের সহিত, সেই উজ্জ্বল প্রেমসুধা— সেই ব্রজের মাধুর্য-প্রেমরস অজস্র ধারায় কলিগ্রস্ত জীবকে দান করিয়াছেন, যাহা এই বর্তমান কল্পের মধ্যে অপর কোনও অবতার বা অন্য কাহা কর্তৃক কখনও বিতরিত হয় নাই। যথা,—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমাধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্য স্বয়ং তৎ-
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

— (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত —৩)

অর্থাৎ,— যাহা কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও প্রাপ্ত হন নাই; তপস্যা, ধ্যান, যোগ দ্বারা যাহা কখনও জানা যায় নাই; বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ত্ববিচার স্তুতি ও তর্ক দ্বারা যাহা কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; অধিক কি, পূর্বে শ্রীগোবিন্দপরায়ণ অনেক ভক্তগণের পক্ষেও যাহা অলভ্য ছিল; সেই নিগূঢ় প্রেম যাঁহার অবতার কালে কেবল তৎকর্তৃক প্রদত্ত "নাম" মাত্র হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল,— সেই গৌরকান্তি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবকে আমি নমস্কার করি। পুরুষার্থ-শিরোমণি কেবল প্রত্যক্ষ করিবার চেয়ে— হাতে পাওয়া— কে না স্বীকার করিবেন অধিকতর লাভ। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যের সীমার দিক দিয়া বিচার করিয়া বলিতে হইলে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায় যে, একটি সুদীর্ঘকল্পের মধ্যে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি অপেক্ষা এই ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে, — বিশেষতঃ জীবের পক্ষে এমনতর আনন্দের দিন আর

একটিও নাই; কারণ এই স্মরণীয় দিনে শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ লাভ করিবার সৌভাগ্য বা লাভ করিবার সৌভাগ্যের সূচনা কলিজীবের ভাগ্যে উদয় হইয়াছে।

আমাদিগের এই ভূমণ্ডলের কলিযুগ পরিমাণ, আমাদিগের বৎসরের ৪,৩২,০০০ বৎসর; দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর; ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর; ও সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। আমাদিগের সত্যাদি চারিযুগে দেবতাদের একটি যুগ হয়, যাহাকে দিব্য যুগ বলে। একাত্তরটি দিব্য যুগে একটি মন্বন্তর, আবার চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে বা এক হাজার দিব্য যুগে ব্রহ্মার একটি দিন,—যাহার নাম "কল্প"। সহজ কথায়, আমাদিগের এক হাজার কলিযুগ, এক হাজার দ্বাপর যুগ, এক হাজার ত্রেতাযুগ ও এক হাজার সত্যযুগ একত্র করিলে ৪৩২,০০,০০,০০০ চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর হয়, আর ইহাই ব্রহ্মার একটি দিনের পরিমাণ। ঐ পরিমাণ ব্রহ্মার রাত্রিও আছে; সুতরাং ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ। তাহা হইলে, প্রায় ৮৬৪,০০,০০,০০০ আটশত চৌষট্টী কোটি বৎসরের মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বারদ্বয় এই ধরাধামে প্রকট হইয়া থাকেন। বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় শ্রীব্রজধামে ও ঠিক তাহার পরবর্তী কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপধামে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব। শ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীশ্যামসুন্দরেরই আবির্ভাববিশেষ এবং শ্রীনবদ্বীপ-লীলা, শ্রীবৃন্দাবন-লীলারই পরিশিষ্ট বলিয়া, স্বয়ং শ্রীভগবানের এই বারদ্বয় আবির্ভাবকে একই প্রকটের অন্তর্ভূতরূপে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। যথা, —

"ব্রহ্মার একদিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।

সেই চারিযুগে এক দিব্য যুগ মানি ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি, ৬-১০)

প্রকৃতির নিয়মানুসারে যখন ধর্মের গ্লানিহেতু জগতে অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, তখন ধর্ম বা স্বভাববিচ্যুত জীব বা জগতকে পুনরায় ধর্মে সংস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীভগবান অংশতঃ বা পূর্ণতঃ ধরাধামে প্রকট হইয়া থাকেন। ধর্ম প্রধানতঃ ত্রিবিধ— আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। ভূত ভাব বা উপাধি ভাবের নাম আধিভৌতিক ধর্ম, দেবভাবের নাম আধিদৈবিক ধর্ম ; আর আত্মভাবের নাম আধ্যাত্মিক ধর্ম। ভূত বা উপাধি ভাব আবার প্রধানতঃ স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্ব ভেদে দ্বিবিধ; দেবভাব আবার প্রধানতঃ কর্মদেবত্ব (কর্মের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তি) ও আজান দেবত্ব (জন্মাবধিই দেবত্বপ্রাপ্তি) ভেদে দ্বিবিধ ; আর আত্মভাব প্রধানতঃ জ্ঞানিত্ব ও প্রেমিকত্ব ভেদে দ্বিবিধ। স্থাবরত্ব হইতে প্রেমিকত্ব পর্যন্তের স্বাভাবিক ভাবই ধর্ম ; আর উহাদের ভাবচ্যুতি বা অস্বাভাবিকতাই অধর্ম। তন্মধ্যে স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব, কর্মদেবত্ব, আজানদেবত্ব ও জ্ঞানিত্ব পর্যন্ত স্বভাবচ্যুত হইলে, তাহাদের স্বধর্মে বা স্বভাবে সংস্থাপন করিতে শ্রীভগবান অংশতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; আর যখন কেবল মাত্র প্রেমিকত্ব ধর্মের সংস্থাপন অর্থাৎ জগতে প্রেম বিতরণের প্রয়োজন হয়, তখনই কেবল শ্রীভগবানের পূর্ণতমরূপে আবির্ভাব ঘটে। যথা,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।

আমা (কৃষ্ণ) বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩।২৬)

ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান, আর ব্রজ-প্রেমই প্রেমের পূর্ণতম ভাব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজের সহিত ব্রজ-প্রেম জগতে প্রকট করিলেন, সেই প্রেমসিন্ধু মধ্যে নিজে প্রকট হইয়া অনন্ত মাধুর্য-লীলাতরঙ্গ তুলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের জীব জগৎ স্থাবর জঙ্গম, সকলকেই চমৎকৃত করিয়া পুনরায় লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। তারপর —

যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনে জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগত মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩।১৩-১৫)

* * * * * * *

যুগধর্ম্ম (অসাধারণ) প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি (ব্রজ সম্বন্ধীয়) দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩।১৯-২১)

* * * * * * *

যুগধর্ম্ম (সাধারণ) প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে।
আমা (কৃষ্ণ) বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩।২৬, ২৮, ২৯)

অতএব সেই কৃষ্ণ— সেই ব্রজপ্রেম অজস্রভাবে— অবাধে এই মর-জগতের উপর সিঞ্চন করিয়া যেদিন তাহাকে অমরত্ব প্রদানের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভূত হইলেন, সুদীর্ঘ ৮৬৪,০০,০০০,০০ বৎসরের মধ্যে জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম শুভ দিনটিই শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা ; সুতরাং এতাদৃশ ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে আমরা বারবার প্রণাম করি।

খুব বড় জিনিষ হাতে পাইলেই যে আমরা তাহাকে সব সময় বড় বলিয়া বুঝিতে পারি তাহা নহে, বড়কে বড় বলিয়া বুঝিবার যে অধিকার, সেই অধিকার না পাইলে, বড়কে বুঝিতে বা চিনিতে পারা যায় না। পিপীলিকার বুদ্ধিবৃত্তির সীমা যতটুকু তদতিরিক্ত কোন বড় জিনিষ পাইলেও তাহারা তাহার মহিমা বুঝিতে পারে না। অল্প পরিমাণ চিটাগুড়— কিম্বা এক টুকরা সিতা খণ্ডের উপযোগিতা পিপীলিকা বুঝিতে পারে, কিন্তু একখণ্ড হীরক তাহাদের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, তাহারা তাহার মূল্য— তাহার উপযোগিতা বুঝিতে পারে কি ? পিপীলিকার পক্ষে হীরার মূল্য না বুঝিবার কারণ— হীরাকে হীরা বলিয়া বুঝিবার যে অধিকার, পিপীলিকার মধ্যে সেই অধিকারের বা বৃত্তির অভাব।

পুণ্য ফাল্গুনী পুর্ণিমা তিথি, আমাদের যে কি অনির্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার অধিকার না থাকায়, আমরাও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হঠাৎ একটি তীব্র আলোকের স্ফুরণ হইলে যেমন দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া পরে অল্পে অল্পে আবার সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে ; সেইরূপ পূর্ণতম

শ্রীভগবান কর্তৃক, পূর্ণতম কৃপাবিস্তারের সহিত পূর্ণতম পুরুষার্থ দান,— এই ব্যাপারটি আমাদের ক্ষুদ্র ধীশক্তির পক্ষে এতই বড়— তীব্র প্রখর আলোকের মত এতই উজ্জ্বল যে তাহার প্রভাবে প্রথমে জগতের দৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাধারণে ব্যাপারটির কিছুই উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই, জগতের স্তব্ধ দৃষ্টিশক্তি পুনরায় অল্পে অল্পে স্পন্দিত হইতেছে।

মহাশক্তিমান পুরুষের সাক্ষাৎ আবির্ভাবে এই জগতের উপর সহসা কি যেন এক অচিন্ত্য অভূতপূর্ব মহাশক্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হইল; যাহার ফলে সমহিমা শ্রীকৃষ্ণনামরূপ স্নিগ্ধ মল্লিকারাশির যেন একটি প্রচণ্ড ঝড় উঠল; আর তাহারই সহিত মহোজ্জ্বল প্রেম-মুকুতার যেন এক পশলা প্রবল বৃষ্টি, কলিতপ্ত জগতের উপর বর্ষণ হইয়া গেল। ব্যাপারটি এতই অচিন্ত্য— আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির এতই উপরকার জিনিস যে, আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; — যেমন পিপীলিকা প্রাপ্ত হীরার মূল্য বা উপযোগিতা কিছুই বুঝিতে পারে না। অনেকে এজন্য ব্যাপারটি আদপে আমলেই আনিলেন না; কেহ-বা বিষয়টি অত্যন্ত জটিল দেখিয়া, ইহা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনই মনে করিলেন না, কেহ-বা বিস্মিত হইয়া শুধু মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াই থাকিলেন। অপর কেহ কেহ-বা অনেক বিবেচনার পর অবশেষে স্থির করিলেন, শ্রীভগবানের এই লীলাটি যে খুবই একটা বড় রকমের তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে জগাই-মাধাই- এর মত পতিত এমন করিয়া উদ্ধার হয় কিরূপে? বার লক্ষ টাকার আয় ছাড়িয়া তরুণ বয়সে রঘুনাথ বৈরাগী হন কিসের টানে? রূপ-সনাতন মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন কাঁহার শক্তিপ্রভাবে? বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠ যাঁহার একবার মাত্র আলিঙ্গনেই আরোগ্য হইল; যাঁহার অব্যর্থ সঙ্গ প্রভাবে মায়াবাদী- শিরোমণি প্রকাশানন্দের পরিবর্তন হইল; বনের পশুপাখীও যাঁহার সঙ্গে হরিনাম গাহিল;

যাঁহার মুখে হরিনাম শুনিয়া আচণ্ডাল কত লোক উদ্ধার হইয়া গেল ; সেই অবতারের প্রভাব বড় সামান্য নহে !

বাস্তবিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রভাবসকল অসামান্য ও আশ্চর্য-জনক হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গলীলার এই সকল প্রভাবই পূর্ণ প্রভাব নহে। এই লীলার অন্তরালে যে পরম রহস্যময় ব্যাপার লুকান রহিয়াছে, জীবের পক্ষে তাহা অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয় ; শ্রীগৌরসুন্দরের পাদ-পদ্মের নিত্যভৃঙ্গ যাঁহারা, কেবল তাঁহারাই সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগৌরপ্রিয় পরিকরগণের উপদেশ ও শিক্ষাদি অনুসরণ করিলে, অধম ও অযোগ্য আমরা— আমরাও তাঁহাদের কৃপায় বুঝিতে পারি ; শ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রভাব — কেবল জগাই-মাধাই উদ্ধারে, রঘুনাথের বৈরাগ্যে, রূপ-সনাতনের বিষয় ত্যাগে, বাসুদেবের আরোগ্যে, চাপাল-গোপালের শোধনে, প্রকাশানন্দের পরিবর্তনে, অথবা পশু পক্ষির প্রেমের ক্রন্দনে কিম্বা তৎকালীন লক্ষ লক্ষ অধম অগতি পতিত জীবকে প্রেমভক্তির অধিকার দানেই সীমাবদ্ধ হয় নাই, শ্রীগৌরপ্রভাবের পরিসীমা আরও ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত— অনন্তেই প্রসারিত !

শ্রীগৌরপরিকরগণের পদরেণুর প্রভাবে আমরা বুঝিতে পারি পূর্বোক্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতির ন্যায় ব্যষ্টিগত উদ্ধারকার্য, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট কালের পূর্ণ প্রভাব নহে, —স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার সাধনই তাঁহার প্রকট কালের পূর্ণ প্রভাব। সেই সময়ে যাহারা এই দাতা-শিরোমণি পূর্ণতম ভগবানের অনুগত হইয়াছে, কিম্বা তাঁহার প্রদত্ত নাম একবারও লইয়াছে, বা তাঁহার সঙ্গে কিম্বা তাঁহার সঙ্গীজনসঙ্গের কোনও সম্বন্ধ- কণা লাভ করিয়াছে, তাহারা ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ব্রজপ্রেমের অধিকার পাইয়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা তাঁহার প্রকট কালে তাঁহার কোন সম্বন্ধ পায় নাই, — এমন কি বিমুখ ও বিদ্রোহী হইয়াও যাহারা তাঁহা হইতে

চিরদিন দূরে সরিয়া ছিল, তাহারাও এই মহাপ্রকট-মহিমায় অন্য-যুগ-জীবের সুদুর্লভ যে বৈকুণ্ঠ লোক —অনন্ত কালের জন্য সেই লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু মানবের উদ্ধার নহে,— এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের এইরূপ মহা- উদ্ধার- বার্তা— প্রাকৃত ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইহা যুক্তি ও তর্কের গ্রাহ্য নহে, কেবল বিশ্বাস- গ্রাহ্য। সেই অচিন্ত্য গৌর-প্রকট-প্রভাব যে জগাই-মাধাই বা চাপাল-গোপাল উদ্ধারের ন্যায় ব্যক্তিগত সীমায় সীমাবদ্ধ নহে, সমষ্টিগত ভাবেই যে সে-মহিমার সীমা বিস্তৃত, এইকথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমক্ষেই নামমহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে — ব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুর কর্তৃক সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কেবল জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যেই এই সকল গূঢ় রহস্যের জগতে প্রকাশ।

নামাভাসেই ম্লেচ্ছ, যবন পর্যন্ত মুক্তি লাভ করিবে, ঠাকুর হরিদাসের মুখে এই কথা শুনিয়া এই অসাধারণ অবতারের প্রকট কালের অসাধারণ মহিমার সীমা জগতে ব্যক্ত করিবার ছলেই যেন মহাপ্রভু, "পুনরপি ভঙ্গি করি পুঁছয়ে তাহারে"—

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥"

তদুত্তরে শ্রীহরিদাস বলিলেন —

হরিদাস কহে যাতে সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার।
তুমি করিয়াছ যাতে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ে ত শ্রবণ॥
শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥

সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৬৫-৭১)

জগৎ তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার।
স্থির চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥

শ্রীহরিদাসের মুখে এই কথা শুনিয়া নিজ অবতারের প্রকট কালের মহিমার সীমা এবার স্পষ্টরূপে প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —

প্রভু কহে সর্ব্বজীব মুক্ত হইবে যবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড সব শূন্য হবে॥

ইহার উত্তরে শ্রীল হরিদাস এইবার সেই পরম নিগূঢ় রহস্য স্পষ্টরূপে প্রচার করিলেন, —

হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্তে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব ইহা হবে স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৭৪-৭৯)

* * * * *

তৈছে নবদ্বীপে তুমি করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চয়॥

তোমার সে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনের গোচর নহে তার এক বিন্দু ॥

তারপর — এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৮৫-৮৮)

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সে-সময়কার স্থাবর জঙ্গম সমষ্টির এককালে উদ্ধারসাধনই মহা-প্রেমাবতারী পূর্ণতম ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ণ প্রভাব।

পূর্ণশক্তিমান পুরুষের সাক্ষাৎ আবির্ভাব বশতঃ বর্তমান কলিযুগ, তাঁহার অপ্রকট সময়ের জন্যও এমন এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের কারণ লাভ করিয়াছে যাহা এক কল্পের মধ্যে আর কোন যুগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

গ্রীষ্মের ধূলিধূসরিত প্রতপ্ত আকাশ পবন, যেমন বর্ষা ঋতুর আবির্ভাবে আপনিই সিক্ত ও শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এই জগতের উপর এমন একটি অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সঞ্চার হইয়া আছে, যাহার প্রভাবে তাঁহার অপ্রকটকালে, এই অবশিষ্ট কলিযুগের রজোতাপ ও তমোধূলি বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে এক প্রেমের প্রবল বর্ষার উদয় হইয়া সারা জগতকে স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিয়া দিবে। মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটকালে লীলারূপে এমন অনেক বিষয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার মুখ্য সার্থকতা সে-সময়ের জন্য নহে, — তাঁহার পাদস্পৃষ্ট এই পুণ্যতম কলির ভাবী জীবের মহাভাগ্যোদয়ের জন্য। বর্তমান কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের সহিত তিনি যে প্রেমের বীজ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, (সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।" — শ্রীচরিতামৃত।) তাহার অব্যর্থ প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিপ্লাবিত করিবে। এক উদ্দেশ্য — এক ধর্ম — এক বিরাট সাম্যবাদের সুশীতল জ্যোৎস্নারাশি

সমস্ত জীব — সমস্ত জগতকে জুড়াইয়া দিবে। শান্তি-শুভ্রমল্লিকার ডালা মাথায়-করা সেদিন — সেদিন আসিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

ভবিষ্যতের কোটি জগাই-মাধাই প্রেমধর্মে দীক্ষিত হইবে যাহা হইতে, মহাপ্রভু তাহার সূচনা এক জগাই-মাধাই উদ্ধারে করিয়া রাখিয়াছেন। যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখায় কোটি কোটি সন্তপ্ত জগাই-মাধাইকে ছায়াদানে সুশীতল করিবে, — এক জগাই- মাধাই- উদ্ধার- লীলায়, ভবিষ্যতের সেই বিরাট কার্যেরই কারণ বা বীজ হইয়া আছে ; নচেৎ সমষ্টির মহাঅভিযানে ব্যষ্টিগত জীব- উদ্ধার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়। অদূর ভবিষ্যতের মহদপরাধী কোটি চাপাল-গোপাল যে প্রণালীতে উদ্ধার হইবে, প্রকট লীলায় তিনি এক গোপাল-চাপাল উদ্ধারে সেই বিরাট কার্যের কারণ বা বীজ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতের কোটি-কোটীশ্বর, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরাসম রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া মধুর বৃন্দাবনের মহা-মাধুর্যের টানে যে ভাবে ছুটিয়া চলিবে, প্রকট লীলায় সে কার্যের কারণ বা বীজ, তিনি এক রঘু-নাথের বিষয় ত্যাগে তাহা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর পক্ষে বিষয়ত্যাগ- গৌরব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভবিষ্যতের উচ্চপদ-গর্বিত, প্রতিষ্ঠামদ-দর্পিত কোটি জন যে বিবেক ও বৈরাগ্যের অমোঘ স্পর্শে নিজ প্রতিষ্ঠাদি কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রীভগবানের সেবাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিবে, প্রকটলীলায় তিনি এক রূপ-সনাতনের গৌড়রাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সে কার্যের কারণ বা বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী তাঁহারা, এই ত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। অদূর ভবিষ্যতের কোটি জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানের গৌরব খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদের যে ভক্তিদেবীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া দিবে, প্রকটলীলায় এক সার্বভৌম,

প্রকাশানন্দের পরিবর্তনে তিনি সে কার্যের কারণ বা সূচনা করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দের জ্ঞান গৌরব কোন দিনই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটি ম্লেচ্ছাদি জাতি যে নামযজ্ঞের বিরাট প্রাঙ্গণে একত্রিত হইয়া পরম শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদির বন্দনীয় হইবে, প্রকট লীলায় এক হরিদাসের হরিনামসাধনে তিনি সে কার্যের কারণ বা বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেৎ ব্রহ্ম-হরিদাসের যবনত্ব প্রাপ্তি, কাঞ্চনের লৌহত্ব প্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব। এইরূপ তাঁহার প্রকটকালের জীব উদ্ধারার্থ প্রত্যেক লীলা সেই সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র ; কিন্তু ঐ সকল লীলার যাহা মুখ্য প্রয়োজনীয়তা— যাহা যথার্থ সার্থকতা, তাঁহার আবির্ভাব গৌরবে গৌরবান্বিত এই কলির ভাবী জীবের মহা-ভাগ্যোদয়ের জন্য ! সত্যযুগ-জীবের পক্ষেও যাহা দুর্লভ, কল্পের মধ্যে অপর কোন যুগের কোন জীবের পক্ষে যাহা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, এই বর্তমান কলিযুগের জীব সেই অবিচিন্ত্য সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সেই ব্রজ-কিশোরীর প্রেম যাঁহার আবির্ভাব বশতঃ এই কলিজীবের ভাগ্যেও প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছে, সেই প্রেম-দাতা-শিরোমণি পূর্ণতম শ্রীভগবানের আবির্ভাবের শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় তিথি, শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার সহিত, আমাদের যে কি মহতী আশা ও মহান আনন্দের বার্তা বিজড়িত রহিয়াছে—তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

যুগধর্ম প্রবর্তন করিবার জন্য শ্রীভগবান যুগাবতার রূপে, যুগে যুগে ধরাধামে প্রকট হইয়া থাকেন। তাঁহার মন্বন্তর-অবতারসকল নিজ নিজ অধিকারভুক্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম (ইনি স্বয়ং ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নহেন) ও কৃষ্ণ (ইনিও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নহেন) এই বর্ণ ও নাম ধারণ করিয়া অংশে যুগাবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। যথা, —

কথ্যতে বর্ণ-নামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

—(শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ১।২১৫)

ইহাই সাধাধণ যুগসকলের যুগাবতার-কথা। ব্রহ্মার একদিন বা (১,০০০) হাজার চতুর্যুগের মধ্যে ৯৯৯টি চতুর্যুগের পক্ষে ইহাই সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু কল্পের মধ্যে কেবল একটি চতুর্যুগের যুগাবতারের নিয়ম স্বতন্ত্র। সেই বিশেষ চতুর্যুগটিকে আমরা অসাধারণ চতুর্যুগ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি ; কারণ এক হাজার চতুর্যুগের মধ্যে এমন বাঁধা নিয়মের পরিবর্তন হওয়া চতুর্যুগ আর একটিও নাই। বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ অর্থাৎ আমাদের এই বর্তমান চতুর্যুগটিই সেই অসাধারণ চতুর্যুগ। এই চতুর্যুগটি অসাধারণ হইলেও ইহার মধ্যে চারিটি যুগই অসাধারণ নহে। ইহার সত্য ও ত্রেতা যুগে সাধারণ নিয়মেই যথাক্রমে শুক্লবর্ণ ও শুক্লনামের এবং রক্তবর্ণ ও রক্তনামের যুগাবতার হইয়া থাকেন ; সুতরাং এই বিশেষ চতুর্যুগটির মধ্যে কেবল দ্বাপর ও কলিযুগের যুগাবতারেই অসাধারণত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের ২০-৩২ শ্লোকে এই অসাধারণ চতুর্যুগের যুগাবতারের ও যুগধর্মের কথাই শ্রীকরভাজন নিমি-মহারাজকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে গর্গমুনিও এই অসাধারণ চতুর্যুগের যুগাবতারের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

— (শ্রীভাঃ ১০।৮।১৩)

অর্থাৎ,—

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ, এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিযুগে ধরেন শ্রীপতি ॥

ইদানীং দ্বাপরে ত্রিহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সর্ব্ব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৩।৩৭-৩৮)

শাস্ত্রোক্ত এই কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অসাধারণ যুগাবতারদ্বয় — যুগাবতার নহেন, — অবতারী অর্থাৎ স্বয়ং-রূপ। ইহার মধ্যে প্রথম জন হইতেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং পীতবর্ণের দ্বিতীয় জন হইতেছেন, "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই।" অর্থাৎ আমাদিগের সেই প্রেমদাতা ঠাকুর—স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মহাপ্রভু।

উক্ত অসাধারণ বা বিশেষ দ্বাপর ও কলিযুগে সাধারণ যুগের ন্যায় সাধারণ যুগধর্ম প্রবর্তন করিতে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হেতু, সেই যুগের যুগাবতারের পৃথক কার্য না থাকায় স্বয়ং রূপেই মিলিত হইয়া থাকেন। এই নিয়ম কেবল যুগাবতার সম্বন্ধেই নহে ; স্বয়ং ভগবানের প্রকট কালে বিলাস ও স্বাংশাদি অপরাপর ভগবৎ-স্বরূপ সকলের সম্বন্ধেও — শ্রীভগবানের এই স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম।

যথা,—

পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার আসি তাতে মিলে॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৪।১০-১২)

পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও যে কথা, সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে যখন শ্রীগৌরসুন্দর রূপে বিশেষ কলিযুগে প্রকট হয়েন, তখনও সেই কথা, — তখনও সমস্ত অবতারাদি তাঁহার সহিতই মিলিত হইয়া

থাকেন ; সুতরাং সাধারণভাবে প্রচার করিবার জন্য সেই কলিযুগে আর কোন সাধারণ যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না ; সেই অসাধারণ কলিযুগের যুগধর্ম প্রচারের ভার স্বয়ং ভগবান স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া থাকেন ; সুতরাং সাধারণ যুগাবতার কর্তৃক সংস্থাপিত সাধারণ যুগধর্ম অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান কর্তৃক বিতরিত যুগধর্মের যে মহান বৈশিষ্ট্য আছে—একথার উল্লেখই বাহুল্য মাত্র। আমাদের বড়ই বুকভরা আশার কথা যে আমাদের এই বর্তমান কলিযুগটিই সেই আসাধারণ কলিযুগ, এবং এই কলিযুগের অসাধারণ যুগধর্মই সেই ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত—অনর্পিতচরিত—উজ্জ্বল ব্রজপ্রেম !

সাধারণ ও অসাধারণ যুগাবতারের কথা কিছু বলা হইল। এখন সাধারণ ও আসাধারণ যুগধর্মের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

যুগাবতারগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া সেই সেই যুগের মনুষ্য-গণের স্বভাবোপযোগী ধর্ম উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম যজ্ঞ, দ্বাপর যুগের ধর্ম অর্চনা ও কলিযুগের ধর্ম শ্রীহরি-নাম-কীর্তন। সাধারণ যুগসকলের ইহাই সাধারণ যুগধর্ম— শাস্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, নাম-মহিমা প্রসঙ্গে যখন আমরা শাস্ত্রে দেখি, শ্রীহরিনামের শ্রেষ্ঠ বা সমান অপর কোন সাধনা নাই, তখন শ্রেষ্ঠ সাধনা যে নামকীর্তন, তাহার পরিবর্তে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগত্রয়ে যথাক্রমে ধ্যান যজ্ঞ ও অর্চনা ধর্মের ব্যবস্থা ও সর্ব নিকৃষ্ট যে কলিযুগ — তাহার পক্ষেই বা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা যে নাম-কীর্তন, তাহারই বা ব্যবস্থার হেতু কি ?

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে, সত্যাদি চারি-যুগে ধ্যানাদি চারি প্রকার ধর্মের ব্যবস্থা থাকিলেও শ্রীহরিনাম কীর্তন যে সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ, সেই কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে, শাস্ত্র নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২)

এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে অর্চনাদি দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্তনের আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলেই সে-সমুদয় লভ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীহরিনাম শ্রীহরির মতই নিত্য বস্তু। ইহা কেবল কলিযুগের ধর্ম নহে, সকল যুগেরই নিত্য ধর্ম। সত্যাদি যুগে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনাদি ধর্ম, সেই সেই যুগাবতার কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও, কোন যুগই শ্রীহরিনাম রূপ পরম ধর্ম শূন্য নহে, "তারক ব্রহ্ম নাম" রূপে, শ্রীহরিনাম চারিযুগ ব্যাপিই নিত্য অবস্থান করিতেছেন। যথা, সত্যযুগে—

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরা মুক্তি র্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ত্রেতাযুগে—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপরযুগে—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

কলিযুগে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সুতরাং শ্রীভগবন্নাম যে সর্ব যুগেরই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয় কথা এই যে, জিহ্বোষ্ঠস্পন্দন-মাত্র-সাধ্য শ্রীহরিনাম-কীর্তন সকল কালে সকল অধিকারীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ সাধনা হইলেও, নামের তত্ত্ব ও মহিমাদি অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়া, সেই নাম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যোদয় সকলের পক্ষে না হওয়ায়, প্রায় কেহই সহজে নামাশ্রয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণনামের তত্ত্বাদি এতই ঊর্ধ্বস্তরে সংস্থাপিত যে, জীবের বুদ্ধির সীমা, শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা না পাইলে, তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভই করিতে পারে না। শাস্ত্র সেই কথা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন। যথা, —

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

— (শ্রীভাঃ ৬।৩।২৫)

অর্থাৎ—(অজামীল উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীধর্মরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন) যদি বল, নামের যদি এতাদৃশ মাহাত্ম্যই হয়, তবে শাস্ত্রে অপরাপর প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি প্রদত্ত হইল কেন? সেই জন্য বলিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে দৈবীমায়া-বিমুগ্ধচিত্ত মন্বাদি স্মৃতিকারগণও নামের মহিমা না জানিতে পারিয়াই নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তাদির উপদেশ করিয়াছেন; অতিশয় ফল-শ্রুতি পুষ্পিত বেদবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়াই লোকে অগ্নিষ্টোমাদি নানা প্রকার যজ্ঞকর্মে রত হয়।

ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং,
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ,
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

— (শ্রীভাঃ ৬।৩।১৯)

অর্থাৎ — (সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক বিতরিত নাম ও প্রেমধর্মাদি যে

কিরূপ নিগূঢ় তৎসম্বন্ধে শ্রীধর্মরাজ বলিতেছেন, —) শ্রীভগবৎ-প্রণীত ধর্মের তত্ত্ব যখন দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তখন সামান্য বিদ্যাধর, চারণ, অসুর বা মানবগণ কি প্রকারে তাহা জানিবে ?

অতএব নামের নিগূঢ় মহিমাদি যে চতুষ্পাদ ধর্মবিশিষ্ট সত্য-যুগের প্রজাগণের বুদ্ধির পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য ছিল, এবং সেই জন্যই সর্বকালে সকল অধিকারীর পক্ষে পরমোপকারক এমন যে নামাশ্রয় — তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত না হইয়া তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ হইতেন, একথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সত্ত্বগুণপ্রধান সত্যযুগবাসীর মধ্যে নামাশ্রয় করিবার মহাভাগ্য যখন অতি অল্প লোকের পক্ষেই ঘটিত — তখন অন্য যুগের প্রজাদের কথা আর কি বলিবার আছে। এইজন্য সত্যাদি যুগে নামাশ্রয়ে বঞ্চিত সর্বসাধারণের জন্য ধ্যান, যজ্ঞাদি ধর্ম যুগধর্মরূপে যুগাবতার কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও, যাঁহারা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত, — তাঁহারা যে কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, মলয়ানিলসেবীর যেমন তালবৃন্ত ব্যজনে প্রবৃত্তি দেখা যায় না, সেইরূপ সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপ— একাধারে সাধ্য ও সাধনা এমন যে শ্রীভগবন্নামাশ্রয়— তদ্ব্যতীত অপর কোন সাধনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন না। সুতরাং অতিভাগ্য বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় জনগণের আশ্রয়-স্থল হইয়া, নাম সর্বযুগে— সর্বকালে— সমভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

চতুর্থ কথা এই যে, অন্যান্য যুগের ন্যায় ধ্যান যজ্ঞাদির মত অপর কোনও ধর্মের ব্যবস্থা না দিয়া, সর্বযুগাধম যে কলিযুগ, তাহার পক্ষেই বা অন্য যুগবাসীগণের বুদ্ধির দুষ্প্রবেশ্য সাধন যে নাম-সংকীর্তন, তাহারই বা ব্যবস্থা দিবার কারণ কি ? একমাত্র নাম-সঙ্কীর্তনই যে কলিযুগের ধর্ম, শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে সেই কথা জানাইয়া দিয়াছেন। যথা, —

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

— (বৃহন্নারদীয়ে, ৩৮।১২৬)

অর্থাৎ — কলিযুগের ধর্ম একমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম-ই ; ইহা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই। কলিযুগে হরিনামাশ্রয় ব্যতীত যে সত্যাদি যুগের ন্যায় আর কোন ধর্মই নাই, সে-কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বুঝাইয়া দিবার জন্য শাস্ত্র ত্রিসত্য করিয়া তিনবার হরিনাম ও তিনবার নিশ্চয়াত্মক "এব"-কারের সহিত "অন্য গতি নাই-ই" ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং সর্বাপেক্ষা অধম কলির জীবের পক্ষে সর্বোত্তম ধর্মের বিধিই দেখা যাইতেছে। এরূপ অসামঞ্জস্যকর ব্যবস্থার হেতু কি হইতে পারে ?

প্রবল রোগে প্রবল শক্তিশালী ঔষধই ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। পাপপ্রধান কলিযুগে প্রায় লোকই স্বভাবতঃ ধর্মবহির্মুখ। অকৃত্রিম-ভাবে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যে-যুগের প্রজাগণের প্রবৃত্তিই নাই, সেই কলিযুগের জন্য স্বতন্ত্র কোন যুগধর্মের বিধি নিষ্প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, মন্ত্র ও দ্রব্যাদির পরিশুদ্ধতা যেরূপ ভাবে প্রয়োজন, অধর্মবহুল কলিযুগে তাহার অত্যন্ত অভাব। ইহা ব্যতীত কলির জীব সংসর্গবশতঃ অধিকাংশই নাস্তিক ভাবাপন্ন হওয়ায়, সাধু ও শাস্ত্র-নিন্দাদিজনিত নামাপরাধরূপ সর্বপ্রধান অপরাধগ্রস্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন, নামাশ্রয় ব্যতীত সে অপরাধের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ; সুতরাং অন্য কোনও ধর্মের পরিবর্তে নামকীর্তনই কলিযুগের একমাত্র উপযুক্ত ধর্ম। নামাশ্রয় সর্ব বিষয়েই কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম হইলেও সাধারণ কলিযুগে ইহার গ্রাহক অন্যান্য যুগ অপেক্ষাও যে একেবারেই অল্প, একথা বলিবার আবশ্যকতাই নাই। কিন্তু এই সর্বাধম যুগে যদি কাহারও নামাশ্রয় করিবার ভাগ্যোদয় হয়, তবে সেই অতি ভাগ্যবান জীব, ধ্যান যজ্ঞাদির সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গতি লাভ করিয়া থাকেন।

ধ্যান, যজ্ঞ প্রভৃতি সাধারণ যুগধর্মের ফল স্বর্গাদি বা তাহারও উপর মুক্তি লাভ। এই জন্য সাধারণতঃ মুক্তিই পুরুষার্থ-প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেমভক্তিই যথার্থ পুরুষার্থ-শিরোমণি। এই জন্যই শাস্ত্র প্রেম-ভক্তিকে পরম-মুক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন! শ্রীহরিনাম-কীর্তনের অচিন্ত্য প্রভাবে বহুদোষ-দুষ্ট কলির জীবের সেই ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।৩।৫১)

অর্থাৎ, — হে রাজন্! কলিযুগ সকল দোষের নিধি স্বরূপ হইলেও ইহার এক মহৎ গুণ আছে এই যে, যদি কেহ শ্রীহরিনাম কীর্তন করেন, তবে সেই নামের প্রভাবে সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া তাঁহার পরম গতি অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, সাধারণ কলিযুগে সাধারণ যুগাবতার কর্তৃক একমাত্র হরিনাম-কীর্তনই যুগধর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কলিযুগের স্বভাব-নিবন্ধন, গ্রাহক অতি অল্প হইলেও — যাঁহারা সেই নামাশ্রয় করেন তাঁহারা নামের পূর্ণফল যে প্রেমভক্তি — তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্বযুগে সর্বকালে নামের ফল "প্রেম" বা পরম-গতি। নামের মুখ্য বা পূর্ণফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমোদয়; আর পাপক্ষয়, স্বর্গাদি বা মুক্তি ইহার গৌণ বা আংশিক ফল মাত্র।

এইবার আমাদের বুঝিতে হইবে, অসাধারণ যুগাবতার কর্তৃক প্রদত্ত অসাধারণ যুগধর্মের কথা। আমাদের বর্তমান কলিযুগই সেই অসাধারণ যুগধর্ম পাইবার, সেই অসাধারণ কলিযুগ। এক হাজার চতুর্যুগের মধ্যে যে যুগটি সর্বাধিক ভাগ্যবান, স্বয়ং ভগবান নিজে আসিয়া যে যুগের যুগধর্ম পরিচালনভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়াছেন, — এক কল্পের মধ্যে যে ঘটনা

আর কোন যুগে হয় নাই— আমাদের বর্তমান কলিযুগই সেই যুগ! এই যুগে জীবের পক্ষে এমন কোনও এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্য লাভ করিবার কথা, যাহা বর্তমান কল্পের মধ্যে আর কোন দিন কোন যুগবাসী-ই পায় নাই!

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাধন এবং প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরুষার্থ যখন আর কিছুই হইতে পারে না এবং সাধারণ কলিযুগেও যখন সেই প্রেম-ফলপ্রদ নাম-কীর্তন-রূপ পরম ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, তখন তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক সম্পদ থাকিতে পারে, যাহা এই বর্তমান কলিবিশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে দান করিয়াছেন?

নাম হইতে অধিক সম্পদ— নামাশ্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর কিছু না থাকায়, পূর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে প্রকট হইয়া তাঁহাকেও সেই হরিনাম ধর্মই প্রচার করিতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু যে-হরিনাম অন্যযুগে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাহার মহিমাদি অজ্ঞাত থাকায় গ্রাহক বড় একটা মিলিত না — এক্ষণে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান কোন এক অনির্বচনীয় কৃপায়, সেই শ্রীহরিনাম, সহজে গ্রহণ করিবার অধিকার সারাজগতে বিস্তার করিয়াছেন। তাই তিনি জগন্মঙ্গল নিজ নাম অগ্রবর্তী করিয়া ধরায় আবির্ভূত হইলেন, —"জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া।" সেই দিন হইতে গোলোকের গুপ্তমন্ত্র সর্বজীবের গ্রাহ্য করিয়া দিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বদিন পর্যন্ত যেখানে শুষ্ক তর্ক, মায়াবাদের বাক্‌বিতণ্ডা, বামাচার, মনসার গান, মঙ্গল চণ্ডীর ভাসান প্রভৃতিকেই সাধারণত: লোকে পরমার্থের পরম সীমা মনে করিত, কি যেন এক অচিন্ত্যনীয় ভাবে — গ্রহণের ছলে হঠাৎ সেই দিন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি স্ফুরিত হইয়া উঠিল!

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভ ক্ষণ॥

* * * * * *

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেই ক্ষণে গৌর-কৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্ব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥
হরি বলি নারীগণ দেন হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥

— (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ১৩।৮৯, ৯১-৯২,৯৪-৯৬)

জগতের পৃষ্ঠে অজস্র ধারায় শ্রীহরিনামামৃত বর্ষণ, বাস্তবিক পক্ষে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতেই তাহার সূত্রপাত। শ্রীগৌর-আবির্ভাবের কলিযুগ ছাড়া নামাশ্রয়ের এমন অবাধ অধিকার, এই কল্পের মধ্যে আর কোন যুগের ভাগ্যে ঘটে নাই বা ঘটিবে না। অপর সাধারণ কলিযুগ হইতে আমাদের এই বর্তমান কলিযুগ-ধর্মের ইহাই প্রথম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমভক্তিই নামের পরিপূর্ণ ফল। নামের যাহা পূর্ণফল, নামাশ্রয় দ্বারা অন্য যুগেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত; বৈধী ভক্তি হইতে উত্থিত যে ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্র প্রেম,— পূর্বে নামের ফলে সেই প্রেম লাভ হইত। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নিত্যসেবা বা তদূর্ধ্বে— শ্রীদ্বারকা বা মথুরানাথ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ জীবের ভাগ্যে উদয় হইত— নামের অচিন্ত্য প্রভাব হইতে। বাস্তবিক ইহার অধিক পুরুষার্থের সন্ধান কল্পের মধ্যে আর কোনও দিন কেহ চিন্তা করেন নাই— চিন্তা করিবার কিছু ছিলও না। রাজ্যের প্রজাগণের পক্ষে যেমন অধ্যবসায় ও সৌভাগ্যের চরম সীমা— রাজার সভাসদ্ বা রাজার বহির্বাটীতে

তাঁহার পার্ষদত্ব প্রাপ্তি। কোন প্রজাই রাজঅন্তঃপুরে রাজপরিবার-ভুক্ত কেহ হইবার আশা কোনও দিনও পোষণ করে না। তবে রাজা ইচ্ছা করিলে কোনও কৃপাবিশেষের দ্বারা, স্বয়ং প্রজাগণের মধ্যে কাহাকেও নিজ পরিবারভুক্ত জনগণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইতে পারেন। সেইরূপ জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের বহির্বাটীস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বা শ্রীরাম-নৃসিংহাদি স্বাংশাবতারগণের পার্ষদত্ব প্রাপ্তিই পুরুষার্থের পরম সীমা; কিন্তু এই অসাধারণ কলিযুগে— স্বয়ং ভগবানের কোনও এক রস-বিশেষ আস্বাদন করিতে আসা কলিযুগে, তিনি জীবের প্রতি এমন কোনও এক অনির্বচনীয় অতিভাগ্যের বিস্তার করেন, যাহার প্রভাবে সেই প্রেমদাতা- শিরোমণি শ্রীগৌরহরির অনুগত হইয়া নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের বিশেষ ফলে স্বয়ং ভগবানের পরিজনের ন্যায় প্রেম লাভ করিয়া তাঁহার মাধুর্যময় অন্তঃপুর— শ্রীব্রজ-ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। শ্রীগৌর-অনুগত জনের পক্ষে নামাশ্রয়ের পূর্ণফল, রাগানুগা ভক্তি হইতে উত্থিত ব্রজপ্রেম— গোপী-প্রেম। যাহার একবিন্দু পাইবার জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লোক-পালগণ নিরন্তর কামনা করিয়া থাকেন, এই কলিজীব, সেই নিগূঢ় প্রেমসারের অধিকারী হইয়াছে যাঁহার কৃপা বিশেষে, সেই পরম দয়াল মহাপ্রভুর সুস্নিগ্ধ চরণসরোজে দেহ-মন-প্রাণ চিরতরে বিকাইয়া দিতে কাহার না সাধ হয়? তাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন,—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-৪)

অর্থাৎ— যিনি একবার মাত্রও দৃষ্ট, স্পৃষ্ট বা (হে শচীনন্দন, হে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, হে পরম দয়াসাগর, হে পতিত প্রেমদ, হে করুণৈকসিন্ধু, হে

গৌরবিধো ইত্যাদি) নাম দ্বারা কীর্তিত কিংবা তদীয় রূপ-লাবণ্যাদি চিন্তন পূর্বক দূরস্থিত জনগণ কর্তৃক আদর সহকারে অনুগত ভাবে নমস্কৃত হইলেই প্রেমের যাহা সার— অর্থাৎ উজ্জ্বল ব্রজ-প্রেম দান করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার।

শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে যে অসাধারণ চতুর্যুগের যুগাবতারের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কলিযুগের যে অসাধারণ যুগাবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনিই আমাদের সেই ব্রজপ্রেমদাতা দয়ালু শ্রীচৈতন্য-দেব। একমাত্র তাঁহার অনুগত হইয়া শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তনরূপ পূজা-সম্ভারে তাঁহারই অর্চনা করা এই বিশেষ কলিযুগবাসীর একমাত্র বিশেষ ধর্ম ; যাহার ফলে উজ্জ্বল ব্রজপ্রেমরূপ কোনও এক প্রেম বিশেষ লাভ করা যায়। সমস্ত কল্পের মধ্যে বর্তমান কলিবিশেষের ইহাই পরম বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩১)

অর্থাৎ, অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও বাহিরে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট শ্রীভগবান যখন সাঙ্গোপাঙ্গ, শ্রীহরিনামরূপ অস্ত্র ও পার্ষদবর্গের সহিত অবতীর্ণ হয়েন, তখন সুবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিসকল সংকীর্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন।

এই কলিযুগ যে সকল যুগের সেরা যুগ, একথা যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, আর বুঝিতে পারিয়া এই কলিযুগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে সেই কথাই *বলিয়াছেন। যথা,—*

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভি লভ্যতে॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৫)

অর্থাৎ,— যে কলিতে (কলিবিশেষে) সংকীর্তন দ্বারা লোকের সকল প্রয়োজন (ব্রজপ্রেম পর্যন্ত) লাভ হয়, সারভাগী গুণজ্ঞ আর্যসকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৭)

সংসারে ভ্রমণকারী দেহিদিগের ইহা অপেক্ষা পরম লাভ (ব্রজপ্রেমরূপ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রাপ্তির অধিকার লাভ হেতু) আর কিছুই নাই, যে সংকীর্তন হইতে (মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন হইতে) পরম শান্তি লাভ ও সংসারের নাশ হয়।

অতএব এই বর্তমান কলিযুগ যে এক কল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও বিশেষ কৃপা বশতঃ অন্য কোনও যুগবাসীর ভাগ্যের সহিত এই অসাধারণ কলিযুগ-বাসীর অসাধারণ ভাগ্যের তুলনা হয় না। জীবের এই অতিভাগ্যোদয় এক কল্পে একবার মাত্র ঘটিয়া থাকে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে বর্তমান কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত, কলির জীব সেই সৌভাগ্য-বিশেষ প্রাপ্ত হইবে ; কারণ স্বয়ং ভগবানই এই যুগবিশেষের অসাধারণ যুগধর্মের স্বয়ং প্রবর্তক। বর্তমান যুগে অপর কোনও অবতারাদির আর কোনও রূপ কার্য নাই। ইহার পরে যে সত্যাদি যুগ আসিবে, পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মে সত্যাদি সাধারণ যুগাবতার যথাক্রমে আবির্ভূত হইয়া যুগধর্ম প্রবর্তন করিবেন। তখন সেই সকল সত্যাদি যুগের প্রজা, এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের অনির্বচনীয় ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া নিজেদের ভাগ্যহীন বলিয়া নিশ্চয় মনে করিবেন। শ্রীকরভাজন এই কথাও স্পষ্টই নিমিরাজকে বলিয়াছেন।

যথা,—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৮)

অর্থাৎ— হে রাজন্! সত্যাদি যুগের প্রজাসকল কলিতে (এই বিশেষ কলিযুগে) জন্মলাভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার এক অহোরাত্র কাল অর্থাৎ প্রায় আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসরের মধ্যে যে অভূতপূর্ব ব্যাপার— যে পরমাশ্চর্য কৃপার বিস্তার আর কখনও হয় নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হেতু বর্তমান কলি যুগের ভাগ্যে তাহার উদয় হইবার সূচনা করা রহিয়াছে। সমহিমা শ্রীকৃষ্ণনামের অবাধ প্রচারের সহিত ব্রজপ্রেম নামক মহাপুরুষার্থ, শ্রীরাধারানীর মহামহিমা, শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুর্য, এই মরজগতের সম্মুখে আবিষ্কার করিয়াছেন,— সকল মহৎ হইতেও মহীয়ান্ সেই মহাপ্রভু! সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় প্রাণভরা মহোচ্ছ্বাসের ভাষায় সকল কথা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণন করিয়া চিরধন্য হইয়াছেন। তদীয় গ্রন্থ হইতে একটি মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব।

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥

— (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-১৩০)

অর্থাৎ— প্রেম নামক পরম পুরুষার্থের সন্ধান, যাহা পূর্বে কাহারও শ্রবণপথগত হয় নাই, শ্রীনামের মহিমা যাহা পূর্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুর্য— যাহাতে পূর্বে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এবং পরমাশ্চর্য মহামাধুর্যরসের পরাকাষ্ঠাস্বরূপা শ্রীরাধা— যাঁহার মহিমা পূর্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্র প্রকট হইয়া পরম করুণায় এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

অহো! ধন্য ভাগ্য আমাদের! আমরা যতই দোষদুষ্ট হই না কেন —যতই পতিত হই না কেন—তথাপি আমরা বলিতে পারিব—আমরা সেই ধন্য কলির জীব। পরবর্তী সত্য যুগের প্রজাগণও যে কলিতে জন্ম হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিবেন। [মহাপ্রভু প্রকট কালে লীলারূপে এই কলিযুগের অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্য স্বরূপ যাহা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহারই কার্য আরম্ভ হইবে সারা জগতেরউপর—তাহার সূচনা এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল কথা—গৌরভক্তগণের পদরজের কৃপা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ আলোচনা করিতে সমর্থ হইব।]

শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য বা পরিপূর্ণ ফল—প্রেমভক্তি। শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগ ভিন্ন অন্য যুগে, নামাশ্রয়ীর অধিকার-সীমা ঐশ্বর্য-প্রধান প্রেমভক্তি— বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই যাহার পরিপূর্ণ ফল। আর এই অসাধারণ কলিযুগে, শ্রীরাধারাণীর প্রেমরসের সহিত স্ব-মাধুর্য আস্বাদন ও প্রেমাস্বাদন কার্যে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত নামের মুখ্য বা পরিপূর্ণ ফল প্রেমভক্তি হইলেও, এই প্রেম সর্বপ্রেমসার সেই মাধুর্য-প্রধান ব্রজপ্রেম ; ব্রজলোকের অনুগত সেবাপ্রাপ্তিই যাহার পরিপূর্ণ ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশেষ কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া যতদিন প্রকট ছিলেন, সেই প্রকটকালের অচিন্ত্য প্রভাবে, সেই সময়-কার সমুদয় জীব— স্থাবর জঙ্গম এককালে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। যাহারা কোন সূত্রে— কোন ভাবে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অন্য যুগবাসীর অলভ্য ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া চিরধন্য হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা তাঁহার অনুগত না হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল,— তাহারাও লাভ করিয়াছে সেই প্রেম, যাহার ফলে অন্য যুগবাসীর দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়।

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৩।৭৪)

স্থাবর জঙ্গমের সহিত এককালে সমস্ত জীব উদ্ধার করাই মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ণ প্রভাব। আর বর্তমান জগতের কর্ম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে যে সূক্ষ্ম জীবের দ্বারা, সে-সকল জীবও তাঁহার অনির্বচনীয় কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম পরিচালনের জন্য সাধারণ যুগাবতারের কোন পৃথক কার্য না থাকায়, স্বয়ং ভগবানই এই কলি-যুগের যুগধর্ম পরিচালন ভার স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-বিতরণ-কার্য বা অসাধারণ যুগধর্ম-প্রবর্তন-কার্যের দুইটি ভাগ, অবশ্যই স্বীকার্য ; যথা,—

১ম। তাঁহার প্রকটকালে বর্তমান ছিল এমন যে জীবসমূহ, তাহাদিগের এককালে উদ্ধারসাধন।

২য়। তাঁহার অপ্রকট কালের ভাবী জীব-জগত সেই প্রেম-ভক্তিতে সিঞ্চিত হইবে যে প্রকারে, তাহার "কারণ" বা বীজ, তাঁহার প্রকটলীলার মধ্যে সঞ্চার করিয়া রাখা।

তাহা হইলে এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব, মহাপ্রেমদাতা অবতার মহাপ্রভুর পরমাশ্চর্য প্রেমদানকার্য এখনও শেষ হয় নাই। ৪৩২০০০ বৎসর কলিযুগ পরিমাণ। তাহার মধ্যে ৫০২৯ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের অসাধারণ যুগধর্ম প্রবর্তনের ভারও স্ব-ইচ্ছায়— স্ব-কৃপায় তাঁহার নিজের লওয়া, সুতরাং "শ্রীগৌরাঙ্গলীলা" বলিতে কেবলমাত্র তাঁহার প্রকটকালের অতীতের আটচল্লিশ বৎসরের দিকেই যাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে গৌর-প্রভাব সম্বন্ধে অভ্রান্তবুদ্ধি নহেন ইহা স্থিরনিশ্চয়। তাঁহার জীব-উদ্ধারণ কার্যের প্রথম অংশ ৪৮ বৎসর শেষ হইলেও দ্বিতীয় অংশের কার্য শেষ হইতে এখনও প্রায় ৪২৬০০০ বৎসরের অধিক কাল প্রয়োজন! শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকটলীলার মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্যের কারণরূপে যে বীজ সুরক্ষিত হইয়াছে, এই কলিযুগের অবশিষ্ট বৎসর ধরিয়া জগতের উপর সেই কারণের এক বিরাট কার্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া

যাইবে। অদূর ভবিষ্যতে যে প্রেমভক্তি-বিটপীর সুশীতল ছায়া ব্যবহার-দাবদগ্ধ সারা জগতকে জুড়াইয়া দিবে, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রকট লীলায় বীজরূপে তাহা বপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবী জীবের মহাভাগ্যোদয়ের জন্য যে ধর্ম— যে প্রেমবীজ চারিশত বৎসর পূর্বে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল, এতদিনে তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, জগতে তাহার মহাপ্রকাশ আরম্ভ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

অতঃপর আর একটি কথা এই যে, কারণ হইতে কার্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে— ইহাই নিয়ম। মহাপ্রভুর প্রকট কালে যে প্রেম জগতে পরিদৃষ্ট হইত, তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে আজ পর্যন্ত পুনরায় তাহা বিকাশোন্মুখ না হইয়া বরং ক্রমশঃ তাহাকে লুপ্তপ্রায় হইতে দেখিয়া বিশ্বম্ভরের প্রেমে বিশ্বভরার কার্য, তাঁহার প্রকট কালেই এই কল্পের মত শেষ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের অনুমান নির্দোষ নহে। গোলোক-ভাণ্ডার-উজাড়-করা যে পরমাদ্ভুত প্রেমরাশি আনিয়া তিনি জগতের উপর স্তূপীকৃত করিয়াছিলেন, — আজ যে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, শুধু এই কথাই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি তাহা নহে, আমরা স্বপক্ষ সমর্থনের জন্যই আরও স্বীকার করিব যে, গৌর-প্রকটকালের সেই প্রেমোচ্ছ্বাস, গৌর-পরিকরগণের স্থিতিকালাবধি আংশিকরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার অপ্রকটের সাথে সাথেই তাহা বিশেষরূপে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। গৌরপরিকর-প্রধান শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, তাহা অনুভব করিয়া নিজেই সবিলাপে এই কথা তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন। যথা,—

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুত কনকগৌরো হরিরভূ-
ন্মহিম্না তস্যৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূৎ।
অভূদুচ্চৈরুচ্চৈস্তমুল-হরিসঙ্কীর্ত্তনবিধিঃ

স কালঃ কিং ভূয়োঽপ্যহহ পরিবর্ত্তেত মধুরঃ ॥

— (১৩৯)

অর্থাৎ,— যে মধুময় কালে তপ্তকাঞ্চনকান্তি গৌরহরি প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সে-কালে তাঁহার বিপুল মহিমায় জগৎ প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়াছিল। যে কালে জগভরি' উচ্চস্বরে তুমুল হরিনাম-সংকীর্তন হইত, আর কি সেই সুখময় কাল আসিবে না!

সৈবেয়ং ভুবি ধন্য গৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ।
সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তান্যেব নামানি তু।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরি হরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য কৃপানিধান! তব কিং বীক্ষে পুনর্বৈভবম্ ॥

— (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-১৪০)

অর্থাৎ— পৃথিবীতে এখনও সেই পুণ্যবতী গৌড়নগরী, সেই সিন্ধুসৈকত, সেই শ্রীপুরুষোত্তম এবং সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের হরেকৃষ্ণাদি নাম বিরাজ করিতেছেন। হরি! হরি! কিন্তু গৌর-প্রকটকালে যে প্রেমোৎসব পরিদৃষ্ট হইত, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য কৃপানিধি! তোমার সেই বৈভব আর কি পুনরায় দেখিতে পাইব!

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের আনা প্রেমধর্মের প্রাবল্য তাঁহার প্রকট কালেই যে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে আজ পর্যন্ত যে ক্রমশঃ তাহা অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং জগৎক্ষেত্রোপরি মহাপ্রভুর সযত্নে রোপিত প্রেমবীজ, কারণ হইতে কার্যের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ন্যায় ক্রমশঃ বিকাশোন্মুখ না হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইতে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমদান কার্যের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন সত্য, কিন্তু বীজস্বভাব পরিজ্ঞাত যাঁহারা, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর হইতে আজ পর্যন্ত, এই প্রায় চারিশত বৎসর কালের মধ্যে সেই প্রেমকে অদৃশ্য থাকিতে দেখিয়া, তাঁহারা এই প্রেমের অদৃশ্য কালকেও বীজের

নিরবচ্ছিন্ন বিকাশোন্মুখতার স্তর বিশেষ বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। এই চারিশত বৎসর কাল সেই প্রেমবীজের বিলুপ্ত কাল নহে,—অদর্শন কাল মাত্র।

বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হইবার সচরাচর এই অবস্থা কয়টি দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—

১ম অবস্থা। রাশি রাশি বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ক্ষেত্রের একস্থানে সঞ্চয় করা হয়।

২য় অবস্থা। তাহা ক্ষেত্রের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

৩য় অবস্থা। বপনের পর সেই বীজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছুদিন মৃত্তিকাগর্ভে তাহা আত্মগোপন করিয়া থাকে।

৪র্থ অবস্থা। অদৃশ্য বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

৫ম অবস্থা। অঙ্কুর হইতে যথাক্রমে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র-পুষ্প-ফলাদির উদ্গম হয়।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কার্য, বা তাঁহার অপ্রকট কালের ভাবী জীব-জগতে অজস্রভাবে সুদুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিবার জন্য, তাঁহার লীলায়, যে প্রেম-বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি, তাহারও বিকাশ-ক্রম উক্ত বীজস্বভাববৎ জানিতে হইবে ; যথা,—

১ম ও ২য় অবস্থা।— তাঁহার প্রকট কালের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

৩য় অবস্থা।— তাঁহার অপ্রকট কাল হইতে আর আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিতেছে।

৪র্থ অবস্থা।— আরম্ভপ্রায়।

৫ম অবস্থা।— ভবিষ্যতের ৪,২৬,০০০ বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত তাহা ক্রমশঃ বিবর্ধিত হইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর বর্তমান কল্পের মত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম, তাঁহার অপ্রকট কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিলুপ্তপ্রায় বোধ হইতেছে, ইহা বিলুপ্ত অবস্থা

নহে,— বীজ বপনের পর কিছুকালের জন্য সেই বীজ যেমন ক্ষেত্রের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেই অবস্থা জানিতে হইবে। বীজধর্মের ন্যায় তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া, সেই প্রেম-বীজের চতুর্থ অবস্থা বা অঙ্কুরদশা, বর্তমানে আরম্ভ-প্রায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরমাদ্ভুত প্রেমধর্মের যে লীলাভূমিকে শূন্য দেখিয়া, এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার-রস-প্রমত্ত জগতের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবার অবসরই পায় নাই, আজ সেই প্রেমধর্ম-বীজের কিয়দংশ সামান্যাকারে অঙ্কুরিত হইতে দেখিয়া,— জগতের কেবল সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা, উপস্থিত তাঁহাদেরই চিত্তবৃত্তি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে ; অতঃপর এই প্রেমধর্মের বীজাঙ্কুর, স্বীয় নিরবচ্ছিন্ন প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সমস্ত জগদ্ব্যাপী সূক্ষ্ম ও স্থূল সকল দৃষ্টিই আকর্ষণ করিবে। যে প্রেম-ধর্মের বিশাল বিটপীর শান্তিময়ী ছায়ায় বহির্মুখ জগতের সমস্ত গ্লানি ও উত্তাপ জুড়াইয়া দিবে,— তাহার বীজ স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তদীয় প্রকট-লীলা কালে জগৎ-ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার পর আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, যেমন সাধারণ শস্যাদির বীজ, বপনের পর অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে, প্রথমে কিছুদিন পর্যন্ত তাহাকে মৃত্তিকা-গর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়,— সেই প্রেমধর্ম-বীজেরও এখন পর্যন্ত সেইরূপ প্রথমা-বস্থা ; ক্বচিৎ কোথায়ও অঙ্কুর বা দ্বিতীয় অবস্থার বিকাশ হইতেছে মাত্র। যে প্রেম-বীজ বপন করিবার পরক্ষণ হইতে, নিজের অব্যর্থ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া— নিরন্তর বিকাশপ্রাপ্ত হইবে, তাহার পক্ষে এই অদৃশ্য অবস্থাটিও যে বিকাশধর্মেরই প্রথম অবস্থা, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর এতাবৎ-কাল পর্যন্ত, ভাবী জীবের জন্য তাঁহার বিপুল কৃপায় সংস্থাপিত যে প্রেমধর্ম, তাহা বিলুপ্তপ্রায় দেখিবার ইহাই কারণ। অঙ্কুর দশার পর হইতে সমস্ত জগতের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করে— তাহার নিরবচ্ছিন্ন

বিকাশ, যথাকালে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে— ইহা নিঃসন্দেহ।

অতঃপর আর একটি সন্দেহের বিষয় হইতেছে এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সঞ্চারিত প্রেমধর্মের পক্ষে, অঙ্কুর দশার পূর্বাবধি কিছুকাল জগতের সমক্ষে অদৃশ্য হইয়া থাকা না হয় সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেই কালে জগতের সর্বত্র কলির পূর্ণ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় কেন? ধর্ম ও অধর্ম, আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ; অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বব্যাপী প্রেমধর্মের অধিকার-সীমার মধ্যে যখন ঘোর কলির তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাইতেছে, তখন শুধু মহাপ্রভুর প্রকট কালের ৪৮ বৎসরকেই নহে— তাঁহার অপ্রকটের পর এই কলিযুগের অবশিষ্ট কালকেও এক নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-ধর্মের যুগ রূপে উল্লেখ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এখন সংক্ষেপে ইহারই কিছু মীমাংসা আবশ্যক। কালস্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলি,— সর্বদোষনিধি ও সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ। কলির প্রভাবেই কলির প্রজাগণের অধর্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। দ্বাপর যুগের শেষ দিনের পর হইতে সত্যযুগের প্রথম দিনের পূর্বাবধি কলির কর্তৃত্ব-সীমা। এই সময়কেই কলিকাল বলা হইয়া থাকে। পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। দ্বাপরযুগের শেষ ১০০ শত বৎসর ও কলিযুগের প্রথম ২৫ বৎসর শ্রীকৃষ্ণের প্রকট কাল। পূর্ণতম ভগবানের পাদপদ্ম যতদিন বসুন্ধরায় সংস্পৃষ্ট থাকে, ততদিন সেখানে কলির প্রবেশ-সামর্থ্য নাই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রকট কালের শেষ ২৫ বৎসর কলির অধিকার মধ্যে পরিগণিত হইলেও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের অবস্থান হেতু ভয়প্রাপ্ত কলি নিজ অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিতেই পারে নাই। তাই শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের প্রকট কালের এই এক বিশেষ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন; যথা,—

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।২।২৯)

অর্থাৎ— যে কাল পর্যন্ত সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদকমল দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ছিলেন সেই কাল পর্যন্ত কলি ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

যে দিন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা অপ্রকট করিয়া স্বধামে গমন করেন, ঠিক সেই দিন হইতেই কলি নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে,— তখন হইতেই কলি পাপদ্বারা জীবগণকে আক্রমণ করিয়াছে। যথা,—

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।২।৩২)

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে গমন করেন, ঠিক সেই দিন— সেই সময় হইতে কলিযুগ জগতে প্রবেশ করিয়াছে; পুরাতত্ত্ববিদগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।২।২৮)

অর্থাৎ— ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক দেহ যখন বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই সময় হইতে কলি এই লোকে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং তৎকাল হইতেই লোকসকল কলি-প্ররোচিত পাপে রত হইয়াছে।

অতএব উক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবকালে কলি সভয়ে জগতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। পরাভূত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেও, কলি অবসর খুঁজিতেছিল

নিজ অধিকারে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য। সিংহের অদর্শনে বৃক যেমন নির্ভয়ে মৃগকুলকে আক্রমণ করে, সেইরূপ নিজ ভয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে পাপ কলি কর্তৃক জগৎ আক্রান্ত হইল। রাহুগ্রস্ত সুধাকরের ন্যায় কলিগ্রস্ত জগৎ যখন সভয়ে কম্পিত হইতেছে, জগৎ-প্রবিষ্ট কলি, প্রায় ৪,৩২,০০০ বৎসর ধরিয়া, পাপভারে বসুন্ধরা প্রপীড়িত করিবে বলিয়া, বিপুল উৎসাহের সহিত যখন কেবল মাত্র কোমর বাঁধিতে সুরু করিয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ অধিকার-কালের কেবল যখন ৪৫৮৭ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে, কলির ঠিক সেই উদ্যোগ-পর্বের প্রারম্ভেই পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবার কলি-তমসাচ্ছন্ন জগতের ভাগ্য-আকাশ আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে কলি যখন নিজ অধিকার লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাপের জাল বিস্তার করিবার কেবল উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে, ঠিক সেই সময়, কল্পে একবার যে দেব-দুর্ল্লভ প্রেমরত্ন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক জীবকে অজস্রভাবে দান করিবার কথা, তাহা দিয়া যাওয়া হয় নাই বলিয়া, সহসা শ্রীকৃষ্ণ আবার ধরাধামে প্রেমদাতা শ্রীগৌররূপে আবির্ভূত হইলেন। কলিকাল-ভুজগ-ভয়হারী পূর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরহরির এই প্রকার সহসা পুনরায় আবির্ভাবের জন্য কলি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; তাই তাঁহার পুনরাগমনে একান্ত মর্মাহত হইয়া সভয়ে মৃতের ন্যায় একধারে পড়িয়া রহিল। মহাপ্রভু অজস্রধারায় নাম ও প্রেম বিলাইয়া তাঁহার স্থিতিকালের আপামর সর্বজীব, — স্থাবর ও জঙ্গম সব উদ্ধার করিলেন। শুধু তাহাদেরই উদ্ধার করিলেন তাহা নহে, তাঁহার অপ্রকট কালে যে সকল ভবিষ্যত জীব তাঁহার পাদস্পৃষ্ট সেই প্রেম-ধর্ম বিতরণের যুগে আসিবে, কলির করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদেরও প্রেমানন্দ দান করিবার জন্য পরম করুণাভরে সমস্ত জগৎক্ষেত্রোপরি প্রেমধর্মের

বীজ বপন করিয়া রাখিয়া গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের পর সন্ত্রস্ত কলি উঠিয়া আসিয়া চারিদিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিল, এ-যুগে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। নিজ যুগের এইসব অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সে বুঝিল, সাধারণ কলিযুগের মত এ-যুগটি তাহার নয়— ইহা শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমধর্মের যুগ। সারা পৃথিবী জুড়িয়া প্রেম-বীজ ছড়ান হইয়া গিয়াছে, — অঙ্কুরদশার পর হইতে ক্রমশঃ তাহার অব্যর্থ প্রভাবে বিশ্ব পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সেই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে তখন কলির পক্ষে দাঁড়ান দূরের কথা, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। এখন কলির পক্ষে একমাত্র আশা এই যে, প্রেমাবতারের নিজ হাতে বপন করা প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বাবধি যে কয়দিন ক্ষেত্র মধ্যে অদৃশ্য ভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সেই অবসরটুকুর মধ্যে তাহাকে পালাইতেই হইবে, তাহা ছাড়া— আর বিলম্ব করিলে পালাইয়া বাঁচিবারও উপায় থাকিবে না। এই স্থির করিয়া কলি এইবার এই জগৎ হইতে শীঘ্র বিনির্গত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

তবে অন্য সাধারণ কলিযুগে ৪,৩২,০০০ বৎসর ধরিয়া পাপজাল বিস্তার করিয়া সে ধীরে সুস্থে যত জীব বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, — এবার সে শীঘ্র চলিয়া যাইবার দরুণ শিকার তেমন সুবিধাজনক না হইলেও, অন্ততঃ তাহার পলায়নের অবসরটুকুর মধ্যে যত জীব সে প্রাপ্ত হইবে, প্রায় সবগুলিকে এই আগতপ্রায় প্রেমযুগের পরম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিবে না। কলি নিষ্ক্রান্ত হইবার পর, এই বর্তমান যুগ সর্ববিধ কল্যাণভূষিত হইয়া বিশ্বপ্রেমের এক মহাযুগরূপে সমস্ত পৃথিবীকে —প্রকৃত শান্তি ও সাম্য ভাবের পবিত্র বন্ধনে সংবদ্ধ করিবে।

অন্য সাধারণ কলিযুগে অধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ যখন পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, তখন সেই কলির শেষে শ্রীভগবান কল্কি

রূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপভার-প্রপীড়িতা ধরিত্রীকে কলির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রজাগণকে সত্ত্বভাবে সংস্থাপন করেন। তাহার পর হইতেই জগতে সত্যযুগের আরম্ভ হয়। কলির শেষ অবস্থা অর্থাৎ প্রায় ৪,৩২,০০০ বৎসর পূর্ণ হইয়া উঠিলে যে-সকল অধর্ম-লক্ষণ জগতে দেখা দিয়া থাকে, ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ বেদানুগত পুরাণাদি শাস্ত্রে, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সবিস্তারে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে কেবল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রবৃদ্ধ কলির লক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি স্থলের অনুবাদ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রয়োজন বোধে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, পুরাণতন্ত্রাদি বিভিন্ন মুল শাস্ত্রগ্রন্থে পরিদর্শন করিতে পারেন।

কলিযুগে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার ও গুণাদি কেবল ধনসংখ্যার উপর নির্ভর করিবে এবং ধর্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে কেবল বল মাত্র কারণ হইবে।

ভার্যা ও পতিভাবে কেবল অভিরুচিই কারণ হইবে, তাহাতে কুল-গোত্রাদির বিবেচনা থাকিবে না। ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারিক বিষয়ে প্রবঞ্চনা মাত্র, স্ত্রী পুরুষে রতি মাত্র এবং ব্রাহ্মণ দিগের কেবল সূত্রধারণ মাত্র শ্রেষ্ঠতার কারণ হইবে।

আশ্রমের পরিচয় বিষয়ে সদাচার নহে, কেবল দণ্ডাদি ধারণ এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর যাইবার কেবল চিহ্নধারণ মাত্রই কারণ হইবে। মুদ্রার্পণ বিষয়ে অসমর্থ হইলে কূটতার আশ্রয়ে মিথ্যা ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য বিষয়ে বাক্যের চপলতা মাত্র কারণ হইবে।

অসাধুতা বিষয়ে নির্ধনতা মাত্র, সাধুতা বিষয়ে দম্ভ মাত্র, বিবাহে স্বীকার মাত্র এবং স্নানাদির অন্য কোন নিয়ম থাকিবে না,— কেবল অঙ্গ পরিষ্কার মাত্র কারণ হইবে।

দূরস্থিত জলাশয়েই তীর্থ, (গুরুজন নহে) কেশধারণ লাবণ্যার্থ, উদরপূরণই পুরুষার্থ এবং সত্য ব্যবহারে ধৃষ্টতা মাত্র কারণ হইবে।

পরিজন পোষণেই দক্ষতা প্রকাশ মাত্র এবং ধর্মানুষ্ঠান কেবল যশোলাভার্থই হইবে।

প্রজাগণের মধ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও রাজকরভারে পীড়িত হইয়া শাক, মূলাদি বন্যদ্রব্য ভোজন করিয়া অনেকে নষ্ট হইবে। প্রজাগণ শীতে, হিমে, রৌদ্রে, বায়ু ও বর্ষায় এবং পরস্পর বিবাদে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, চিন্তাদিতে সন্তপ্ত হইবে। এইরূপ কলির সময়ে প্রায় কুড়ি কিম্বা ত্রিশ বৎসর মাত্র মানবের পরমায়ু হইবে।

কলির দোষে, দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, বর্ণাশ্রমাচারী লোকদিগের বেদোক্ত ধর্ম নষ্টপ্রায় হইলে, ধর্মভাবে পাষণ্ড ভাবের মিশ্রণ হইলে, রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে, মনুষ্যগণ চৌর্য, মিথ্যা, বৃথা হিংসা ও নানা বৃত্তিসম্পন্ন হইলে, বর্ণসকল শূদ্রপ্রায়, ধেনু সকল ছাগ-প্রায় (অল্প দুগ্ধবতী), সন্ন্যাসাদি আশ্রমসকল গৃহপ্রায় (অর্থাৎ গৃহা-শ্রমের ন্যায় ভোগশালী), বান্ধবতা যৌনপ্রায় (অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধ লইয়া), ওষধীসকল হ্রাসপ্রায়, বৃক্ষসকল শমীপ্রায়, মেঘসকল বিদ্যুৎ-প্রায় (অর্থাৎ তড়িদ্বহুল), গৃহসকল শূন্যপ্রায় (অর্থাৎ ধর্মরহিত) হইলে কলির শেষাবস্থা জানিতে হইবে। — (১২ স্কন্ধ ২ অধ্যায়।)

কলির দোষে স্ত্রীসকল স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। বেদসকল পাষণ্ড-গণ দ্বারা দূষিত হইবে। দ্বিজসকল শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে। ব্রহ্মচারী-সকল নিয়ম ও আচারহীন হইবে। তপস্বীসকল বন পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হইবে এবং সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হইবে।

পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুরত সম্বন্ধীয় লোকের সহিত সৌহৃদ্য থাকিবে এবং ননন্দা ও শ্যালকাদির সহিত মন্ত্রণা করিবে এবং দরিদ্র ও স্ত্রৈণ হইবে। তপোবেশোপজীবী শূদ্রসকল প্রতিগ্রহ করিবে এবং অধর্মানুষ্ঠায়ী লোকেরা উত্তমাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিবে। — ইত্যাদি। (১২ স্কঃ ৩ অঃ।)

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বর্তমান সময়ে সমস্ত জগৎ

জুড়িয়া যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, শাস্ত্রোক্ত প্রবৃদ্ধ কলির লক্ষণ প্রায় সর্বাংশে যে তাহারই অনুরূপ একথা অস্বীকার করা যায় না। অপর সাধারণ কলিযুগে ৪০০০০০ লক্ষাধিক বৎসর পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তবে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বর্তমান কলিযুগের মাত্র ৫০২৯ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই কলিশেষের সেই সমুদয় লক্ষণ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে। এক কল্পে এক সহস্র কলিযুগের মধ্যে কেবলমাত্র বর্তমান কলিযুগের এই এই বিশেষত্বই আমাদের জানাইয়া দিতেছে— এই যুগটি কোনও এক অসাধারণ যুগ। কলি যদি পূর্বে জানিতে পারিত যে, এই অসাধারণ যুগে অসাধারণ অবতার কর্তৃক কোনও এক অসাধারণ ধর্ম প্রবর্তিত হইবে, তাহা হইলে সে মোটেই এই যুগে প্রবেশ করিত না। কিন্তু চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ দ্বাপরের শেষ হইতেই সে যেমন জগতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবারেও যথানিয়মে অজ্ঞ কলি ঠিক সেইভাবেই উপস্থিত হইল। এবারকার বিশেষত্বের মধ্যে, — জগতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই চরমুখে শুনিল, কোন এক নবীন নীরদশ্যামতনু, নিখিল-লাবণ্যামৃত-ঘন-মূর্তি— কিশোর গোপকুমার, তাঁহার চপল সখাগণের সহিত ধেনু লইয়া বেণু বাজাইয়া খেলা করিতে-ছেন ; আর ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সভয়ে অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিতেছেন। এইবার চরমুখে এই রকম একটি অদ্ভুত কথা শুনিয়া, বস্তুটা কি, একবার দরজা হইতে উঁকি দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল সেই গোপকিশোরের বক্ষস্থিত উজ্জ্বল কৌস্তুভের একটি তীব্রজ্যোতিচ্ছটার স্পর্শে তাহার নয়ন অন্ধপ্রায় হইয়া গেল। কলি সভয়ে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ভাবিল, এবার কার্যারম্ভের পূর্বে যে সব অনর্থ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এবারকার যাত্রা যে খুবই খারাপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাই হউক একটু বিলম্বে সেই জ্যোতির অন্তর্ধানে— জগতে প্রবেশ করার অল্প পরেই, সে তাহার অনুমানের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইয়া তখন বুঝিল,

এইটি তাহার যুগ নহে,— ইহা প্রেমধর্মের কোনও এক অসাধারণ যুগ। ভুলক্রমে একেবারেই বুঝিতে না পারিয়া সে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখন যত শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। তবে তাহার পাপ স্বভাব বশতঃ তাড়াতাড়ি পালাইবার মুখেও স্বীয় পাপজাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে সেই প্রেমাধিকারে বঞ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তাই এইবার কলি এত শীঘ্র জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাই বর্তমান সময়ে পূর্ণ কলির সমস্ত লক্ষণ জগতে দেখা দিয়াছে।

দীপশিখা নিভিয়া যাইবার পূর্বে যেমন শেষ একবার অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে—অনতিবিলম্বেই কলির প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া, তাই বর্তমানে তাহা প্রবৃদ্ধ আকারে দেখা দিয়াছে। এইবার-কার কলিযুগের এই বৈশিষ্ট্যই জগতকে জানাইয়া দিতেছে— সুদীর্ঘ এক কল্পের মধ্যে জীবের পক্ষে যে অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয় একবার মাত্র লাভ হইয়া থাকে, বর্তমান যুগই সেই অসাধারণ ভাগ্যোদয়ের যুগ! কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলেই সত্যযুগ আসিবে না ; সত্যযুগ যথাকালে — বর্তমান যুগের ৪,৩২,০০০ বৎসর অতীত হইয়া যাইলে তাহার পর আসিবে। কলি নির্গত হইবার পর হইতে সত্যযুগের আবির্ভাবের পূর্বাবধি এই যে সময়,— ইহাই সেই অসাধারণ যুগ। এই যুগেই ভবিষ্যৎ জীবের জন্য পূর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সংরক্ষিত প্রেম-ধর্মের প্রভাব বিবর্ধিত হইয়া, সমস্ত মানবজাতিকে এক ধর্মে— এক ভাবে এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করিয়া এক অভূতপূর্ব— পরমাশ্চর্য প্রেমের প্লাবনে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রকট লীলায় যে প্রেমতরঙ্গে শান্তিপুর ডুবুডুবু করিয়া নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন, সারা জগৎ জুড়িয়া (ব্যাপী) যে প্রেম-প্লাবন আগতপ্রায়,— তাহার বীজ বা কারণ সেই লীলামধ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-অবতারের দ্বিতীয় কার্যস্বরূপ এই যে প্রেম-প্লাবনের মহাযুগ আসিতেছে, এই যুগটি

সত্ত্বগুণপ্রধান সত্যযুগ নহে—ইহা তদপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর কোনও এক বিশেষ যুগ, যাহাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে— "শুদ্ধসত্ত্ব-যুগ" বা "প্রেমের যুগ" নামে উল্লেখ করিতে পারি। তাই শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে এই বিশেষ কলিযুগের কথাই (বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ) জানাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।"

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৭)

অর্থাৎ, হে মহারাজ! সত্যাদি যুগের প্রজাসকল (এই অসাধারণ) কলিতে জন্মলাভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

সুতরাং সত্যযুগের প্রজাগণও যে কলিতে জন্মগ্রহণ মহাভাগ্যের ফল বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা যে সাধারণ কলিযুগ নহে, এ কথার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ কলিযুগে পাপ-তমোবহুল বহির্মুখ লোকসকলের যখন সামান্য ধর্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তখন পরম ধর্মস্বরূপ শ্রীহরিনামাশ্রয় বা শ্রীহরির ভজনাদিতে যে তাহারা স্বতঃই অনুরাগশূন্য হইবে তাহাতে অসম্ভাবনার কিছুই নাই; কিন্তু সত্যাদিযুগবাসীর স্পৃহণীয় এই কলিযুগে,— শ্রীগৌর-কৃপাসিঞ্চিত এই কলি-নামধেয় শুদ্ধসত্ত্বযুগে প্রায় সর্বলোকের শ্রীহরিনামাশ্রয়ে ও শ্রীহরিভজনে স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইবে।

গৃহস্থিত শুষ্ক লবণকণা যেমন বর্ষাগমে আপনিই গলিয়া যায়, সেইরূপ আগতপ্রায় এই শুদ্ধসত্ত্ব-যুগে লোকসকল স্বাভাবিক ভাবেই পরম ধর্মের সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, যাহার ফল ব্রজপ্রেম। সাধারণ কলি-যুগ হইতে বর্তমান কলিযুগের এই সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্র স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, যথা— সাধারণ কলিযুগে—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।

প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

— (শ্রীভাঃ ১২।৩।৪৩-৪৪)

অর্থাৎ— (পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিতেছেন) হে রাজন্ ! পাষণ্ডগণের যুক্তিতে হতবুদ্ধি হইয়া কলির লোকসকল ত্রিলোকের দেবগণ কর্তৃক অভিবন্দিত পাদপদ্ম এমন যে জগতের পরম গুরু ভগবান অচ্যুত,— তাঁহার পূজা আর প্রায় করিবে না ।

ম্রিয়মাণ, আতুর, অথবা শয্যাদি হইতে পতিত অবস্থায় কিম্বা ইন্দ্রিয়গণের অবশতার জন্য স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও কর্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিতে লোকেরা তাঁহার পূজা করিবে না ।

কিন্তু শ্রীকরভাজনোক্ত বিশেষ কলিযুগে—

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।"

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৮)

অর্থাৎ— (এই বিশেষ) কলিতে লোকে শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন ।

এইজন্যই, শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনবহুল এমন যে মহাধন্য এই বর্তমান যুগ,— সূক্ষ্মদর্শী— সুবিজ্ঞ মহানুভব ব্যক্তিসকল ইহাকে পরম সম্মান করিয়া থাকেন ।

"প্রণমিহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার ।
শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥"

এই বলিয়া তাঁহারা কলি-নামধেয় এই "প্রেমযুগ"কে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন ।

এইজন্য শ্রীকরভাজনের উক্তিও বর্তমান কলিযুগের এই পরম গৌরবের সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছে ; যথা,—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৫)

অর্থাৎ— যে কলিতে অন্যসাধননিরপেক্ষ একমাত্র সঙ্কীর্তন হইতে সর্ব স্বার্থই (পরম পুরুষার্থ ব্রজপ্রেম পর্যন্ত) লাভ হয়, সারভাগী, গুণজ্ঞ আর্যসকল সেই কলিযুগকে (বর্তমান যুগকে) সম্মান করিয়া থাকেন।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥

— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ— সংসারে ভ্রমণকারী দেহিদিগের (নিত্যবদ্ধ জীবের) ইহা হইতে (শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন হইতে) পরম লাভ আর কিছুই নাই, যাহা হইতে পরমা শান্তি প্রাপ্তি (রাগভক্ত্যুত্থ প্রেমদ্বারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ) ও সংসারের নাশ হয় (গৌণ বা আনুষঙ্গ ফলে)।

শ্রীনাম-সংকীর্তনের মলয় বাতাসের সঙ্গে, ব্রজপ্রেমের অমৃত ধারায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে যে মেঘে, সকল দিক জুড়িয়া তাহার উদয়াভাস দেখা দিয়াছে। পরম পুরুষার্থলাভের সেই পরম শান্তিময় দিন অতি সন্নিকট ! যে শুভদিনের উদ্দেশে—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

— (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদি ৪।১২৬)

শ্রীভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখের এই সাক্ষাৎ উক্তি, সেই "প্রেমের যুগ", বিস্তীর্ণ নদীর পরপারের মত অস্পষ্ট হইলেও তাহা দেখা যাইতেছে।

পরম শান্তিময় সেই প্রেমের যুগ অতি সন্নিকট হইয়া আসিলেও,

তাহার মধ্যে পৌঁছাইবার পূর্বে বর্তমান জগতকে কলিকৃত যে ঘোর দুর্দিনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা ভাবিতেও দুঃখে, বিষাদে, পরিতাপে হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে। একদিকে যেমন এই বর্তমান যুগ, শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ পাইবার পক্ষে কল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যুগ, তেমনি অন্য দিকে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম-বীজের বপনকাল হইতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কুরিত হইবার সময় অবধি, কলি নির্গত হইবার এই যে সময়— ইহা অপেক্ষা জগতের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম দুর্দিন কল্পের মধ্যে আর নাই। হতদর্প, ক্রূর কলি, তাহার দ্রুত নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মরণ কামড়ের মত জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার সেই উদ্‌গীরিত স্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করা সেই সময়কার অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিবে।

বর্তমান সময়ে জগতের অবস্থা চলিতেছে অনেকাংশে ইক্ষুরস জ্বাল দিবার ন্যায়। ইক্ষুরসকে জ্বাল দিলে তাহার মলিন অংশ গাদের আকারে যেমন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উপরে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া উথলিয়া পড়িয়া যায়, আর সেই মলিন গাদ সম্পূর্ণ নির্গত হইয়া যাইলে, তখন যেমন নিম্নের বিশুদ্ধ সুবর্ণের মত নির্মল ঘন রস দেখা দেয়, সেইরূপ কলিকৃত দুর্দিনের গাদ, সুনির্মল প্রেম-রসের সুদিনের উপর ফুলিয়া ফাঁপিয়া, মত্তপ্রায় নৃত্য করিয়া বিনির্গত হইয়া যাইতেছে। আর সেই কলি-মলের টগবগানির ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে তাহার অন্তরালে লুকান শ্রীগৌরাঙ্গের বিকাশোন্মুখ প্রেম-যুগের কিছু কিছু চিহ্ন উঁকিঝুঁকি দিতেছে।

সারা গাছ ফুলে ভরিয়া যাইবার পূর্বে যেমন দুই চারিটি ফুল, পাতার আড়ালে এদিকে ওদিকে ফুটিয়া উঠে, তাহার কিছুদিন পরে আর বড় একটা পাতা দেখা যায় না, তখন সম্পূর্ণ গাছটিই একেবারে ফুলে ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ ব্যবহার-রসপ্রমত্ত জগতের দৃষ্টি এখন সেদিকে আকৃষ্ট না হইলেও ইহারই তলে তলে পৃথিবীর সমস্ত সীমা

জুড়িয়া এখানে সেখানে, এদেশ ওদেশে দুই একটি করিয়া সেই প্রেম-যুগের ফুল,— সেই শুদ্ধসত্ত্ব যুগের লক্ষণ যখন দেখা দিয়াছে, তখন সেই পরা শান্তির পবিত্র ফুলে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া যাওয়ার দিন অতি সন্নিকট বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

শুধুই যে আমাদের দেশের লোক আজিকাল শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার প্রেমধর্মের উপর দিন দিন অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইতেছেন তাহা নহে, যাঁহারা এ-বিষয়ে অনুসন্ধান রাখেন তাঁহারাই জানেন আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি সকল দেশের লোক কর্তৃক (সংখ্যায় এখন যতই অল্প হউক না কেন) শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ অর্পিত হইতেছে। তাঁহার জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইটালী দেশের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক Tucci শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া তৎপ্রতি এতই অনুরক্ত হইয়াছেন যে শুনিতে পাই তিনি নবদ্বীপবাসের আয়োজন করিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার মত— আমাদের জানা বা অজানা অনেকই আছে। বাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ে আর অধিক উল্লেখ না করিয়া নিম্নে কেবলমাত্র আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করিব। কোনও সাহেব বলিয়াছেন, সুতরাং আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পন্ন হইবে,— এরূপ উদ্দেশ্যে এ সকল কথার উল্লেখ নহে ; এ সকল কথা উল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্ বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করা।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Dr. Causins তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বক্তৃতার মধ্যে যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দকে তাহা একটু স্থিরভাবে বুঝিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।

"Referring to Lord Gouranga, he (Dr. Causins) said that all movements relating to this Universal "Avatar" were local, but time would come in no

distant future when the movements would shake the world and thoughts should go forth with powers which should sleep no more."

অর্থাৎ— শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিষয় বলিবার কালে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সার্বজনীন অবতারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যদিও বর্তমান সময়ে ভারতেরই স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম সমস্ত জগতকে মাতাইয়া তুলিবে এবং তাঁহার চিন্তা ও ভাবের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত জগতকে জাগ্রত করিয়া দিবে।

তাই বলিতেছি, অনাদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে শুভাবসর কখনও পাই নাই আমরা, সেই শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যোদয়ের দিন সম্মুখে দেখা যাইতেছে। পরম কারুণিক প্রেমাবতারী শ্রীগৌরহরি, যখন ধর্মাধর্ম, অপরাধ-নিরপরাধ, ভাল-মন্দ, কোন কিছুই বিচার না করিয়া স্থাবর-জঙ্গমের সহিত সেই সময়কার জগতের সমস্ত জীব নিজে আসিয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন, কল্পের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠতম সুযোগ হারাইতে হইয়াছে আমাদের কোন দুর্দৈব বশে,— তাহা বলিতে পারি না। তখন কোথায় কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে অবিদ্যার নিগড়বদ্ধ হইয়া অবশ্যই আমরা পড়িয়াছিলাম, তাই এত বৃহৎ সুযোগও হারাইতে হইয়াছে আমাদের। হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে যাহা তাহা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই।

ত্রিতাপের তপ্ত মরু ছাড়িয়া বিনা ভাড়ায়— বিনা সর্তে চিদানন্দের দেশে যাইবার যে রাজকীয় "সেলুন" (saloon) আমাদের আসিবার ক্ষণপূর্বে স্টেশন ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কল্পে আর তাহাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে না ; কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ এখনও হাত-ছাড়া হয় নাই—আমাদের শাস্ত্র-টাইমটেবিলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব-সুযোগ-হারান— বিলম্বে-আসা যাত্রীদের কুড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য

সেই কৃপাময় রাজাধিরাজের আদেশে, আর একখানি খুব লম্বা রকমের স্পেশাল গাড়ী সারা রাত্রির যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই পিছনে আসিতেছে। জগৎ-ব্যাপারের মধ্যেও, তাহার আসিবার একটু একটু শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই গাড়ী সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় ও বিনা চুক্তিতে যাইবার নহে। "নাম" মাত্র মূল্য দিয়া আর "অপরাধ"-বর্জনের দশটি মাত্র সর্তে, এই গাড়ীতে যাইবার অধিকার সকলেই পাইতে পারিবে ; ইহা ব্যতীত অপর সকল সুবিধা পূর্ব গাড়ীর ন্যায়ই, সেইরূপ ভাবেই পরম-শান্তি-নিকেতনে এই গাড়ীও শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিবে। এই রাত্রের, এই স্পেশাল গাড়ী চলিয়া যাইবার পর, অপর দিনের, দিনে বা রাত্রে, এই দেশেরই আসে-পাশে বা আরও কিছু দূরে যাইবার অনেক গাড়ী আসিবে বটে, সেই সব হয় মালগাড়ী নতুবা সাধারণ যাত্রী গাড়ী। এই কল্পের মধ্যে চিদানন্দের শ্রেষ্ঠতম নিকেতনে— বিশ্বরাজাধিরাজের মাধুর্যময় অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিবার এই স্পেশাল গাড়ীই শেষ সুযোগ। সত্য বটে, এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্য হারাইয়াছি আমরা— একটু বিলম্বে আসার দরুণ, তথাপি সম্মুখে এই যে অসাধারণ অচিন্ত্যনীয় মাহেন্দ্রযোগ আসিতেছে আবার, এই সুযোগ ধরিতে পারিলেও আর কোন পরিতাপের কারণ থাকিবে না আমাদের। কিন্তু হায়! এমন পরম আশা ও পরমানন্দের সংবাদও একেবারে নিরাশা ও নিরানন্দ-স্পর্শশূন্য নহে।

মায়ামরু ছাড়িয়া, পরম শান্তি-শীতল চিদানন্দভবনে যাইবার সেই প্রেমযুগ-গাড়ীর অপেক্ষার পরিবর্তে বর্তমান জগৎ, কলি-ঘোর-নিশীথের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। প্রেমযুগ আসিয়া পড়িবার এই পূর্বকালাবধি এই সামান্য অবসরটুকু প্রাপ্ত হইয়া নির্গমনোন্মুখ কলি, তাহার সকল শক্তি একত্র করিয়া,— পাপ ও প্রলোভনের মহা ঝঞ্ঝা-বাতে স্বদেশ যাইবার যাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছে। বিবিধ প্রলোভন ও মোহান্ধকার সৃজন করিয়া, কলি, জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম

ভুলাইয়া দিয়াছে, যাহার বিষময় ফলে জগত আজ চৈত্যন্যময় আত্ম-ধর্মের স্থলে জড়ীয় দেহ ধর্মকেই শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র পুরুষার্থ মনে করিয়া তৎসাধনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সাক্ষাৎ কলিকৃত এই অনিষ্টপাতও তত বেশী হইত না, যে অনিষ্ট তাহার ছদ্মচর কর্তৃক সাধিত হইতেছে।

কলিপ্রভাব-সন্তপ্ত জগতের প্রায় প্রত্যেক বিষয়ই আজ কৃত্রিমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের আবরণে ঢাকা মিথ্যাস্তূপে জগৎ আজ পূর্ণপ্রায়। আসলের পরিবর্তে ভেজালে দেশ সমাচ্ছন্ন ; তাই ঘৃতে, তৈলে, বসনে, ভূষণে, কথায়, ব্যবহারে, রীতি, নীতিতে সর্ববিষয়েই ভেজাল,— কলির প্রভূত শক্তির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এসকল হইতে যে পাপ আশ্রয় করিতেছে আমাদের,— মহাপ্রভুর প্রদত্ত নামের অব্যর্থ ও অচিন্ত্য শক্তির নিকট সেই পাপের প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ। নামবলে প্রবৃত্ত না হইলে সেই সব পাপ পুড়াইয়া দিতে— একটি নাম নহে — এক নামাভাসের শক্তিই যথেষ্ট। অতএব কলিকৃত ঝঞ্ঝাবাতে আমাদের বড় বেশী ভয়ের কারণ ছিল না ; কিন্তু নানা আবরণধারী কলির ছদ্মচরগণ আজ যে সমস্ত দেশ বিদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে ; ইহার চেয়ে বর্তমান সময়ে ভয় ও ভাবনার বিষয় আর কিছুই নাই। ভেজাল ঘৃত চেনা বরং সম্ভব হইতে পারে কিন্তু কলির ছদ্মচর চেনা এক প্রকার অসম্ভব। মরুদস্যুগণের ন্যায় কলিচরগণ, বন্ধুবেশ ধারণ করিয়া, দেশে যাইবার যাত্রীদিগকে স্নিগ্ধ চরণামৃতের নামে তীব্র মদিরা পান করাইয়া একেবারে উদ্ধত ও উন্মত্ত করিয়া ফেলিতেছে—যাহার বিষময় ফলে এত বড় অপরাধ হইয়া যাইতেছে তাহাদের, যে অপরাধ বাহ্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি না হইলেও, তাহার গুরুত্ব এতই বেশী যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে শেল অপেক্ষাও তাহা ভীষণ ভাবে আঘাত করিয়া থাকে। সর্বংসহ ভগবান সব সহ্য করিতে পারেন— পারেন না কেবল কাহারও এই শ্রেণীর অপরাধ সহ্য করিতে। যখনই এইরূপ অপরাধ অল্প

পরিমাণেও ধরাপৃষ্ঠে কোথাও কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঘটিয়াছে, তখনই কুসুমাদপি কোমল শ্রীভগবান বজ্রাদপি কঠোর হইয়া, সেই অপরাধের দণ্ড দিতে নিজেই অস্ত্রধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সর্বংসহ ভগবানেরও অসহ্য হয় যে অপরাধ দেখিলে তিনি স্বয়ংই দেবতাগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া, জগতের জীবগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥

—(শ্রীভাঃ ৭।৪।১৭)

অর্থাৎ,— যখন দেবতায়, বেদে, গোসকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও আমাতে (শ্রীভগবানে) কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, সে অবশ্যই শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে অপরাধ কখন কোথাও কোন ব্যক্তি-বিশেষে সংক্রামিত হইলেই শ্রীভগবানকে তাহার সংশোধনরূপ দণ্ডের জন্য অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, কলিচর কর্তৃক প্রতারিত হইয়া, সেই অপরাধে আজ প্রায় সর্বজগৎ আক্রান্ত হইতে যাইতেছে। অতএব অধিকাংশ জগজ্জীবের ধ্বংসও অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।

বর্তমান কলিযুগে শ্রীভগবানের অস্ত্রধারণ লীলা নাই। অন্য কলিযুগের শেষ দশায় লোকসকল যখন এইরূপ অপরাধ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন শ্রীভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া "ম্লেচ্ছনিবহ নিধন" করেন। বেদবিগর্হিত আচারের নামই ম্লেচ্ছাচার। ভগবানের অসহনীয় পূর্বোক্ত অপরাধসকল ম্লেচ্ছাচারের অন্তর্গত ও তন্মধ্যে প্রধান। নির্গমনোন্মুখ কলিকর্তৃক তাড়িত হইয়া বর্তমান জগৎ ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পূর্ণতম ভগবান এই যুগে বিশেষ যুগধর্ম প্রবর্তনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, এই যুগে অংশ বা আবেশাবতারাদির কোনও পৃথক কার্য নাই। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া শ্রীভগবানকে —"প্রেমযুগের" প্রবর্তন করিতে হইতেছে। পূর্বে

মায়িক মৌষল লীলায়, শ্রীভগবান যেমন স্বহস্তে নহে, কিন্তু স্বইচ্ছায় যদুবংশ পরস্পরের দ্বারা ধ্বংসসাধন করাইয়াছেন, সেইরূপ এক্ষণে বহির্ম্মুখতায় —বেদবিগর্হিত আচারে জগৎ পূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিলে, সেই শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায়, কল্কি অবতারের নিধনশক্তির রক্তমেঘ সমস্ত জগদাকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া তাহারই প্রভাবে সমস্ত রাষ্ট্রীয় জগতের রাজশক্তির ভিতর পরস্পর এমন এক এক অভূতপূর্ব ভীষণ লোকক্ষয়-কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত করিবে, যাহার ফলে সে-সময়কার এক-চতুর্থাংশ লোকমাত্র ধ্বংসের কবল হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলস্বরূপ, ব্যবহার-রস-প্রমত্ত জগতের গতি এইভাবে চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে এই ভাবেই তাহা প্রশমিত হইবে। তাহার পর হইতেই শান্তভাবপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর উপর শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমধর্ম" সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিবে ; তাহার পর হইতেই এই কলি-যুগের অবশিষ্টকাল, সত্যযুগেরও পূজনীয় এক "শুদ্ধ সত্ত্ব-যুগ" রূপে বিবেচিত হইবে। এই পরম আনন্দ ও বিষাদের,— এই পরম সুদিন ও দুর্দিনের সন্ধিস্থলে জগৎ আগতপ্রায়।

যে অপরাধের ফলে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসের অনলশিখা প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, যদি এখনও আমরা সেই ধ্বংসের পথ হইতে খুব দ্রুত গতিতে স্বধর্মের দিকে ফিরিয়া আসিতে পারি তবে কলিমলস্বরূপ সম্মুখের এই আগতপ্রায় ধ্বংসাভিনয়ের প্রতিরোধ হইয়া, তৎস্থান হইতেই পরম শান্তিময় "প্রেমযুগের" আরম্ভ হওয়া অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান জগৎ সেই ধ্বংসের করাল কবলের এতই সন্নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে রোধ করা কোনও জৈবী-শক্তি দ্বারা আর সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, সম্প্রতি মহামতি কেলগ্ (Kellogg) সমস্ত জগৎ জুড়িয়া এইরূপ কোনও

এক ধ্বংসাভিনয়ের সূত্রপাত দেখিয়া, তাহারই প্রতিরোধ-চেষ্টায় সন্ধিপত্র হস্তে লইয়া পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের দ্বারে এই যে ছুটাছুটি করিলেন, তাঁহার সেই প্রচেষ্টা (Kellogg Pact) যদি সফলতা-মণ্ডিত হয়, তবে তাহা হইতে অধিক আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু সব দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমরা সে আশা কোনক্রমেই পোষণ করিতে পারি না। যে আদর্শে আমাদের স্বদেশ ও স্বভাবকে একেবারে ঢালিয়া নূতন ছাঁচে গড়িয়া নিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি আমরা, সেই আদর্শ-প্রসূত শ্রেষ্ঠতম ফল যে জগতের কিরূপ মঙ্গল বিধান করিবার জন্য, প্রবল উদ্যম ও উল্লাসের সহিত দিন রাত ধরিয়া সঞ্চিত করা হইতেছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ নমুনা সংবাদপত্র হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কোনও এক অনির্বচনীয় সুদিনকে পশ্চাদবর্তী করিয়া, আগতপ্রায় যে দুর্দিনের কথা আমরা বারবার উল্লেখ করিতেছি, ইহা সে বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য।

"লণ্ডনের ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহ ব্যাপিয়া লণ্ডন নগরীর উপর যে কৃত্রিম বিমান যুদ্ধের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে। * * * রয়টারের প্রতিনিধি, ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলেন যে, বিমান আক্রমণের ফলে, সহরগুলি ধ্বংস, লোকের প্রাণহানি ও অন্যান্য সর্বনাশ হইবে এবং ইহার প্রতিরোধ করা অসম্ভব। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ কেলগ পৃথিবীর যুদ্ধ নিবারণের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা মানিয়া লইবার জন্য রুশিয়ার সোভিয়েট সরকার ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ লয়েড জর্জ বলেন, 'পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ যখন সর্বনাশকর অস্ত্র-সমূহকে নিখুঁত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন, তখন যুদ্ধ নিবারণের

এই সমস্ত চুক্তিপত্র একান্তই ব্যর্থ। ভবিষ্যতের বিমান আক্রমণ হইতে কোনও সহরকে রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব। এই সমস্ত বিমান রণ-সম্ভারকে বেপরোয়া ভাবে হ্রাস করা যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিমান সৈনিক রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার জলের মত টাকা ব্যয় করিতেছেন ; কিন্তু এক সপ্তাহের কৃত্রিম যুদ্ধের ফলে দেখা গেল যে, ইংলণ্ডের বিপদের সময় ঐ সমস্ত সৈনিক কোনই কাজে লাগিবে না।' ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গ্রোভসও মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলে ধ্বংস ও লোকক্ষয় অনিবার্য। তিনি আরও বলেন যে লণ্ডন রক্ষার কথা এখন আর না ভাবিয়া, কি প্রকারে শত্রুপক্ষীয় সহরগুলিকে বোমা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া যায়, এখন সেই চেষ্টা করাই ভাল।"— আনন্দবাজার পত্রিকা—৪ঠা ভাদ্র ১৩৩৫।

যেমন ইংলণ্ডে তেমনি সকল দেশেই পরস্পরের বিরুদ্ধে এই মহাধ্বংসাভিনয়ের বিরাট আয়োজন, অদম্য উৎসাহের সহিত দিবা রাত্র ধরিয়া পাল্লা দিয়া চলিতেছে! বর্তমানে আমাদের জাতি, সমাজ ও স্বভাব গঠনের যাহা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, তৎপ্রসূত সুফলের ইহাই নমুনা! ভগবদিচ্ছায়, যাহা হইবার তাহা হইবেই, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। সুতরাং এই আগতপ্রায় ধ্বংসের জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। অনাদিকাল হইতে ধ্বংসের রাজ্যে নিপতিত আমরা, কতবার কত মহাপ্রলয় অবধি দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। মৃত্যুর রাজ্যের প্রজা আমরা, মৃত্যু ত আমাদের চিরাভ্যস্ত সামগ্রী— নিত্য সহচর। সুতরাং সেজন্য চিন্তিত বা ভীত হইবার লেশমাত্রও কারণ দেখা যায় না। তবে কথা এই যে,— যে পরম পুরুষার্থ— চিরবদ্ধ জীবের যে পূর্ণতম স্বাধীনতা প্রায় ৮৬৪,০০০০০০০ আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসরের মধ্যে কোনও সময়বিশেষে একবার মাত্র জীবের ভাগ্যে অতি সহজে লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতম শুভকাল— সেই অমলশুভ্র প্রেমধর্মের যুগ সম্মুখে দেখা যাইতেছে! সেই সুদিনের এত

কাছে আসিয়াও যদি সাময়িক উত্তেজনা ও অনবধানতার বশে, তাহার সম্মুখস্থ এই ক্ষণস্থায়ী দুর্দিনের গাদের সঙ্গে আমরা নির্গত হইয়া যাই, তবে যে কি মহাভাগ্য— কি মহারত্ন, অতি অল্পের জন্য হাতছাড়া হইয়া গেল আমাদের, সেকথা বুঝাইবার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাই না ; যিনি ভাবগ্রাহী তিনি বুঝিয়া লইবেন—এই পর্যন্ত বলিয়া রাখিলাম।

অবশ্য বর্তমান জগৎ যদি কলিপ্রভাবে, আগতপ্রায় সেই শ্রেষ্ঠতম সুদিন হইতে বঞ্চিত হয়, তবে এই যুগের অবশিষ্টকালব্যাপী প্রায় চারিলক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া যত লোক সেই অনির্বচনীয় সুদিনের সৌভাগ্য উপভোগ করিবে, তাহাদের তুলনায় বর্তমান লোকসংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম-যুগের মধ্যে এই অত্যল্প ক্ষতিকালকে, সমস্ত যুগব্যাপী পরম লাভের তুলনায় ক্ষতি বলিয়াই বিবেচনা করা যায় না। সমষ্টির হিসাবে এই ক্ষতি নগণ্য হইলেও ব্যষ্টির হিসাবে—ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পরমার্থের কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এত বড় সুদিনের এত কাছে আসিয়াও একটি জীব একটি ক্ষুদ্র কীটও যেন এই ভাগ্যোদয় হইতে বঞ্চিত না হয়।

সমাজ আবর্জনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার যথাবিহিত সংস্কার একান্তই যে প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মধর্মই সাধ্যবস্তু, সমাজসংস্কারাদি সমস্তই তাহার সাধনা। সাধনা অপেক্ষা সাধ্যের স্থান যে সর্বোচ্চে একথা কাহারও অবিদিত নাই। তাই মনুষ্য-সমাজের যাঁহারা পরম হিতৈষী, তাঁহারা আত্মধর্মকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া, তাহারই অনুগত ও অনুকূল যে সকল রীতিনীতির সাময়িক পরিবর্তনাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহারই সংস্কার-কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, জগতের মহোপকারকরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্তু আত্মধর্মকে বলিদান দিয়া তাহার সমাধির উপর যদি কেহ পাশ্চাত্য আদর্শে দেহাত্মবোধ-রূপ জড়ধর্মের পাষাণ প্রাচীর নির্মাণে বদ্ধপরিকর হয়েন, তবে তাঁহার সে চেষ্টা যে কলির

পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাবান্বিত, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সুসজ্জিত গৃহ, বহুদিন সংস্কারের অভাবে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার সংস্কারসাধন করিতেই হয়, ইহার বিরোধী হওয়াও মহাপাপ। তবে কথা এই যে, যদি আমরা ঘরের ঝুল ঝাড়িতে গিয়া-মহামূল্য স্ফটিকের ঝাড় নিপাতিত ও বিচূর্ণিত করিয়াও ঝুল ঝাড়ার গৌরবে আনন্দিত হই, তবে সেরূপ প্রয়াস যে শুধুই জগতের অনর্থরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যসমাজে আত্মধর্মই অমূল্য স্ফটিকের ঝাড়, বর্ণাশ্রম ও সমাজসংস্কারাদি— ঝুল ঝাড়ার কার্য।

এখনও জগৎ যদি ফিরিয়া দাঁড়ায়,— এখনও যদি চৈতন্যময় আত্মধর্মকে সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেহেন্দ্রিয়ের সুখ-চেষ্টারূপ জড়ধর্মকে তাহার পাদপীঠরূপে সংস্থাপন পূর্বক সত্বর পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয়, তবে মহা আনন্দের এই মহা অভিযান হইতে বর্তমান জগতের বড় কেহই বঞ্চিত হয় না। এত কাছে পাওয়া এত বড় সুযোগ হাতছাড়া হইলে, সে দুর্ভাগ্য রাখিবার জায়গা নাই।

জানি, করতলের দ্বারা সমুদ্রের গতিরোধ করা যায় না; ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত বর্তমান জগতের গতিও রোধ করা সেইরূপ সম্ভব নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষীণ কণ্ঠের চীৎকার-ধ্বনি— এত বড় জন-কোলাহল ভেদ করিয়া কাহারও কর্ণে পৌঁছাইবে না। যদি-বা কাহারও শ্রবণে প্রবেশ করে, তবে "বাতুলের প্রলাপ" রূপেও যে পরিগণিত হইবে না, বর্তমান সময়ে এরূপ ভরসা করাও যায় না। এ-সকল কথা যে-ভাবেই গৃহীত হউক, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি বা বৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। তবে উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি কাঙ্গালের কথা, শুনা যায়, বাসি হইলে মিষ্ট লাগে। সুতরাং এই কাঙ্গালের কথাও সেইরূপ কোনও একদিন মিষ্ট লাগিবে। তবে বাসি না হইতে যদি টাট্‌কাতেই মিষ্ট

লাগিত, তবে সব চীৎকার সার্থক হইত— জীবনের সাধ মিটিয়া যাইত। কিন্তু হায়! তুচ্ছ আমি,— সর্ববিষয়ে অযোগ্য ও অধম হইয়া কেমন করিয়া এত বড় সুখের আশা পোষণ করিব! যদি সুযোগ্য ও সামর্থ্যবান এমন কেহ থাকেন, যাঁহার কাছে আমার এই সকল কথা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে না, তবে এই মাত্র অনুরোধ,— জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের জন্য, তাঁহার সমস্ত সামর্থ্য ও সুযোগ একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কলি-বিমোহিত— জড়ভাবাপন্ন জগতকে জাগাইয়া তুলিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম আশা ও আনন্দের বার্তা জানাইয়া দিন।

যাহা হউক, আপনাদের ধৈর্যের উপর এতক্ষণ ধরিয়া যে অত্যাচার করা হইল তাহার জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি,— শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমধর্ম" সমস্ত জগতের সর্বজনীন ধর্মরূপে যেদিন সম্পূজিত হইবে—সেদিন খুব সন্নিকটবর্তী।

দ্বাপরের যে বংশীধ্বনি চরাচর সমস্ত বিশ্বকে পুলকিত, বিমোহিত ও আকর্ষিত করিয়া দশদিক মধুময় করিয়া দিয়াছিল,— সেই শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিই বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্তিত "প্রেমধর্ম", যে প্রেমের সুশীতল স্পর্শে পৃথিবীর সকল তাপ প্রশমিত হইবে,— যে প্রেম চরাচর সমস্ত বিশ্বকে অমৃতময় করিয়া দিবে— জীব-জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন যে অবশ্যম্ভাবী, এ-কথা পৃথিবীর কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণেরও মস্তিষ্কে উদয় না হইয়াছে এমন নহে। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞবর মহানুভব লর্ড হেলডেন্ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন; তাহার কিছুদিন পূর্বেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন,— "The music of Krishna's flute has not yet reached the West."—ইহার তাৎপর্য এই যে, যে অমৃতময় বংশীরবে পৃথিবী পূর্ণ হইবে, শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশী-ধ্বনি এখনও পাশ্চাত্য জগতে পৌঁছায় নাই। খৃষ্টীয় ধর্মের আচার্য ডঃ ওয়ালটার (Rev. Dr. Walter

Walsh, D.D.) কিছুদিন পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বংশী (Krishna's flute) নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,— "I could almost think that Krishna's flute is India's message to the world to-day." ইহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান (শ্রীকৃষ্ণের গুণ, লীলা, শিক্ষাদি) বর্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবীর নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল-বার্তা। তাই বলিতেছি আবার, পরচিন্তা-প্রসূত পথে পরিচালিত না হইয়া যদি আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি পাইতাম, তবে আত্মধর্মের একমাত্র লীলাভূমি-স্বরূপ যে ভারত সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুরু-রূপে ভক্তি-অর্ঘ্য পাইবার গৌরব ধারণ করে, সেই ভারতের পক্ষে শুধু বিশ্বজাতির সভায় সমান আসন প্রাপ্তিকেই শ্রেষ্ঠতম গৌরব বলিয়া কখনই মনে করিতাম না।

এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তির পূর্বে আর একবার আমরা, জীব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের ও গৌরবের দিন, সেই পুণ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
৫ম বর্ষ ১২ সংখ্যা, (আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল) হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ,
৫ম সংখ্যা, (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল) পর্যন্ত।

শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা বা প্রেমযুগের অভ্যুদয়ের পরিশিষ্ট

সাধারণভাবে দ্বাপরান্ত যুগের নাম "কলিযুগ" বলিয়া বর্তমান এই যুগও কলিযুগ নামে কথিত হইয়া থাকে। এই অসাধারণ যুগে, সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেমধর্ম, সার্বজনীন ধর্মরূপে একযোগে বিশ্বের প্রায় সকল মানবকে পরিপূর্ণতা বা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্তমান কলিযুগ "প্রেম-যুগ" নামে উক্ত হইবার যোগ্য। কালস্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'কলি'। দ্বাপরযুগের শেষ দিনের পর হইতে সত্যযুগের প্রথম দিনের পূর্বাবধি কাল, কলির কর্তৃত্ব-সীমা। এই সময়কেই কলিকাল বলা হয়। কলি সর্বদোষনিধি ও সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ। কলির প্রভাব বশতঃই সাধারণতঃ কলিযুগের মানবগণ স্বভাবতঃই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও পারলৌকিক বিষয়ে অবিশ্বাসী বা এক কথায় ভগবৎ-বহির্মুখ হইয়া থাকে। কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে, কলির প্রভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া শেষ কলিতে নাস্তিকতা বা অধর্ম পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া থাকে ; ইহাই সর্ব সাধারণ কলিযুগের নিয়ম। সাধারণ কলিযুগের শেষ কলির যে-সকল প্রভাব বা লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বর্তমান কলিযুগের প্রথম বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর মাত্র অতীত না হইতেই পূর্ণ কলির প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে ; বর্তমান কলিযুগের এই এক বৈশিষ্ট্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়, ইহা কলি বিনির্গত বা অন্তর্হিত হইবার নিদর্শন। এক বিরাট প্রেমযুগের অভ্যুদয়-সূচনা জানাইয়া দিয়া কলি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে ; এইজন্য অপর কলিযুগ হইতে বর্তমান কলিযুগের ইহাই অসাধারণত্ব। এই কলিযুগকে

'প্রেমযুগে' পরিণত করিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি নিজে আসিয়া ইহার উপর প্রেমবীজ বা প্রেমের কারণ বপন করিয়া গিয়াছেন। যেমন শস্যাদির বীজ বপনের পর অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে, প্রথম কিছুদিন তাহাকে মৃত্তিকাগর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়, গৌরলীলায় সঞ্চারিত প্রেমধর্ম-বীজেরও এখন পর্যন্ত সেইরূপ প্রথমাবস্থা ; ক্বচিৎ কোথাও অঙ্কুর বা দ্বিতীয়াবস্থার বিকাশ দেখা দিয়াছে মাত্র। কারণ বা বীজরূপে প্রেমতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু— নদে ভেসে" গিয়াছিল, অদূর ভবিষ্যতে তাহারই কার্য বা ফলরূপ এক মহাপ্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দিয়া সারা জগতকে ডুবু ডুবু করিবে। যে কলিযুগে বিশব্যাপী প্রেমধর্মের বীজ বা কারণের সঞ্চার হইয়া গিয়াছে, সেই প্রেমক্ষেত্রের উপর কলির অবস্থিতি নিতান্তই অসম্ভব ; তাই অন্যান্য কলিযুগের শেষ লক্ষণ, শ্রীগৌর-প্রকটিত এই অসাধারণ কলিযুগের প্রথমেই প্রকাশ পাওয়ায় কলির নিষ্ক্রমণ ও প্রেমযুগের আগমন বা অভ্যুদয় সূচিত হইয়া উঠিতেছে। নিভিয়া যাইবার পূর্বে প্রদীপ যেমন শেষ একবার প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ প্রথম কলিতে পূর্ণ কলির প্রকাশ, ইহা কলি নিভিয়া যাইবার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। নিজ যুগকে পরহস্তগত হইবার সূচনা দেখিয়া ক্রোধান্ধ কলি 'মরণ কামড়ের' মত অবসান প্রাপ্তির পূর্বে একবার তাহার পূর্ণ ও শেষ প্রভাব দেখাইয়া দিতেছে।

চিদাত্মবাদের পবিত্র আসনে দেহাত্মবাদ বা জড়বাদকে সংস্থাপন করাই কলির শ্রেষ্ঠতম শক্তি ; যাহার বিষময় ও অবশ্যম্ভাবী ফল— ধর্মে আনাস্থা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এই দুই অনর্থ-কীটের দংশনে চিৎকণ জীবের অন্তরস্থিত চিদ্‌বৃত্তির পাপড়িগুলি জীর্ণ হইয়া যায় ও সেইস্থানে এক বিকট শুষ্কতা জাগিয়া উঠে— যাহার অপর নাম নাস্তিকতা। বর্তমান জগৎ কলিপ্রভাবকৃত জড়বাদ বা নাস্তিকতার এক প্রবল ঝড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিবার

জন্য সারা বিশ্ব যেন বিদ্রোহীভাব ধারণ করিয়াছে! প্রকাশ্যে আস্তিকতা পোষণ করিয়াও আবার অন্তরে অনেকেই জড়বাদী। জীবের এই জড়ভাব কলিপ্রভাবে প্রতিক্ষণে যতই দ্রুত হইতে দ্রুততর বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে, জড়ের উপাসনা বা কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল লালসা, সান্নিপাত রোগীর পিপাসার ন্যায়ই দুর্দমনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। বহির্মুখতার খরস্রোতের সম্মুখে এখন একখানি জীর্ণ কঙ্কালের মতই ধর্ম ভাসিয়া চলিয়াছে। ধর্মই বিশ্বকে ধারণ করেন। ধর্মের বন্ধন যতই শিথিল হইয়া পড়ে,— সাম্যভাবের পরিবর্তে বিশ্বে বৈষম্য ভাব বা অস্থিরতা ততই জাগিয়া উঠে। আত্মধর্মের অবমাননা হইতেই বর্তমান জগদ্‌ব্যাপী অসমতা বা অশান্তির উদ্ভব। সকল বৈষম্য, সকল অস্থিরতা, সকল হিংসা-বিদ্বেষের একমাত্র কারণ আত্মধর্মের শৈথিল্য। শুধু জীব-জগতে নহে, জড়-জগতেও এক অসাধারণ— এক অশ্রুতপূর্ব বৈষম্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই যে অস্বাভাবিক ঝটিকা, ঘূর্ণিবাত্যা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্পন, আগ্নেয়গিরির অনল উদ্গীরণ, দুর্ভিক্ষ, মহামরক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতির সংবাদ প্রায় প্রতিনিয়তই পাওয়া যাইতেছে— ইহারও একমাত্র কারণ সেই ধারণরজ্জু বা ধর্মের শিথিলতা

একযোগে সারা বিশ্বব্যাপী এই যে অস্থিরতা বা অশান্তভাব,— এই অসাধারণ লক্ষণ সকলই জানাইয়া দিতেছে— একযোগে সারা বিশ্বব্যাপী কোনও এক বিরাট সাম্যতা বা শান্তভাব আগতপ্রায়। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মই সেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদ বা পরম শান্তির উপায়স্বরূপ হইয়া, এই নির্গতপ্রায় কলির অবসানেই ক্রমশঃ উদিত হইবেন। গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। চঞ্চল হইবার জন্যই নহে— স্থিরতা প্রাপ্তি না-হওয়া পর্যন্তই যে-কোন পদার্থ অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বর্তমান জগতের এই দারুণ অস্থিরতা অবশ্যই যে কোন এক পরম সুস্থিরতা প্রাপ্ত হইবার পূর্বরূপ

বা উদ্যোগ মাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে শান্তিকে, যে স্থিরতাকে— যে সমতার মহামিলনকে জগৎ অন্বেষণ করিতেছে, সেই প্রেমধর্মের অভ্যুদয় যে প্রাদেশিক বা আংশিক না হইয়া বিশ্বব্যাপী আকারেই উদিত হইবে— এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চলতাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। ঝটিকা-বিধ্বস্ত রজনীর অবসানের পর যেমন বালারুণ-চুম্বিত স্নিগ্ধ ঊষার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এই কলি-কৃত জড়বাদ বা নাস্তিকতার অবসানেই প্রেমবাদের স্নিগ্ধ ও শান্ত উষার আলোকে আবার জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। হিরণ্যকশিপুর বৃদ্ধি ঘটিলে যেমন প্রহ্লাদের বিকাশ হয়, তেমনি কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃষ্ট আনন্দের আবির্ভাব বা প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইবে। জগতের সেই সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন— সেই দিনের আর বেশীদিন বিলম্ব নাই।

শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল ও অমঙ্গলের সংযোগস্থলে বর্তমান জগতের অবস্থিতি।

অচিন্ত্য শ্রীগৌরলীলা-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া বর্তমান জগৎ, কল্পের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠতম দুর্দিন ও সুদিনের প্রায় সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্গমনোন্মুখ কলির পূর্ণ প্রভাবের পশ্চাতে, জগন্মঙ্গল প্রেম-যুগের অভ্যুদয়,— ইহা জগতের ইতিহাসে এক অশ্রুতপূর্ব ও অঘটন ঘটনা! প্রেমাবতার— পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট লীলার প্রভাবে ও ইচ্ছায়, তাঁহার অপ্রকট কালেও বর্তমান বিশ্ব সর্ববিষয়েই এক পরম বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতেছে। প্রেমধর্মই সেই অচিন্ত্যনীয় প্রভাবের পূর্ণ ফল বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি —সকল ক্ষেত্রেই গৌণভাবে সেই একই প্রভাব কার্য করিতেছে।

পাশ্চাত্য ভাবের ঘোর এখনও আমাদের সম্পূর্ণ কাটে নাই

বলিয়া, আমরা সর্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণে হয়তো এখনও কিছু দিন তিথি অপেক্ষা ইংরাজী তারিখকেই অধিক সম্মান করিব। তথাপি মহান ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি, আত্মমহিমায় ইহা অপেক্ষাও কোনও এক বিরাট ও উচ্চতর সম্মানকে ভূষিত করিবার জন্য নিজ প্রভাবে সেই অভিযানের শেষ সীমা পর্যন্ত পরিচালিত করিয়া যাইবেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। যতদিন পর্যন্ত প্রেমযুগের সুস্পষ্ট আবির্ভাব না হয়, ততদিন জগতের অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন ও রহস্যময় ঘটনাসকল আমাদিগকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াই রাখিবে।

যদিও শুভলক্ষণ অপেক্ষা অশুভকর ও আশঙ্কাজনক ব্যাপারই উপস্থিত অধিক পরিস্ফুটাকারে দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেও বিচলিত হইবার কারণ নাই ; যেহেতু অল্পাকারে দেখা দিলেও, সেই জগন্মঙ্গল প্রেম-যুগের আগমন-লক্ষণ কলিকৃত এই মহা আস্ফালনের মধ্যেও মাঝে মাঝে পরিদৃষ্ট হইতেছে। মথিত সমুদ্র হইতেই যেমন অমৃতের উদ্ভব হয়, তেমনি বর্তমানে এই নানাভাবে তোলপাড়-করা জগতের ভিতর হইতেই— এই বৈষম্যের প্রবল সংঘর্ষণ হইতেই যে প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইবে— শুধু ভারতে নয়— সমগ্র বিশ্বের এই বৈষম্য— এই অস্থিরতা— এই চাঞ্চল্য— এই সকল বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন, সেই সংবাদ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে!

সমুদ্রমন্থনে অমৃত উত্থিত হইবার পূর্বে যেমন দুইচার ঝলক্ হলাহলও উঠিয়া পড়ে, বিনিষ্ক্রান্তপ্রায় কলিকৃত অনর্থসকল সেইরূপ কালকূটসদৃশই জগতবাসীর পক্ষে আপাততঃ ভয়াবহ হইলেও, ইহার জন্য হতাশ হইবার কারণ নাই। সমুদ্রমন্থনের মূলে কূর্মদেবরূপে যিনি বিদ্যমান থাকিয়া নীলকণ্ঠের দ্বারা সেই হলাহলের প্রতিকার করাইয়াছিলেন, সেইরূপ কূর্মদেব প্রভৃতি নিখিল অবতারের যিনি অংশী, সেই পূর্ণতম ভগবান যখন স্বয়ংই এই কলিমন্থনের মূলে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন জগতের উপর কলিকৃত বৈষম্য-বিষ বমিত হইলেও,

সেই বিষোদ্গারের প্রতিকার তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আভাসেই সম্ভব হইয়া যাইবে—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার যেমন মথিত সমুদ্রের ঘাত প্রতিঘাত, উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, কমলা ও কৌস্তুভের অভ্যুদয়েই থামিয়া যায় নাই, যে-পর্যন্ত অমৃতকুম্ভ মাথায় লইয়া ধন্বন্তরীর আবির্ভাব না হইয়াছিল; সেইরূপ জগতের অপর মঙ্গলসকল এই আন্দোলনের ফলে একে একে যাহাই কেন না সমুত্থিত হউক, এই অস্থিরতার সম্পূর্ণ বিরাম সে-পর্যন্ত অসম্ভব, যে-পর্যন্ত না প্রেমধর্ম মাথায় লইয়া সেই প্রেমযুগ, কলি-ঘোরতিমির ভেদ করিয়া, তরুণ তপনের ন্যায় ক্রমশঃ সমুদিত না হয়েন।

দুর্দিনের প্রবল আবর্তনের মধ্যে সুদিনের পূর্বাভাস।

উষার তরুণ আলোকের মত যে প্রেমধর্ম বিশ্বে জাগিয়া উঠিবে, পুরাতনের ভস্মাবশেষ হইতেই তাহার অভ্যুদয় হইবে। সনাতন ধর্ম — নিত্যবস্তু; কোনও অবস্থাতেই ইহার সম্পূর্ণ বিলোপ অসম্ভব। সময়বিশেষে অনুকূলতার মধ্যে বর্ধন ও প্রতিকূলতায় সংকোচন হয় মাত্র। যে-কোন অবস্থার মধ্যেই হউক— তাহার অস্তিত্ব লোপ কখনও হয় নাই বা হইতে পারেও না। বর্তমান সময়ে ধর্মের যে কঙ্কাল মূর্তি, জড়বাদ-প্রমত্ত জগতের সম্মুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার ভস্মাবশেষ হইতে ধীরে ধীরে আবার যে বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে— তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বিরাট সাম্যবাদ।

কোনও এক প্রবল বেগকে যখন তাহার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তখন প্রথম অবস্থায় সেই দিক্‌পরিবর্তন কার্য সহসা না হইয়া অল্পে অল্পে সমাধান হওয়াই সমীচীন; নচেৎ প্রবল বেগ অকস্মাৎ প্রতিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক হইয়া থাকে।

পরম মঙ্গলময়— সর্বশক্তিমান— সর্বকারণ-কারণ— মহামহিম-

ময় শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য যে কখন কাহার ভিতর দিয়া কিভাবে সম্পন্ন হইতেছে, একা তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা জানেন না ; তবে কার্য দেখার পর হয়তো কারণের কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে মাত্র।

যদিও ধর্মনির্ণয়ে ত্রিকালদর্শী অভ্রান্ত ঋষিবাক্যই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ-রূপে সর্বকালেই গ্রহণীয়, তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় যে সময়ে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনসমাজের পরিচালকরূপে গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাদের আচরণ ও উক্তির প্রভাব তৎকালে অধিক পরিমাণে জনসাধারণের উপর বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য বর্তমান সময়ের বিশ্ববরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ-রূপে বিবেচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচার ও উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তন্মধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত বিষয়ের সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়েও অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম কার্যের অভ্যন্তর দিয়া, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অপর কোনও এক উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির সূচনা দেখা যাইতেছে— একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে তাহা উপলব্ধি হইতে পারে।

কালপ্রভাব-কৃত বিমুগ্ধতা বশতঃ যে মুহূর্তে জগতের এক প্রবল জনসঙ্ঘ কর্তৃক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ বিঘোষিত হইল, জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম অশুভের ভিতর বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানব-রূপে সম্মানিত যিনি, সেই মহাত্মা গান্ধী, যেন ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া, সেইরূপ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করিলেন, "ঈশ্বরের কৃপাই তাঁহার একমাত্র বল ও ভরসা। আকাশে যেমন গ্রহগণ সত্য— আকাশে যেমন ঈশ্বর সত্য—" ইত্যাদি জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ উক্তি দ্বারা কলিকৃত সেই ঘোর অনর্থের বেগ যে অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে—এ-কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবৎ-বহির্মুখ গতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন-লক্ষণ ইহার মধ্যে আছে কিনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সে-কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন—ইহাই অনুরোধ।

শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ— জগন্মঙ্গল তাঁহার 'নাম'— অদূর

ভবিষ্যতে যাহা অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরম সাধনারূপে বিবেচিত হইবেন, কলিকৃত বিমুগ্ধতা বশতঃ এক প্রবল জনসঙ্ঘের নিকট যখন সেই নামাশ্রয়কে কতিপয় অলস ও উৎসাহ-বিহীন ব্যক্তির বৃথা সময় কাটাইবার উপায়রূপে বিবেচিত হইতে লাগিল, জগতের সেই ঘোর অশুভ মুহূর্তের ভিতর ভগবানেরই প্রেরণায় জগতে মহামানবরূপে বিবেচিত যিনি, সেই উদ্যম ও উৎসাহের শ্রেষ্ঠ প্রতীক মহাত্মা গান্ধী, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামকেই আশ্রয় করিয়া, তাঁহার বিরাট কর্মের পথে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীভগবন্নামের অলৌকিক শক্তির উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাসের সাক্ষ্যস্বরূপ নিম্নে সংবাদপত্র হইতে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব,—
Whenever he (Mahatma Gandhi) heard that violence was being done by those who profess non-violence whether as creed or policy, he became agitated and it was only after a minute's pause and uttering "Ram-Nam" that he regained his balance."
— The Basumati (English) Dated Baisakh 2, 1337

ইহার তাৎপর্য এই যে, (মহাত্মাজী নিজেই বলিয়াছেন) তিনি পূর্ণ অহিংসব্রত গ্রহণ করা সত্ত্বেও, যখন অহিংস লোকের উপর প্রতিপক্ষের হিংসাচরণের কথা শ্রবণ করেন, তখন সহসা তাঁহার হৃদয়েও ক্রোধের উদ্রেক হয় ; কিন্তু সেই সময়ে সংযতভাবে কিছুক্ষণ 'রামনাম' উচ্চারণ করায়, নামের অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি পুনরায় মনের স্থিরতা সম্পাদনে সমর্থ হয়েন।

যে নামাশ্রয়, বর্তমান জগতের প্রেমধর্মের সাধনমন্ত্ররূপে পূজিত হইবেন,— অদূর ভবিষ্যতে শ্রীভগবন্নামের যে বিরাট যজ্ঞস্থলে, বিশ্বমানব একত্রে সম্মিলিত হইবে, শ্রীভগবানের সেই জগন্মঙ্গল নামের প্রতি, কলিপ্রভাব-কৃত জনসাধারণের অনাস্থারূপ ঘোর অশুভ লক্ষণের ভিতর

অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্ত মহাত্মাজীব উক্ত আচরণ সেই আগতপ্রায় প্রেম-যুগের কিঞ্চিৎ আভাস কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকৃত বহির্ম্মুখতা প্রভাবে, বৈষ্ণবতার প্রতি যে সময়ে ও যে অবস্থার মধ্যে সাধারণের উপেক্ষা ও বিদ্বেষভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল ঠিক সেই সময় শ্রীভগবানের প্রেরণায় মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গের জন্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান করিতে যাইবার সময় তাঁহার মুখ হইতে কেবল বৈষ্ণবের মহিমাসূচক ভজন-গান ব্যতীত আর কোনও বাণী নির্গত হয় নাই, একথা সকলেই জানেন। বর্তমান সময়ে দেশের সর্বপ্রধান শক্তিশালী পুরুষ যিনি,— তিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের যশ-কীর্ত্তনকারী! কলিকৃত বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ বহির্ম্মুখ প্রবাহের কোনও পরিবর্তন-লক্ষণ এই ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে কি না, নিরপেক্ষভাবে সকলে ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ।

কলিকৃত ভগবৎ-বহির্ম্মুখতার ঘোর অনর্থকর গতি শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে আবার যে পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া, প্রেমধর্মের বিরাট প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইবে, সেই সুমঙ্গল ও শান্তিময় পথের প্রথম দ্বার আস্তিকতা, দ্বিতীয় দ্বার নামাশ্রয়, তৃতীয় দ্বার বৈষ্ণবতা; বিষ্ণুময় জগৎ দর্শন হইলেই, বিশ্বব্যাপী সাম্যধর্মের— শ্রীগৌরলীলা-প্রভাবকৃত প্রেমধর্মের অভ্যুদয় ঘটিবে।

অতঃপর যেমন উচ্চকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব যিনি,— তিনিও একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তিনিও একজন নামাশ্রয়ী, তিনিও একজন বৈষ্ণব, তেমনি যে ঈশ্বরবিশ্বাস, যে নামাশ্রয়, যে বৈষ্ণবতা জগতের শ্রেষ্ঠ মানবকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, সেই ভগবানের বিশ্বাস— সেই ভগবানের নামকীর্তন— সেই ভগবানে ভক্তি যে জীবের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু মনে হয় একথাও গৌরবের সঙ্গে সকলেই বলিতে পারেন।

প্রেমযুগ অভ্যুদয়ের অপর শুভ সূচনা এই যে,— জড়বাদের

বিষময় ফল হইতেই "হিরণ্যকশিপু ভাব" বা কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা সমুদ্ভূত হইয়াছে ; কলিপ্রভাবকৃত এই জড়তার মোহে জীবের চিদ্‌ভাব যখন আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে যেন কাহার কুহকমন্ত্রে এই পরম অশুভকর ভাবদ্বয় যেন মনুষ্যকে আপনিই পরিত্যাগ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। শাস্ত্রে একটি কথা আছে ;—

ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্তজ্যতেহ্যসৌ।"

অর্থাৎ যেমন, যোগী কর্মকে ত্যাগ করেন না, কর্মই যথাকালে যোগীকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যে কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা, মনুষ্যের চিদ্-ভাবকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল যথাকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া, জগতের সেই অনর্থকর ভাবদ্বয় যেন আপনিই অপসারিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

জগতের নারীগণ মায়া-নিদ্রার অবসাদ হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছেন। কলি-প্রভাব-বিমুগ্ধ "কামিনী"ভাব পরিহার করিয়া জগজ্জননী— মহাশক্তির প্রতিমূর্তি তাঁহারা— তাঁহাদের স্বরূপভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য, বিলাসের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়া শক্তিরূপে আবার জাগিয়া উঠিতেছেন তাঁহারা। যদিও তাঁহাদেরই এই পরিবর্তনের গতি, গন্তব্যপথের শেষ সীমায় পৌঁছাইবার এখনও ঠিক সময় আসে নাই, তথাপি এই গতি ক্রমশঃ যে সেই কেন্দ্রাভিমুখেই ছুটিবে, বর্তমান জগদ্‌ব্যাপী নারী-আন্দোলনের ভিতর তাহার সূচনা নিহিত আছে। "কামিনীভাবের" মোহপাশ-বিমুক্ত নারীগণের শক্তিরূপে জাগরণ,— যখন শক্তিমান শ্রীভগবানের সেবিকারূপে— আরাধিকারূপে পরিণত হইবে, তখনই হইবে সেই শক্তির পূর্ণ সার্থকতা।

বিশ্বব্যাপী নারীশক্তির জাগরণে প্রেমযুগের আবির্ভাব-বিষয়ক একসাথে দুইটি অনুকূলতা সংসাধিত হইতেছে। নারীগণ যেমন কলিকৃত মোহপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া, স্বরূপভাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়ায় অন্যদিকে জড়-

বাদের বিষাক্ত ফল— নাস্তিক্য-সভ্যতা— যাহা সেই সভ্যতা-বিহঙ্গমের দুইটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষ— এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ভগবদ্-বিমুখ সভ্যতা-বিহঙ্গমের "কাঞ্চনই" অপর পক্ষ। এই কাঞ্চন-ভাবরূপ অনর্থও যেন মানবের দৃঢ়মুষ্টি হইতে আপনিই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বর্তমান জগতের অর্থ-সমস্যা—অর্থের অনাটনভাব দেখিয়া সরকারের বড় বড় অর্থ-সচিবগণও তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ; অর্থনীতিজ্ঞ পুরুষেরা নানাজনে নানা কথা বলিতেছেন। মানবের প্রসারিত হস্তের বাহিরের সীমায় গিয়া অর্থসমস্যা যেন আপনিই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অকস্মাৎ এই অর্থসঙ্কটের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে না পারিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে যাহা অন্তর্হিত হইতেছে, মানবের সহস্র চেষ্টায়ও তাহার প্রতিবিধান করা অসম্ভব। বস্তুতঃ এই রহস্যও যে ১৪০৭ শকের পূণ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমার সহিত দৃঢ়ভাবে বিজড়িত সে-কথা— আমরা আরও কিছুদিন অতীত না হইলে বুঝিতে পারিব না। এইরূপে দুই-পাখা-ভাঙ্গা পক্ষীর ন্যায়, বর্তমান সভ্যতা-বিহঙ্গম যেভাবে আপনিই ধূলিবিলুণ্ঠিত হয়, প্রেমযুগের অভ্যুদয়-বার্তা জানাইয়া দিবে, তাহার কোনও আভাস উক্ত ব্যাপারের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় কি না, নিরপেক্ষ-ভাবে সকলে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, আমাদের এইমাত্র অনুরোধ।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মই বিশ্বমানবের আত্মধর্মরূপে পরিগৃহীত হইবার নিদর্শন।

জগতের বর্তমান অবস্থায় হয়তো অনেকে ধারণা করিতেই পারেন না, কেবল মাত্র বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্মরূপে বিবেচিত যে গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম, তাহা কি প্রকারে সমস্ত ভারতবাসীর— শুধু তাহাই নহে— সমস্ত বিশ্বমানব কর্তৃক নিজ ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে

পারে? ইহার উত্তরে, প্রথমে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল অসম্ভব সম্ভব হয়, তবে যদি তাঁহার সেরূপ কোনও ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপাততঃ আমাদের নিকট উহা যতই অসম্ভব বোধ হউক না কেন, উহা সম্ভব হইবে-ই হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধর্ম বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত যাহা, তাহাই একদিন অদূর ভবিষ্যতে সার্বজনীন ধর্মরূপে সারা জগতে সমাদৃত হওয়া আপাততঃ অসম্ভব মনে হইলেও, ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে, তাহা সম্ভব হইবার অবশ্যই সম্ভাবনা। আজ আমরা যাহা অসম্ভব মনে করিতেছি, কাল তাহা সম্ভব হইতে দেখিতেছি, এমন কত ঘটনাই ত জগতে নিয়ত ঘটিতেছে; অতএব দৃঢ়তার সহিত 'অসম্ভব' বলা কোন বিষয়েই সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম, বিশ্বমানবের আত্ম-ধর্মরূপে পরিগৃহীত হওয়া যে অসম্ভব নহে, আপাততঃ সে বিষয়ে অন্ততঃ আভাস মাত্রও অনেক ঘটনায় পাওয়া যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীতে মধুরভাবে অনন্তমাধুর্য-মণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ— শ্রীভগবানের উপাসনা,— যাহা, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্মের-সারমর্ম, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতার ভাবে বিশ্ববাসী বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়াছেন, যদি তাহার মধ্যে কোনও কবিতার ভাবের সহিত বৈষ্ণব কবিগণের ভাবের কিছুমাত্র একতা থাকে, আর তাঁহার সেই কবিতার ভাবও অনাদৃত না হইয়া যদি জগতের সর্বত্রই আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হয় তবে বিশ্বের ভাবের হাটে, পূর্ণ আকারে শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদ যে একদিন বিকাইতে পারে না, এইরূপ অসম্ভাবনার কল্পনা করা সঙ্গত কি না, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। যোগ্যকাল সমাগত হইলেই যে-সকল গ্রন্থাদি শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদ বহন করিতেছেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে তাহা ভাষান্তরিত হইয়া উপযুক্ত প্রচারকের দ্বারা সর্বজগতে প্রচারিত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য পুরুষগণ, ঈশ্বর-প্রদত্ত অসাধারণ নিজ শক্তিদ্বারা, নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র ভাবেই জগতের উপর তাঁহাদের বিপুল কীর্তি পরিনির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই বিরাট কর্মের ভিতর দিয়া হয়তো তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের অপর কোন এক উদ্দেশ্য (যাহার কথা আমরা এযাবৎ বলিয়া আসিতেছি।) পূর্ণ হইবার কোনও সূচনা পরিলক্ষিত হইতে পারে।

বর্তমান জগতের উক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের কার্যের ভিতর দিয়া যেমন তাঁহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শ্রীচৈতন্যের সার্বজনীন প্রেমধর্ম প্রবর্তনের অনুকূল ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপরাপর অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উক্তির ভিতর দিয়াও ঠিক সেই উদ্দেশ্য সেই ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের জানা বা না-জানা আরও অধিক থাকিলেও কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই চারিটি মাত্র উল্লেখ করিব,—

যে খোল করতাল সহযোগে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম-গুণ-লীলাদি কীর্তনকে, কলিপ্রভাব বশতঃ কেবল কতিপয় কর্মহীন-বৃদ্ধভাবাপন্ন বৈষ্ণবের ব্যবহার্য বিষয় বলিয়া উৎসাহী জগতের অনেক লোকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল, সেই বিষাক্ত বুদ্ধি যাহাতে পুনরায় পরিশুদ্ধ হইয়া তাহার অনর্থকর গতির পরিবর্তন হয়, ভগবানের ইচ্ছায় পরলোকগত পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির ভিতর দিয়া তাই সেই শুভলক্ষণ অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত বাঙ্গালার সংকীর্তন-সম্পদ যে কেবল বৃন্দাবনবাসী বৃদ্ধের জন্য নহে, ইহা উদীয়মান তরুণদিগেরও পূর্ণতা সম্পাদনের পক্ষে পরম উপযোগী, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক ছিলেন যিনি —সেই স্যর আশুতোষের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি তৎকালে যে উদ্দেশ্যে বা যে ভাবেই এই কথা

বলিয়া থাকুন শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদের সার্বজনীনতার নিদর্শন, তাঁহারই ইচ্ছায়, এই পুরুষশ্রেষ্ঠের উক্তির ভিতর দিয়াও অভিব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্বে স্যর আশুতোষ বলিয়াছিলেন ;—

"আমি যদি কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তবে য়ুনিভারসিটিতে খোল করতাল বাজাইয়া দিয়া যাইব।"(১) তাঁহার এই অপূর্ণ অভিলাষ, অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ কোনও একদিন যে অবশ্যই সমাগত হইবে,— ইহা তাহার পূর্বাভাস মাত্র।

নিম্নোদ্ধৃত স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উক্তির ভিতরেও পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির কতখানি লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়,—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয়ের উক্তি,— "আমার জীবনের পরিবর্তন আনিয়াছেন— শ্রীগৌরাঙ্গদেব ; শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্তি আমার সব কুসংস্কার— সব দোষ দূর ক'রে দিয়েছেন ও দিবেন।"(২)

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি,—

"বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ জানেন না যে ভারতের অপরাপর প্রদেশে তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শক্তি কিরূপভাবে কার্য ক'রছে। যেখানে একবিন্দু যথার্থ ভক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, উহা নদীয়াকেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমহুঙ্কারের মাহাত্ম্যকণিকা।"(৩)

যেমন কোন ফুল সারা দেশময় ফুটিয়া উঠিবার পূর্বে, এখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে দুই একটি মাত্র ফুটিয়া জানাইয়া দেয়— সেই ফুল সারা দেশ জুড়িয়া ফুটিয়া উঠিবার দিন নিকটবর্তী, তেমনি প্রায় সকল দেশে— সকল ভাবের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের উদয়াভাস যেমন বর্তমানে অল্প বিস্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই ধর্ম, বিশ্বমানবের আত্ম-ধর্মরূপে সারা বিশ্বে বিকাশ হইবার দিন নিকটবর্তীই জানিতে হইবে।

যদিও বর্তমান অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সার্বজনীন ধর্মরূপে সকল ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক যে পরিগৃহীত বা সমাদৃত হইবে, এইরূপ ধারণা অসম্ভব মনে হইতে পারে ; কিন্তু উহা যে বাস্তবিক অসম্ভব নহে তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করিলাম। আপাততঃ দৃষ্টান্তবিষয়ের ন্যূনতা দেখিয়া কেহ হয়ত ইহা অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কিন্তু এই কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, স্বল্পতা হইতেই সকল আধিক্যের অভিব্যক্তি।

"বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীচৈতন্য। তাঁর কথা ভাল করে জানা না থাকলে, শিক্ষাও যেমন অসম্পূর্ণ— দেশভক্তিও তেমনি ভূয়া।"(৪) —ব্রহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু। (সম্মিলনী-সম্পাদক)

"আমরা বিশ্বাস করি, এমন দিন আসিবে যখন সমগ্র জগতে ধর্ম-পিপাসু ব্যাকুল-আত্মা নরনারীগণ এই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনের মাধুর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন এবং শ্রদ্ধাভরে ইহার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন।"(৫) —শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম এ.

(ব্রহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক)

"এমন উদার ও সুন্দর ধর্ম জগতে এ পর্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমার ইচ্ছা, য়ুরোপের প্রতি গির্জায় গির্জায় শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত পঠিত হউক।"(৬)—সুবিখ্যাত ষ্টেভ্ সাহেব। (সম্পাদক রিভিউ অফ রিভিউ)

বর্তমান সময়ে বহুল পরিমাণে না হইলেও যখন ইংলণ্ড-নিবাসী সুপণ্ডিত মিঃ নিকসনের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ইংরাজকে বৈষ্ণবধর্মের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবৈরাগী" নামের সহিত পরম সমাদরে ললাটে সুদীর্ঘ তিলক ও কণ্ঠে পবিত্র তুলসীমালা ধারণ করিয়া, সমধিক গৌরবান্বিত দেখা গিয়াছে তখন অদূর ভবিষ্যতে তদীয় স্বদেশবাসীগণের পক্ষেও যে উক্ত ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হইবে, ইহা তাহার পূর্বসূচনা মাত্র। যখন ব্রাজিল প্রদেশের মহামান্য কন্‌সল্ জেনারেলের মত একজনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হরিসভার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া

শতমুখে ও মুক্ত হৃদয়ে শ্রীগৌরমহিমা বলিতে বলিতে ভাবাবেশে আত্মহারা ও অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতে দেখা গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে তদ্দেশবাসীর মধ্যেও যে এই ভাব সংক্রামিত হইবে— ইহা কেবল তাহার পূর্বাভাস মাত্র। যখন ইটালী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Professor P. Tucchi-র মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে অনুশীলন করিতে দেখা গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার স্বদেশ-বাসীর সমীপেও যে এই ধর্ম বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, ইহা কেবল তাহারই পূর্বসূচনা মাত্র।

অতুল ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে আজন্ম পালিতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আজন্ম বিবর্ধিতা হইয়াও, সেই আমেরিকা-নিবাসী মহিলাগণের মধ্যে আপাততঃ বেশী না হউক— অন্ততঃ একজনকেও যখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের ভাবে বিভাবিতা হইয়া ব্রজগোপিকার ন্যায়ই নিজেকে সেই ব্রজরাজকুমারের— শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা বলিয়া সানন্দে আত্ম-পরিচয় দিতে শুনা গিয়াছে, তখন দূর ভবিষ্যতে, সেই দেশের কেবল পুরুষ নহে, নারীগণকেও যে উক্ত ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে— ইহা কেবল তাহার পূর্বাভাস বলিয়াই জানিতে হইবে। নিম্নে এইরূপ দৃষ্টান্তের দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিব।

শ্রীমতী মেরী লুইসা নাম্নী আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো -নিবাসিনী মহিলার উক্তি :—

"আমি ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মার শান্তি সুখ পাইয়াছি। * * * আমি অদ্য হইতে আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, গৃহ, বৈভব ইত্যাদি সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিতেছি। হে কৃষ্ণ আমি তোমার দাসী।"(৭)

শ্রীমতী জি. বি. এডামস্ নাম্নী আমেরিকার চিকাগো-নিবাসিনী মহিলার উক্তি ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাই ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাসুধা পান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আর কোন ধর্মই মিষ্ট বলিয়া অনুমিত হইবে না।"(৮)

শ্রীমতী অভেদানন্দের (আমেরিকান মহিলা) উক্তি :— "যে পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃতের সন্ধান না-পাইয়াছিলাম, ততদিন আমি যীশুকে ভজিতাম। এখন পূর্ণাবতার প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গচরণ চিনিতে পারিয়াছি। এখন একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই আমার প্রাণের দেবতা।"(৯)

দ্বাপরের যে বংশীধ্বনি, চরাচর সমস্ত বিশ্বকে পুলকিত, বিমোহিত, ও আকর্ষিত করিয়া দশদিক মধুময় করিয়া দিয়াছিল,— সেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম-বাণী। যে প্রেমের সুশীতল স্পর্শে পৃথিবীর সকল তাপ প্রশমিত হইবে,— যে প্রেম চরাচর সমস্ত বিশ্বকে অমৃতময় করিয়া দিবে,—জীব-জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম আনন্দের দিন যে অবশ্যম্ভাবী, এইকথা পৃথিবীর কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণেরও মস্তিষ্কে উদয় না হইয়াছে এমন নহে।

পৃথিবী অবধি যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৪।১২৬)

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যদ্ উক্তির সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আজ সর্ব বিষয়ে জগতের এই দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে; বিশ্বব্যাপী এক বিরাট প্রেমযুগের আবির্ভাবই এই সকল পরিবর্তনের মুখ্য ও চরম লক্ষ্য।

উপসংহার।

জগতের এই আগতপ্রায় মহাসৌভাগ্যের দিন, এক ঘোরতর দুর্দিনের অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছে। যদিচ কলির প্রভাব অবিলম্বেই

(১) হইতে (৯) সংখ্যক প্রমাণোক্তিগুলি পানিহাটী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দিরের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অস্তমিত হইবে, কিন্তু অস্তমিত হইবার পূর্বে, তাহার শেষ আক্রমণ জগতের উপর এতই ভীষণাকার ধারণ করিবে যে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব! পতঙ্গ যেমন প্রজ্জ্বলিত অনলের উপর তাহার অন্তিম লক্ষন প্রদান করে, সেইরূপ এক পক্ষে বিনষ্টপ্রায় কলির সর্বাপেক্ষা অধিক ও শেষ আক্রমণ পড়িবে গিয়া ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর। সুতরাং এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকেও অগ্নি যেমন মরণোন্মুখ পতঙ্গের আস্ফালন অবিচলিতভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ মরণোন্মুখ কলির পদাঘাত স্থিরভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পক্ষে সাধুদিগকেও এই সময়ে এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কলি-কালাগ্নির হল্‌কা—তাঁহাদের বুকের উপরই বেশী আসিয়া লাগিবে। এই সময়ে অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন ও অপমান, ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগের শেষ পরিশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে; যিনি যত ধীর, স্থির ও প্রশান্তভাবে সে সব "শুদ্ধি" মাথা পাতিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারাই হইবেন ঈশ্বরের যথার্থ প্রিয়পাত্র। বিশ্বব্যাপী সেই নবযুগের অভ্যুদয়ে, তাঁহারাই হইবেন প্রেম-প্রচারের অগ্রদূত। ভগবানের গৌরব-পতাকা বহন করিবার এই মহাভাগ্য পাইতে হইলে এখন হইতে প্রয়োজন তাহার আয়োজন। দুর্দিনের অন্ধকার যতই ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ ততই উজ্জ্বল করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম ও ভগবানের জয়গান নির্ভয়ে ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হইবে! ধর্ম ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আবার যে সংগ্রাম সমস্ত জগতের উপর ঘোষিত হইবে, শেষ পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ভগবানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া, ভগবদ্ভক্তদিগকে এখন হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যদি কাহারো সহযোগ না-ই পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাসী সৈনিকের ন্যায়, একাকীই এই বিশ্বাসের যুদ্ধে অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া, প্রয়োজন হইলে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবার জন্য এখন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। একজনও

যথার্থ ভগবদ-বিশ্বাসীর পবিত্র শোণিত, যখন নির্যাতকের হাত গড়াইয়া বসুন্ধরার উপর পড়িবে, তখনই সেই শোণিতাহুতি হইতে কোটি কোটি বিশ্বাসী ভক্তের বিকাশ ও কলি-প্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ একই সাথে সংঘটিত হইবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ পরীক্ষার দিন নিকটবর্তী; শ্রীগৌরলীলায়, ঠাকুর ব্রহ্ম-হরিদাসের বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতের মধ্যে যাহার বীজ বা কারণ সঞ্চারিত রহিয়াছে, ব্যাপকরূপে তাহারই কার্য আরম্ভ হইবার দিন আগতপ্রায় জানিতে হইবে।

কলিপ্রভাব-বিমুগ্ধ, উদ্ধত ও অসংযত জনতার অত্যাচার যেদিন সাক্ষাৎভাবে ভক্ত-শরীর স্পর্শ করিবে, কলিপ্রভাব আশু বিনষ্ট হইবার তখনই ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সর্বংসহ ভগবানেরও অসহ্য হয় যে অপরাধ দেখিলে, তিনি স্বয়ংই তাহা প্রকাশ করিয়া জগতের জীবগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥

—(শ্রীভাঃ ৭।৪।২৭)

অর্থাৎ যখন দেবতায়, বেদে, গো সমূহে, ব্রাহ্মণে, ধর্মে, আমাতে ও সাধুগণের প্রতি কাহারো বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, তখন তাহার বিনাশকাল সমাগত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই সকল অপরাধের মধ্যে সাধুর প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠতম অপরাধ।

যদি উক্ত ঘোরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে জগতের ঈশ্বর-বহির্মুখতা ব্যাধির শেষ লক্ষণ যে ভক্তাবমাননা— তাহা যদি প্রকাশ না পায়, তবে তাহা হইতে অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত দুর্দৈব বশতঃ যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে সেই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসাস্বরূপ অনতিবিলম্বে এক অভূতপূর্ব প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ সমস্ত জগতের উপর সমারব্ধ হইয়া জড়বাদের সকল উষ্মা—সকল

উদ্ধতভাব একেবারে প্রশমিত করিয়া দিবে— তাহার আয়োজনও জগতের তলে তলে চলিতেছে। আগামী যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে জগতের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই আশঙ্কান্বিত। এই বিষয়ে কেবল একটি মাত্র প্রমাণ সংবাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি : —

"জার্ম্মানীর সেনাপতি বার্টহোল্‌ড ভন্ ডিমলিং বিগত মহাসমরের পূর্ব হইতে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পূর্ণ শান্তিবাদী হইয়াছেন এবং জগতে শান্তি স্থাপনের কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরায় যে মহাসমর বাধিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহার ভীষণত্ব সম্বন্ধে তিনি নিম্ন-লিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ভাবী যুদ্ধে বিমানপোত বাহিনীর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করা অসম্ভব। বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা ও বিষবাষ্পের দ্বারা নগরবাসীদিগের হত্যা অনিবার্য! বিমানবাহিনী হইতে নগর রক্ষা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে ফরাসীরা নিয়ো সহরে, ইংরাজরা লণ্ডন সহরে এবং ইটালীয়রা মিলান সহরে পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। কোন স্থানেই পরীক্ষা সফল হয় নাই।

বিষবাষ্প হইতে নগরবাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য মুখোস পরিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহা ব্যবহারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। দেশের সকল নগরের অধিবাসীদিগকে ঐরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব। সম্ভব হইলেও ছোট ছোট বালক-বালিকা ও নিতান্ত শিশুদিগের প্রাণরক্ষা কি উপায়ে করা যাইতে পারে ?"

— বসুমতী, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

কলিকৃত জগতের উত্তাপ এইভাবে প্রশমিত হইলে তাহার পর হইতেই এই যুগের অবশিষ্টকাল সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে বিরাট সাম্যধর্ম, — মহামিলনের যে বিরাট উৎসব জাগিয়া উঠিবে,— তাহা পূর্ণতম ভগবান,—মহাপ্রেমাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম। ঈশ্বরেচ্ছায়

যথাসময়ে নিখিল জাতিসঙ্ঘের সভাস্থলে ভারত সমান আসন প্রাপ্ত হইলেও, কেবল এই ধর্মগৌরবের জন্য নিখিল জাতিসঙ্ঘ স্বেচ্ছায় ভারতকে উচ্চাসন প্রদান করিবে।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
৮ম বর্ষ, ১১ ও ১২শ সংখ্যা,—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল।

——

শ্রীনাম বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা

শ্রীভগবান ও তাঁহার নাম যে অভিন্ন তত্ত্ব—এক বস্তু, একথা শাস্ত্র অতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারিলেও তদ্দ্বারা প্রবন্ধটিকে বৃথা ভারাক্রান্ত না করিয়া, সাধারণ পাঠকগণের সুখবোধের নিমিত্ত নাম ও নামীর অভেদাত্মক দুই একটি মাত্র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত ১১।৫০৩)

ইহার অর্থ ঃ— চৈতন্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ এবং তাঁহার নামের অভিন্নতা বশতঃ নামও চিন্তামণিস্বরূপ,— পূর্ণ শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত।

ইহার টীকায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন— "নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব, অপিতু চৈতন্যলক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ।"— ইহার অর্থ,— নামই চিন্তামণি। যেহেতু নাম সকল অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ। নামে যে কেবল সর্বার্থপ্রদাতৃত্ব শক্তিই আছে, তাহা নহে ; নাম চিদানন্দরস-বিশিষ্ট **স্বাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই**।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শ্রীভগবান ও তাঁহার নাম যে অভেদতত্ত্ব,—একথা শাস্ত্র সুস্পষ্টাক্ষরেই মায়ামুগ্ধ জীবকে জানাইয়া দিতেছেন।

কেবল শ্রীভগবান সম্বন্ধে নাম ও নামীই যে অভেদ-বস্তু তাহা নহে, শ্রীভগবান, তদীয় শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম—এই তিনই একবস্তু— অভেদতত্ত্ব। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন ;—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ ॥" (২।১৭ অ)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপে শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীনামে কোন ভেদ নাই ; এই তিনই চিদানন্দময় ও একবস্তু।

সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্যস্বরূপ হইতেছেন শাস্ত্রবাক্য। অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত বিষয় নির্ণয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কিছুই নাই,— ইহা সুধীবৃন্দ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, ইহা যে অভিন্নতত্ত্ব,—একথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

তবে, এত বড় একটা মহাসত্যকে কেনই বা আমরা সেভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না ?— এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। শ্রীভগবান হইতে তাঁহার শ্রীবিগ্রহাদিকে পৃথকরূপে ও শ্রীভগবান হইতে তদীয় নামকে ভিন্নরূপে উপলব্ধি করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদিগকে একটু স্থিরচিত্তে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীভগবান যেমন অপ্রাকৃত বস্তু,— সুতরাং চিন্ময় ও নির্গুণ (সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-রহিত) নাম ও নামীর এবং বিগ্রহ ও স্বরূপের (অভিন্নতা বশতঃ) নাম ও বিগ্রহ সেইরূপ চিন্ময় ও অপ্রাকৃত বস্তু। অনাদি সংসারবদ্ধ জীবের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই প্রাকৃত বা জড়ময়। জড়ময় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর স্বরূপ

কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অন্ধের সম্মুখে "রূপ", বধিরের নিকট "শব্দ" এবং রসনাহীন ব্যক্তির বদনে "রস" বিদ্যমান থাকিলেও, তাহাদিগের পক্ষে যেমন সেই সেই বিষয় থাকিয়াও না-থাকার মতই বোধ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম— এই তিন এক হইয়াও চিন্ময়তা প্রযুক্ত, অবিদ্যায় সংবদ্ধ জীবের জড়ময় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, তাহাদের পরিছিন্ন চিত্তবৃত্তি ও মায়িক ইন্দ্রিয়াদির সমক্ষে ভিন্নাকারে উপলব্ধি হয়, এবং সেই কারণেই, যাঁহার সত্তায় জগতের অস্তিত্ব সেই পরম সত্য শ্রীভগবানকে 'নাই' বলিয়া এবং নিত্য-অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামকে "সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র" বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। কেবল যে উক্ত বিষয়ত্রয় সম্বন্ধেই ভ্রম হয় তাহা নহে, শ্রীভগবানের ধামাদি চিচ্ছক্তির বিলাস মাত্রেই জীবের উক্ত প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত বিষয়কেও প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করা ইহা অবিদ্যা-বিড়ম্বিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির স্বভাব বা স্বধর্ম। অন্ধের ধারণায় 'রূপ' না থাকিলেও 'রূপ' পদার্থ যেমন সত্য বস্তু এবং তাহার সম্মুখে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি চিদানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবান ও তদীয় নাম, বিগ্রহ ও ধামাদি চিদ্বিলাসসকল, সদা সর্বত্র স্বরূপেই বিদ্যমান থাকিয়াও অপ্রাকৃত ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদির অভাব বশতঃ বদ্ধ জীবের নিকট মায়িক ও প্রাকৃত আকারেই প্রকাশ পাইতেছেন। এই রহস্যটি বুঝাইবার জন্য তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ঃ—(১।৫।২০,২১)

"চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা নিত্য লীলা রাস॥"

অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা যেমন অন্ধের অন্ধত্ব ক্রমশঃ অপসারিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের রূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইলে সেই নেত্র সমক্ষেই যেমন সমস্ত জগতের স্বরূপ আবার ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তিরূপ চিন্ময়-অঞ্জনের প্রয়োগে জীবের অবিদ্যাদি দোষদুষ্ট মায়িক ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশঃ শুদ্ধ ও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেই শ্রীভগবান এবং তাঁহার নাম, বিগ্রহ ও ধামাদির স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীভগবানের নিজোক্তি ; যথা,—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৬)

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥

ইহার অর্থ ঃ— আমার পবিত্র কথাসকল শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত যেমন যেমন পরিমার্জিত হইতে থাকে, অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করে, উহাও সেইরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন করিয়া থাকে।

সাধন ভক্তি দ্বারা যে পর্যন্ত না প্রেমোদয় হয়— যে পর্যন্ত না শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, সেই পর্যন্ত জীবের অবিদ্যাকৃত ভ্রম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। সাধক, সাধন-ভক্তি দ্বারা যতই সাধ্যের সন্নিকটবর্তী হয়েন, নাম ও নামীর অভিন্নতা অথবা শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের একত্ব, ততই অধিকতর রূপে তাঁহার অনুভূতি হইতে থাকে। এ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বর্ণপুরীতে ছিল এক রাজার কুমার ; অন্য পারে, তালবনের শীতল কুঞ্জের ধারে— তাল পাতার ঘরে একটি হাসিরাশিভরা সুন্দর মেয়ে থাকতো। তার ধূলা মাটির পাতান খেলা ঘরের খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই একদিন সে শুনলে, সেই সাত সাগরের পারের রাজকুমারের সঙ্গে অতি শৈশবে তার নাকি

বিয়ে হয়েছিল ; তারপর এ-পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। ভুলে যাওয়া স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির মত সেই রাজার ছেলের কথা একটু একটু তার মনে প'ড়লো। অগ্নিকণা যেমন বেড়ে উঠে অগ্নিপুঞ্জ সৃজন করে, তেমনি সেই তরুণ রাজকুমারের স্মৃতির আগুন সেই তরুণীর সারা হৃদয় ছেয়ে ফেল্‌লে। প্রাণবল্লভের রাতুল চরণের সুখসম্মিলন আশায় কৃশাঙ্গিনী একান্ত ব্যাকুলা হ'য়ে উঠলো। সে আবেগের সংবাদ বুঝি তার প্রিয়তমের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত ক'রলো। তাই তার সারারাত লুকিয়ে কাঁদা রাঙ্গা চোখ দু'টি মুছতে মুছতে— একদিন প্রভাতে সে যখন বাহিরে এসে দাঁড়াল, তরুণী দেখলে, আজ যথার্থই তার সুন্দর এক রাজদূত তার সেই অতি সুন্দর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে আজ তাকে তার স্বামীর চরণতলে নিয়ে যেতে। তরুণী, সেই অতি বিশ্বাসী রাজদূতের অনুসরণ করে তার স্বামীর ঘরে চললো। রাজদূতকে দেখে, প্রথমে কেবল একজন হিতৈষী বান্ধব ব'লেই তার মনে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে যতই তার সঙ্গে যেতে লাগলো সে ততই তার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তরুণী তার স্বামীর অশেষ গুণের কথা শুনেছিল, আজ এই রাজভৃত্যের গুণের পরিচয় পেয়ে তার সেই শুনা কথা প্রত্যক্ষর মত বোধ হ'তে লাগলো। ক্রমে তার সঙ্গে একে একে নদ নদী সমুদ্র যতই পার হ'তে লাগলো সে, রাজপুত্রের স্বর্ণপুরী যতই সন্নিকট হ'য়ে আসতে লাগলো তার, ততই সে রাজদূতের গুণে আত্ম-হারা হ'য়ে প'লো। এখন শুধু আর গুণ নয়, রাজদূতের রূপ ও মাধুর্য তার কাছে অমৃতময় বোধ হ'তে লাগলো! হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই— এই অমৃতের মাঝে কি যেন এক হলাহলের ঝাপটা এসে তাকে শঙ্কায় ভরিয়ে দিলে, হৃদয়ের মাঝে যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সেই তরুণ রাজ-কুমারের রূপ, গুণ, মাধুরীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে সে, কে এই রাজদূত— যার রূপ, গুণ, মাধুর্যের এত বিক্রম এতই সাহস যে সেই আসনের অর্ধাংশে বসবার দাবী করে! দুই পুরুষে সম অনুরাগ—

কুলনারীর মরণ অপেক্ষা দুঃসহ! তাই সে ধৈর্যের বাঁধ অতি কষ্টে আরোও উঁচু করে, স্বামীর অভয় চরণ দুখানি হৃদয়ে ধরবার জন্য শীঘ্র রাজদূতের সঙ্গে সেই স্বর্ণপুরীর মধ্যে ব্যাকুল প্রাণ নিয়ে প্রবেশ ক'রলে। রাজকুমারের মণিময় মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে, শেষ একবার রাজদূতের মুখপানে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে দেখতে তার সাধ জাগলো। সেই মুখখানি দেখামাত্র এবার তার ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। এত সুন্দর! এত মধুর! এত রূপ!— একি আমারই সেই প্রাণবল্লভ? এই কি সে অনুপম রাজকুমার? এই কথা তার মনে হ'তেই, উল্লাসে— উদ্বেগে— উৎকণ্ঠায়, সংজ্ঞাহীন বালিকা তার অনুমিত রাজদূতের চরণতলে লুটিয়ে প'লো। পরক্ষণে যেন কা'র আলিঙ্গনের মোহন স্পর্শ,— তার মোহঘোর ভেঙ্গে দিলে। আঁখি মেলে চাহিতেই দেখলে সে, রত্ন সিংহাসনের উপর সেই পরমসুন্দর রাজদূত— আর সংবদ্ধা সে তাঁহারই আবেগভরা আলিঙ্গনে! বিস্ময়ের বিকলতায় তার শঙ্কিত আঁখি দুটি পুনরায় মুদে আস্‌ছে দেখে, তখন সেই সুন্দর তরুণ সহাস্যে বললেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে— "রাজদূত নহি প্রিয়তমে,— আমিই সে রাজার কুমার।"

আজ সকল সন্দেহের অবসান হ'য়ে গেলো। সজ্জিতা বালিকা আজ বুঝলে এতদিন রাজদূত ব'লে সে যাকে ভুল করেছিল— সে-ই তার হৃদয়-দেবতা— সে-ই সেই তরুণ রাজপুত্র। আনন্দের পূর্ণ উৎস-ধারা ছুটলো তখন।

ঠিক সেইরূপ—সাধন অবস্থায় যাঁহাকে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে যাবার "দূত" রূপে—"সাধনা" রূপে—"নাম" রূপে মনে করা যায়, প্রাণ-বল্লভের চিন্তামণিময় শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবামাত্র তদীয় দূতস্বরূপ সেই নাম, তখন শ্রীভগবান রূপেই পরিণত হইয়া থাকেন। সেই অবস্থায়ই "সাধনা" "সাধ্য" হয়েন, তখনই নাম ও নামী অভেদ রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা—একই নিয়ম।

শ্রীভগবানের নাম যে একাধারে সাধ্য ও সাধনা— এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহৎদিগের প্রত্যক্ষ অনুভূতিও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের বহু প্রমাণের মধ্যে এস্থানে কেবল একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম ; যথা,—

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসঙ্খ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥

— (পদ্যাবলী।)

ইহার অর্থঃ— অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমুদয় চেতন পদার্থ যাঁহার বিভূতির অংশ মাত্র, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব সেই **শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন।**

অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই ;— কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা-রাণীকেও পূর্বরাগে— সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনের অগ্রে, এই নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতার রহস্যজালে নিপতিতা হইতে হইয়াছিল। শ্রীরাধা তখনও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই ; কেবল একদিন সুদূর কদম্বকানন হইতে কাহার এক সুমধুর বংশীধ্বনি আসিয়া তাঁহার শ্রুতিপথ স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন বিশাখা সখী এক নব-জলধরস্নিগ্ধদ্যুতি নবকিশোরের চিত্রপট আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন সেই দিন হইতে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিমনা ও বিষাদযুক্তা হইলেন। ললিতাদি সখীগণ তাঁহার অকস্মাৎ এইরূপ মনোবেদনার কারণ জানিবার জন্য ব্যাকুলভাবে বারম্বার অনুরোধ করায় নতমুখী শ্রীরাধা সজলনয়নে ও সলজ্জভাবে সখীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন,— পরম রসিক ভক্তশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা,—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

ভক্ত কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ দাস-কৃত ইহারই উপযুক্ত সুমধুর পদ্যানুবাদটি আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম :—

সজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি—
জীবন কিএ সুখ লাগি॥ ধ্রু॥
পহিলে শুনলু হম "শ্যাম" দুই আঁখর
তৈখনি মন চুরি কেল। (নাম)
না জানিএ কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥ (স্বরূপ)
না জানিএ কো ঐছে পটে দরশায়লি
নবজলধর জিনি কাঁতি। (বিগ্রহ)
চকিত হইয়া হম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে, শুন শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যা কর নাম, মুরলীরব তা কর,
পটে ভেল সো পরকাশ॥

যাহা স্বরূপ ও বিগ্রহে অভেদ,— যাহা নামী ও নামে অভিন্ন,— এমন শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম আমাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকিতে ভবভয়ে আমাদের ভয় কি? অবিদ্যার ঘন কুয়াসায় আপাততঃ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহাদির স্বরূপোলব্ধি না হইলেও,— ধর ভাই কলিগ্রস্ত জীব! —এই দুইটি "সাধন" রূপে হাতে পাওয়া "সাধ্য" বস্তুকে

ভীষণ ভবার্ণব মাঝে বুকে করিয়া ধর! সর্বানর্থ নিবর্তনের ও সর্বানন্দ আস্বাদনের— ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই! ভাই সব! কলি-চরের প্রতারণা হইতে সাবধান হও, ঐ যে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে— ঐ যে নিভৃত পল্লীর বুকে, শত শত শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্তিরূপে— জগন্মঙ্গল ঐ যিনি বিরাজ করিতেছেন,— তিনি দারু নহেন— শিলা নহেন— ধাতু নহেন,— তিনি-ই সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি,— অনন্ত বিশ্ব যাঁহার অনন্ত বিভূতির কণ মাত্র! অনন্ত রূপে করুণার বশে, স্বরূপ হইতে অভিন্ন— শ্রীবিগ্রহ তোমাদের ঘরে ঘরে প্রকাশিত তিনি! আবার আরও সুলভ হইয়া— সর্ব ভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য হইয়া, জগন্মঙ্গল "শ্রীনাম" রূপে জগতে আবির্ভূত যিনি, তিনি শক্তিহীন শব্দ বা বর্ণ মাত্র নহেন,— তিনি সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি। ধর বুকে নাম, কর মুখে নাম! —হেলায়, শ্রদ্ধায় যে ভাবে হউক, "নামময়" হইয়া থাকিতে পারিবে যে— তাহাকে হরিময় বলিয়াই জানিতে হইবে। হরিময় যে,— তাহার কিসের দুঃখ —কিসের ভয়— কিসের ভাবনা!

কলির প্রবঞ্চনায়, জাতীয়ভাব-বিসর্জিত মানবের নিকট আজ শ্রীবিগ্রহ, কাষ্ঠ-পাষাণাদি রূপে যতই অবজ্ঞাত হইতেছেন, শ্রীনাম, শক্তিহীন শব্দমাত্র রূপে যতই উপেক্ষিত হইতেছেন, ব্যক্তিগত অমঙ্গল, —জাতিগত অমঙ্গল— দেশগত অমঙ্গল— জগৎ গত অমঙ্গল দিন দিন ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে! "সেবাপরাধ" ও "নামাপরাধ" রূপ বিঘ্ন-বাতাসের সংযোগ হইতেই অনর্থ, অশান্তি ও অমঙ্গলরূপ দীপ্ত বহ্নির উদ্ভব। আবার যদি ভক্তিভরে ভগ্ন দেবালয় সুসংস্কৃত হয়, আবার যদি অবজ্ঞাত দেবতার সংবর্ধনা স্বরূপ সকাল সন্ধ্যায়, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের মঙ্গলধ্বনি মন্দিরে মন্দিরে বাজিয়া উঠে, আবার যদি জয় জয় রবে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের প্রেমোপহারে শ্রীমূর্তি মহা সমাদরে অর্চিত হয়েন, তবেই এই অনর্থের অব্যাহতির সম্ভাবনা।

আবার যদি কোটিকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইয়া উঠেন, কোন

অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয় বশতঃ আবার যদি খোল-করতালের মেঘমন্দ্রের সহিত শ্রীহরিনামের মহা-সঙ্কীর্তনে সর্বদেশ— গ্রাম-পল্লী মুখরিত হয়, আবার যদি সুবুদ্ধিযোগ বশতঃ জনে জনে নিরপরাধে নামাশ্রয় করে, তবেই আবার সর্বানর্থ-নিবৃত্তি ও সর্বার্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যাঁহারা বলেন, উক্ত পথে চলিয়াই, বর্তমানে দেশ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত, তাঁহাদেরই দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মনোবৃত্তির জন্য সত্য সত্যই আমরা পরিতাপ করিতেছি। এই পরম শুভকর পথে চলিয়াই দেশ দুর্দশাগর্তে নিপতিত হয় নাই, স্বভাবোচিত স্বধর্মপথ হইতে ক্রমশঃ পরিভ্রষ্ট হইয়াই দেশ আজ দুর্দশার কণ্টকারণ্যে বিড়ম্বিত। আজ যে আমরা নানা ভাবে বিপদগ্রস্ত, স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বভাব বা 'স্বপদ' হইতে পরিভ্রষ্টতার নামই 'বিপদ'।

নামাশ্রয়িগণের পবিত্র পদরজের বন্দনা করিয়া, পুণ্য হরিধ্বনির সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা।)
৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা,—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল।

শ্রীভগবানকে পাই না কেন

শ্রীভগবান জীবের পক্ষে সুলভ কিংবা দুর্লভ ? এই প্রশ্নের উত্তরে, — এক কথায় বলিতে হইলে এই বলিব যে, "শ্রীভগবান হইতে সুলভ বস্তু আর কিছু নাই। তিনি সুলভ হইতেও সুলভ।"

ভগবান যদি এতই সুলভ, তবে আমরা তাঁহাকে পাই না কেন ? এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর— 'তাঁহাকে আমরা চাহি না বলিয়া।'

এখন কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাউক। ভগবানকে 'সুলভ' বলা হইল কেন, তাহার কারণ— যেখানে পরস্পর

পরস্পরকে পাওয়া সম-প্রয়োজন, সেখানে উভয়ের মিলন 'সুলভ' হইয়া থাকে ; যেখানে একের প্রয়োজন অন্যের অপ্রয়োজন, সেখানে উভয়ের মিলন কষ্টসাধ্য বা 'দুর্লভ' হয় ; আর যেখানে উভয়ের পক্ষে উভয়কে লাভ করা নিষ্প্রয়োজন, সেখানেই মিলন 'অলভ্য' হইয়া থাকে। এখন যদি আমরা একথা বুঝিতে পারি যে, ভগবানকে পাওয়া জীবের পক্ষে যেমন প্রয়োজন, জীবমাত্রকেই পরিশুদ্ধ করিয়া, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া, ভগবানের পক্ষেও তেমনি বা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তাহা হইলে ভগবানকে 'সুলভ' বলিয়া কেন না স্বীকার করিব ? উভয়পক্ষেই যেখানে সম-প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের পরস্পরকে প্রাপ্ত হওয়া সুলভ হওয়াই উচিত। কিন্তু এমন সুলভ বস্তুও যে আমাদিগের নিকট দুর্লভ হইয়াছে— সে দুর্দৈবের একমাত্র কারণ— 'তাঁহাকে' আমরা চাহি না বলিয়া।

শ্রীভগবান যে জীব মাত্রকেই নিজ অভিপ্রেত রূপে— ভক্তরূপে প্রাপ্ত হইতে চান, তাহার হেতু এই যে অনাদিকাল হইতে মায়ামুগ্ধ জীব আমরা, কৃষ্ণসেবা-সুখে বঞ্চিত হইয়া মলিন বিষয়-সুখকেই আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি। পরিপূর্ণ ও নির্মল আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে না পাইলেও, তৎ-পরিবর্তে সেই সুখময়ের আভাসস্বরূপ মলিন ও ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রাকৃত বিষয়-সুখকে অবলম্বন করিয়া দুঃখে-সুখে যেমন করিয়া হউক বাঁচিয়া থাকিতে পারি আমরা—এরূপ বাঁচিয়া থাকা মৃতপ্রায় হইলেও এই ভাবেই ত অনাদি কাল হইতে আজ পর্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি। দূষিত ও মলিন জল যাহারা পান করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহারা কি নির্মল ও পরিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হইলে পান করে না ? নির্মল ও পূর্ণানন্দের সন্ধান অজ্ঞাত বলিয়াই — জীবকে মায়া-কর্দমাক্ত পরিচ্ছিন্ন বিষয়-সুখকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। যে নির্মল সুখ-সিন্ধুর একবিন্দু, মায়া-মিশ্রিত হইয়াও সারা জীব-জগতকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,— সেই পূর্ণ

রস-সাগরকে জীব যে স্বাভাবিক ভাবে চায় না,— অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার ইহাই শ্রেষ্ঠতম প্রতারণা। কিন্তু ভগবান মায়াধীশ,— মায়া তাঁহার অধীন ; মায়া-মলিন কোন বিষয় তাঁহার ভোগ্য নহে। একমাত্র প্রেম-মকরন্দই শ্রীভগবানের ভোগের বস্তু ; একমাত্র প্রেমভক্তি-সুধাই শ্রীভগবানের উপজীব্য। ইহা ছাড়া তাঁহার সেবায় লাগিবার আর কোন পদার্থ নাই। একমাত্র মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য, তেমনি ভক্তের হৃদয়-কমল-ভরা প্রেম-মধুই শ্রীভগবদ্‌ভ্রমরের জীবনোপায়। শ্রীভগবান পূর্ণ বলিয়া তাঁহার প্রেম-পিপাসাও অনন্ত। তাই অনন্ত জীব-হৃদয়, ভক্তি-কমলরূপে বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অনন্ত ব্যাকুল-তার বিরাম নাই। এই জন্যই অনাদি কাল হইতে গোলোকে ও ভূলোকে অনন্তবার তাঁহার আসা-যাওয়া চলিতেছে ও অনন্তবার চলিবে। নীড়চ্যুত— 'বিপদ'-গ্রস্ত বিহঙ্গ-শাবকের পাশে বিহঙ্গম-জননী যেমন ব্যাকুল প্রাণে শতবার ছুটাছুটি করে, শাবকের উদ্ধারসাধন যেমন সে স্বপ্রয়োজন মনে করে, তাহাকে স্বীয় কুলায় বা 'স্বপদে' প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, সেইরূপ অবতারবাদেরও উদ্দেশ্য, জীবকে বারবার শুধু কৃপা করিতে আসা নহে — এই কৃপার অন্তঃস্তলে তাঁহারও একটা স্বপ্রয়োজন লুকান রহিয়াছে। সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তায় জগৎ ভরিয়া উঠিলেও ভ্রমর যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না,— সে কেবল লোলুপ নয়নে চাহিয়া থাকে, কোথায় একটি শিশির-সিক্ত শতদল ঊষার আলোকে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। ধন-ধান্যে জগৎ পূর্ণ হইয়া উঠিলেও যদি কোথাও ফুল আর না ফুটে, মকরন্দ আর সঞ্চারিত না হয়, তবে মধুব্রতের প্রাণ ব্যাকুলতায় যেমন ভরিয়া উঠে, সেইরূপ অনন্ত ভক্ত, ভগবৎ-সেবায় অনাদিকাল হইতে নিযুক্ত থাকিলেও অনাদি-বদ্ধ জীব-কোটি হইতে যদি আর ভক্ত-কমলের বিকাশ না হয় তবে ভগবানের রাজ্যে— শ্রীভগবানের প্রাণে একটা ব্যাকুলতার হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। যাহার অনন্ত প্রেম ছাড়া আর উপজীব্য নাই, কেবল

সে-ই জানে প্রতি বিন্দু প্রেম-সুধার প্রয়োজন তাহার কত অধিক। তাই বলিতেছি— ভগবান নিত্যই প্রতি জীবকে ভক্তরূপে চাহিতেছেন। তাঁহার দিক হইতে জীবকে চাওয়া নিত্যই রহিয়াছে। এত 'চাওয়া' রহিয়াছে যেখানে,— এত 'পাওয়ার' প্রয়োজনীয়তা যেখানে, সে জিনিস যদি সুলভ না হয়, তবে তাহাপেক্ষা সুলভ আর কি হইতে পারে জানি না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! — কোন এক অনাদি কালের অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব আমরা— আমরা ভগবানের কথা— তাঁহার এই অনন্ত প্রেম-পিপাসার কথা, অনাদি কাল হইতে বিস্মৃত হইয়া আছি। যে বিস্মৃতি আমাদের ভুলাইয়া দিয়াছে, 'বিষয়' জীবের প্রয়োজন নহে, জীবের প্রয়োজন একমাত্র ভগবৎ-সেবা— 'কৃষ্ণসেবা'। এমন সুলভ জিনিস এমন দুর্লভ হইয়াছে তাহার কারণ, বদ্ধজীবের দিক হইতে শ্রীভগবানকে 'চাওয়া' নাই বলিয়া। আমরা যে তাঁহাকে পাই না— আমরা 'তাঁহাকে' চাই না বলিয়া। ভগবানের দিক হইতে যেমন নিত্য 'চাওয়া' রহিয়াছে, জীবের দিক হইতেও যদি সেইরূপ তাঁহাকে 'চাওয়া' থাকিত, তবে মিলনের মুহূর্তও বিলম্ব হইত না। তাহা হইলে ভগবান জীবের পক্ষে সুলভ হইতেও সুলভ হইয়া যাইতেন। কিন্তু দুর্দৈব! মায়া সে 'চাওয়া' আমাদের কিছুতেই চাহিতে দিতেছে না।

এখন 'চাওয়া' কাহাকে বলে, সেই কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। পিপাসাতুর যেমন জল চাহে, ক্ষুধাতুর যেমন অন্ন চাহে, অর্থাতুর যেমন অর্থ চাহে, রোগাতুর যেমন আরোগ্য চাহে,—'চাওয়া' ইহারই নাম। এই রকম চাওয়া যাহাতে ভগবানে হয়, ভক্ত তাই প্রার্থনা করিয়াছেন, যথা,—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

—(পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৮৯ অধ্যায়ে যোগসারস্তবে।)

এই 'চাওয়ায়' ভগবানকে চাহিলে তখনই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

'চাওয়া' আমাদের নিত্যই আছে। 'চাওয়া' জীবের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি। কিছু না চাহিয়া জীব ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। অবিদ্যাচ্ছন্ন — স্বরূপভ্রান্ত জীব অনাদি বহির্মুখতা বশতঃ সেই চাওয়াটি যখন বিষয়ে প্রয়োগ করে, তাহারই নাম 'কাম'। আর কোনও এক অনির্বচনীয় ও অতিভাগ্যবলে, যখন কোনও জীবের এই 'চাওয়া' শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহারই নাম হয় 'প্রেম'। 'কাম' বা বিষয় চাওয়া, সংসারচক্রে চির আবর্তিত হইবার কারণ, আর 'প্রেম' বা ভগবান চাওয়া, পূর্ণানন্দের অতল তলে নিত্য নিমজ্জিত থাকিবার একমাত্র উপায়। 'চাওয়া' পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে 'পাওয়া' যায় না। ধন-ধান্যাদি বিষয় আমরা যে ভাবে প্রাপ্তি ইচ্ছা করি, এরই নাম 'পরিপূর্ণ চাওয়া'। পূর্ণ বা প্রকৃষ্ট 'চাওয়া' ভগবানের জন্য হইলেই সেই পূর্ণ প্রেমে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করায়। ভগবান যাঁহার কাছে অপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, নিশ্চয় জানিতে হইবে— তাঁহার 'চাওয়ার' অসম্পূর্ণতা ব্যতীত, ভগবান না পাওয়ার অন্য হেতু নাই। যিনি ভগবানকে পান নাই, তিনিই ভগবানকে চাহেন নাই— ইহা সুনিশ্চয়।

একথা হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না, যে তাঁহারা ভগবানকে চাহেন না, অথবা এমন অনেক সাধক, ভক্ত বা ভাগ্যবান আছেন, ভগবানের জন্য যাঁহাদের আর্তি ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া, তাঁহারাও যে ভগবানকে চান নাই, একথা সহজে মানিয়া লইতে অনেকেই প্রস্তুত না হইতে পারেন। তদুত্তরে আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, ষোল আনা বিষয় চাওয়া জীব, ভগবানকে একেবারেই চাহে না। সেই বিষয়-চাওয়া জীবের মত সাধক ভক্তগণ যে একেবারেই ভগবানকে চাহেন না তাহা নহে, তাঁহারা চাহিলেও সাধক-দশা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহাদেরও সেই 'চাওয়ার' মধ্যে কিছু কিছু 'না-চাওয়া' লুকাইয়া থাকে। হাজার বাতির আলোর মধ্যেও অন্ধকার লুকাইয়া আছে, একথা তখনই বুঝিতে পারা যায়, যখন সেই আসরে

দু হাজার বাতির আলো জ্বলিয়া উঠে। সেইরূপ 'ভগবান-না-পাওয়া' — সাধক ভক্তগণের ব্যাকুলতা বা চাওয়ার মধ্যে কতটা না-চাওয়া মিশাইয়া আছে, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যখন তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতা আর এক ধাপ উপরে উঠে। শাস্ত্রকারগণ যে— 'আদৌ শ্রদ্ধা'— ইত্যাদি— অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তদনন্তর যথাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব হইতে অতঃপর প্রেমোদয়ের এই ক্রম বা স্তরটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এক কথায় 'ভগবান-চাওয়ার' ইহাই ক্রমিক অবস্থা। 'শ্রদ্ধা' হইতেই ভগবান চাওয়ার আরম্ভ এবং সেই চাওয়া ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া প্রেমোদয়ে তাহার পূর্ণতার অবসান। তাই বলিতেছিলাম, প্রেমোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সাধনার ক্রম অনুসারে সাধক-হৃদয়েও কিছু-কিছু 'না-চাওয়া' লুকাইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান সাধক ভক্তগণের 'চাওয়ার' অনুপাতে তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া, 'না-চাওয়ার' অনুপাতে লুকাইয়া থাকেন। যিনি ভগবানকে যত বেশী চাহিয়াছেন,— তিনি পূর্ণ-চাওয়া বা প্রেমের তত সন্নিকট হইতে পারিয়াছেন— ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাঁহার তত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সাধক ভক্তগণের এই চাওয়া 'না-চাওয়া মিশ্রিত'। ভগবান-চাওয়া যেই মুহূর্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, — সেই মুহূর্তে 'না-চাওয়ার' আভাসমাত্রও সেই 'চাওয়ার' মধ্যে থাকিবে না— ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি— তখনই সেই চাওয়া, প্রেমসূর্যরূপে উদিত হইয়া থাকেন। দিবাকরের উদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে ভগবান প্রকাশিত হয়েন।

তাহা হইলে আমরা এখন বুঝিলাম, ভগবান সুলভই বটেন, কিন্তু দুর্লভ হইয়াছেন তিনি শুধু আমরা তাঁহাকে চাহি না বলিয়া।

বিম্বের সহিত দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বে, বিষয়ের একতা থাকিলেও যেমন সংস্থিতির বিপর্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, পূর্বাভিমুখী বিম্বের যেমন

প্রতিবিম্ব পশ্চিমাভিমুখী হয়, বহুলাংশে সেইরূপ, প্রতিবিম্বস্থানীয় জগত ব্যাপারের সহিত বিম্বস্থানীয় ঈশ্বরের সম্বন্ধ।

সংসারী জীব মাত্রেই প্রতিনিয়ত বিষয়াভিলাষ করে বিষয় চাহে, কিন্তু বিষয় প্রায়ই তাহাদের প্রত্যাখ্যান করে। ভাগ্যবশে কদাচিৎ কেহ পায়— অধিকাংশই পূর্ণরূপে চাহিয়াও বিষয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত কুক্কুর যেমন বারংবার প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াও তৎপ্রাপ্তির আশায় বারবার ধাবিত হয়, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবকে মায়িক বিষয়-সুখ, সেইরূপ বারবার উপেক্ষা করিলেও জীব তৎপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। জীব মাত্রেই 'বিষয়-চাওয়া' স্বাভাবিক ও সুলভ; কিন্তু সেই নশ্বর 'বিষয় পাওয়া' দুর্লভ, আর শ্রীভগবানকে 'পাওয়া' অতি সুলভ কিন্তু তাঁহাকে 'চাওয়া' অতি দুর্লভ। বিষয় চাওয়া সুলভ বলিয়া ক্রিমি-কীট পর্যন্তও বিষয় চাহিতে পারে ও চাহিয়া থাকে। কীটেতেও যে বৃত্তি সুলভ, তাহার আর কি-ই-বা মূল্য আছে? তাই ইহা অন্ধতম 'কাম' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু 'ভগবান চাওয়া' সুদুর্লভ। এমন কি দেবতাদিতেও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া, তাই 'ভগবান চাওয়া' উজ্জ্বল ভাস্কর স্বরূপ 'প্রেম' নামে উক্ত হইয়া থাকেন। এই 'প্রেম' বা 'পূর্ণরূপে ভগবান চাওয়া' নৃলোকে সুদুর্লভ! কোন ভাগ্যে এই সুদুর্লভ 'চাওয়া'কে প্রাপ্ত হইলে— ভগবান 'পাওয়া' অত্যন্ত সুলভ।

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবান অতিশয় সুলভ। যাহা চাহিলেই পাওয়া যায়, তাঁহা হইতে সুলভ বস্তু আর কি হইতে পারে? কিন্তু ভগবান চাওয়াই অতীব দুর্লভ। যে ভাবে আমরা বিষয়-সুখ প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করিয়াও প্রায়ই তৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হই, সেই ভাবে যদি ভগবানকে চাহিতে পারিতাম তা হইলে নিশ্চয়ই বঞ্চিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতাম। হায়! আমরা এমন সুলভ বস্তুও না চাহিয়া এমন দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছি,— ইহা হইতে মায়ার বিড়ম্বনা

আর কি হইতে পারে আমাদের ?

ভগবানকে পাইবার কোনই সাধনা নাহি। তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় 'তাঁহাকে চাওয়া'। কিন্তু সেই 'চাওয়া' সুদুর্লভ বলিয়া, যাহা কিছু সাধন-ভজনের কথা শুনা যায়— সে কেবল 'চাওয়াই-বার' জন্য। যাহাতে জীবের হৃদয়ে সেই 'চাওয়া' জাগে, বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রাণ যেমন কাঁদে,— যাহাতে ভগবানের জন্য প্রাণ তেমনি করিয়া কাঁদিয়া উঠে,— তাহারই জন্য সাধন-ভজন। ঠিক এই জন্যই ভক্ত প্রহ্লাদ, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

—(বিঃ পুঃ ১।২০।১৯)

ভগবানকে পাইবার জন্য এই রকম করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবার নামই 'প্রেম',— ভগবানকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া চাওয়ার নামই 'প্রেম'। হৃদয়ে প্রেমের উদয়মাত্রেই ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই-জন্য শাস্ত্রকারগণ ভগবানকে 'প্রয়োজন' না বলিয়া প্রেমকেই প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবানকে চাহিলেই পাওয়া যায় ; অতএব শ্রীভগবান দুর্লভ নহেন ;— দুর্লভ তাঁহাকে চাওয়া। ব্রহ্মাদি দেবতা-দুর্লভ এই 'চাওয়া' বা 'প্রেম' একমাত্র এই কলিযুগে— নিরপরাধে শ্রীভগবন্নামাশ্রয় এবং শ্রীশ্রীগৌরহরি ও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-২২)

সেই 'চাওয়া' যদি কোনও দিন চাহিতে পারি— এই আশায় গৌর-পদাব্জ-ভৃঙ্গগণের কৃপার ভরসায় বসিয়া রহিলাম।

প্রথম প্রকাশ ঃ— শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী। (মাসিক পত্রিকা।)
৩য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা— বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ— ১৩৩৬ ॥

পরতত্ত্বের সীমা

অন্তর-সঞ্জাত মৃগমদকে বহির্নির্গত করিবার প্রয়াসে কস্তূরীমৃগ যেমন ব্যাকুল হইয়া বন হইতে বনান্তরে ছুটাছুটি করে,— দিকে দিকে ধাবিত হয়, 'ব্রহ্ম' বা 'পরতত্ত্ব' বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে জগতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রুতিসকলের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যাকুল প্রয়াস দেখা যায়,— যাহা কেবল ভাবগ্রাহী জনেরই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

অন্তর্নিহিত পরতত্ত্বকে মর-জগতে প্রকাশ করিতে যাইয়া, তাই শ্রুতিসকল কখন-বা উহাকে 'অন্ন' নামে, কোথা-ও 'প্রাণ' নামে, আবার কখন 'বায়ু' নামে, কখন-বা 'আকাশ' নামে নির্দেশ পূর্বক তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া, কোথাও-বা উহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই প্রকারে নানা দিক দিয়া নানা ভাবে ও নানা শব্দে উহা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেও, তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া, পরিশেষে সেই পরতত্ত্বকে 'আনন্দ' নামে নির্দেশ পূর্বক শ্রুতিসকল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্"— ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দময়; "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈত্তিরী-৩।৬।১) — অর্থাৎ আনন্দকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিলেন; — ইত্যাদি বহু শ্রুতি-বাক্যে পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তুর আনন্দস্বরূপতাই সুস্পষ্টরূপে বহুবার উক্ত

হইয়াছে। ("আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" — ব্রঃ সূঃ ১অ ; ১ পা, ১২সূ। গোবিন্দ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

তাই দেখা যার, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"— অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয় ; এই উপক্রমে, শ্রুতিতে যে বিশ্ব-কারণ পরতত্ত্বকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করা ইহয়াছে, সেই তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রকারে নানা শব্দে প্রকাশ করিয়াও তাহাতে প্রসন্ন হইতে না পারিয়া, অবশেষে 'আনন্দ'-স্বরূপে নির্দেশ পূর্বক, শ্রুতি-সকল উক্ত বক্তব্য বিষয় উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্ত করিয়াছেন ; যথা,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" — (তৈত্তিরী। ৩ বল্লী)

অর্থাৎ,— আনন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্ব হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে সেই আনন্দ-স্বরূপেই লীন হয়।

এইরূপে পরতত্ত্বের 'আনন্দ'-স্বরূপতায় বা 'আনন্দ'-ব্রহ্মের বার্তায় শ্রুতিসকল মুখরিত হইয়াছে। পরমার্থ জগতে সাধারণতঃ ইহাই পরতত্ত্বের সর্বোচ্চ সংবাদ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, স্থিরভাবে শ্রুতিবাক্য সকল পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,— শ্রুতির মুখের কথা এইখানে— এই আনন্দ-ব্রহ্মেই পরিসমাপ্তি হইলেও, বুকের কথা এইখানেই অবসান প্রাপ্ত হয় নাই।

অতি আবশ্যকীয় কোন বক্তব্য বিষয় সর্বোচ্চ-স্বরে ঘোষণা করিতে করিতে গলা ভাঙিয়া আসিলে, তখন যেমন মুখের ভাষা থামিয়া যায়, কিন্তু বুকের ভাষা যেমন বন্ধ হয় না, সেইরূপ সর্বোচ্চ-স্বরে 'আনন্দ-ব্রহ্ম' ঘোষণা করিবার পর, ভগ্নকণ্ঠ হইয়া শ্রুতি-সকল তাহার উপর আর যাহা কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক মুখের ভাষার মত নহে,— যেন বুকের ভাষার মতই নিগূঢ়। যাঁহারা বুকের কথা— অন্তরের ভাষা বুঝিতে সমর্থ, এ-সংবাদ কেবল সেই সকল

সহৃদয় ভাবগ্রাহী জনেরই বোধগম্য হইবার যোগ্য,— অপরের নহে।

এই প্রকারে বুঝা যায় শ্রুতিসকল উচ্চকণ্ঠে ও বহুলভাবে আনন্দ-ব্রহ্মের বার্তা ঘোষণা করিয়া, তাহারও উপর পরতত্ত্বের রস-স্বরূপতা বা রস-ব্রহ্মের সংবাদ— উহা বুকের নিগূঢ় কথার মত অল্পাক্ষরেই প্রদান করিয়াছেন ; যথা,— "যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"— (তৈত্তিরী।২।) অর্থাৎ, যিনি সেই স্বয়ং কর্তা (অর্থাৎ স্বয়ং-রূপতত্ত্ব বা স্বয়ং-ভগবান) তিনিই পূর্ণ রস-স্বরূপ। এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হয়েন।

জগৎ-কারণ 'আনন্দ' যাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে— সেই আনন্দ-ব্রহ্মেরও কারণ-স্বরূপ হওয়ায় রস-ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিবার পর, ব্যাকুল শ্রুতিসকল এইখানেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

সবিশেষ বা সমূর্ত ধূপ, যেমন নির্বিশেষ বা অমূর্ত সৌরভরাশি বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি এক সবিশেষ রসতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া নির্বিশেষ আনন্দের বিকাশ হয়। সুতরাং ধূপেই যেমন সৌরভ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ রসেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা ; অর্থাৎ সবিশেষ 'রসব্রহ্মেই' নির্বিশেষ 'আনন্দ-ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠিত ; ('ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' —গীতা।১৪।২৭) অতএব পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ—এই কথা ব্যক্ত করাই শ্রুতির ব্যাকুল অভিপ্রায়।

শ্রুতি ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, নির্বিশেষ বা অমূর্ত আনন্দ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এই সমূর্ত রস-ব্রহ্ম কেবল 'ভাব' নামক চিদানন্দ-ময়ী বৃত্তিবিশেষ দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন বলিয়া এবং সচ্চিদানন্দ রূপময় তিনি প্রাকৃত শরীর-বর্জিত বলিয়া, সৃষ্টি-প্রলয়কর— মঙ্গলপ্রদ সেই দেবকে অশরীর বা অমূর্ত বলা হয় ; ("ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।"—শ্বেতাশ্বঃ।৫।১৪)।

অতএব পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতা রসতত্ত্বেই পর্যবসান হইলেও, উহা

একমাত্র 'ভাবগ্রাহ্য' বস্তু বলিয়া, সর্ব কারণেরও কারণ বা সকলের মূলে 'রস' ও 'ভাব' রূপে অবস্থিত— পরতত্ত্বের এক পূর্ণতম স্বরূপের সংবাদ অন্তরে বহন করিয়া, সেই কথাই জগতে সম্যকরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রুতিসকলের যে ব্যাকুলতা, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তই সেই ব্যাকুলতার প্রতিমূর্তি। ইহাতে 'নেতি নেতি' করিয়া বিচার পূর্বক শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপেরই সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্যসকল নিগূঢ় সূত্ররূপে কথিত হওয়ায়, বেদান্তের যথার্থ অর্থ প্রকৃষ্টরূপে মানব-সমাজের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কেবল শ্রুতি-সকলের সেই ব্যাকুলতা মাত্রই ব্রহ্মসূত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

কস্তূরী মৃগ হইতে তাহার অন্তর-সঞ্জাত মৃগমদ যখন বিগলিত হইয়া বনভূমে পতিত হয়, তখনই যেমন দশদিক সম্যকরূপে আমোদিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার শ্রুতিরূপ মৃগ হইতে ক্ষরিত মৃগমদের মত, যাহা জগতের ভাগ্যের উপর বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই নাম— "শ্রীমদ্ভাগবত।"— ব্যাকুল শ্রুতিসকলের ইহাই শান্ত ও সুপ্রসন্ন মূর্তি। এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই জীব-জগতে সম্যকরূপে পরতত্ত্বের সন্ধান ঘোষণা করা হইয়াছে এবং যাহার অফুরন্ত মাধুর্যামৃতে, কস্তূরীবাসিত বনভূমির ন্যায় সকল ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে।

এই সুস্পষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের পর, পরতত্ত্বের পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত কাহারও পক্ষে আর বেদান্ত কিম্বা উপনিষদের গহন রাজ্যে প্রবেশ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। যেহেতু নিগূঢ় বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির ইহাই স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক সুস্পষ্ট এবং সুবিস্তৃত অর্থ; একথা শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন; যথা,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থঃ পরিবৃংহিতঃ॥"

—(গারুড়ে)

অর্থাৎ,— এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থের জ্ঞাপক ; মহাভারতের অর্থ ইহাতে বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; এই গ্রন্থে গায়ত্রীর প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। বেদের নিগূঢ় তাৎপর্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (এবিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা মহানুভব শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কৃত 'তত্ত্বসন্দর্ভে' দ্রষ্টব্য।)

সংসার-তাপ-সন্তপ্ত জীবচকোরের প্রকৃষ্ট পানীয় পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্যে, ভগবান বেদব্যাস বেদকে বিভাগ করিয়া, অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশ করিয়া এবং বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াও অন্তরে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদীয় সমাধিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হইয়াই তাঁহার সমস্ত প্রয়াসকে সার্থকতা-মণ্ডিত এবং অতৃপ্ত অন্তরকে পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

অধিক কথা কি,— "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং—" এই নিজোক্তি দ্বারা তিনি যে, বেদবল্লী-বিগলিত অমৃতময় ফল, একথা নিজ পরিচয় ঘোষণায় শ্রীমদ্ভাগবত নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই দেখা যায়, যে 'রস-ব্রহ্ম' বা পরতত্ত্বের রস-স্বরূপতাকে সর্বোপরি ব্যক্ত করিতে যাইয়াও শ্রুতি, সম্যকরূপে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই রসতত্ত্বেরই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন আকরস্বরূপ। রসের সেই অমৃতময়ী কথা, প্রাণ ভরিয়া ভাগ্যবান জীবসকলকে পান করাইবার জন্য তাই শ্রীমদ্ভাগবত ডাকিয়া বলিতেছেন,—

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং—"

আবার সেই রসের অধিকারী হইতে হইলে ভাবের অধিকার থাকা চাই। 'ভাবুক' না হইতে পারিলে 'রসিক' হওয়া যায় না। 'ভাব' ব্যতীত 'ভাবগ্রাহ্য' সেই রসের প্রকাশ হয় না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল যে রসতত্ত্বই সম্যকরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে,—তৎসহ ভাবের মিলনে পরতত্ত্বের এমন এক পরিপূর্ণতা প্রদর্শিত

হইয়াছে,— পারমার্থিক জগতে যাহার অধিক কিম্বা সমান আর কোন সংবাদ জানিবার অবশেষ থাকে না। "রসিকা (ভুবি) ভাবুকাঃ" — এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্তি হইতে 'রস' বা 'ভাব' যুগপৎ উভয়ই যে এই গ্রন্থের মূল উপকরণ,— গ্রন্থের উপক্রমেই সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা ;—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (১।১।৩)

অর্থাৎ,— অহো কি আনন্দ! নিগমরূপ কল্পতরুর ফল— এই শ্রীমদ্ভাগবত শুকের মুখ হইতে এই পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে। ওহে রসবিশেষ ভাবুক রসিকবৃন্দ! এই দ্রবীভূত অমৃত-রসময় ফল— সংসার-পাশ-বিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তর পান করিতে থাক।

তাহা হইলে বুঝিলাম,—

(১) শ্রীমদ্ভাগবতই নিগম-কল্পতরুর শ্রেষ্ঠতম ফল।

(২) শ্রুতি সর্বোপরি যে রসতত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সম্যক-রূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই সেই রসের আকর।

(৩) যে রসবস্তুকে 'ভাবগ্রাহ্য' বলিয়া শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই রস ও ভাবের যুগপৎ সমাবেশ বশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতই 'রসিক' ও 'ভাবুক' জনের পরম আস্বাদ্য বস্তু।

অতএব যে সর্বকারণ পরতত্ত্ব ভাব-পরিরম্ভিত রসরূপে সৃষ্টির মূলে নিত্য অবস্থিত,— ভাব দ্বারা আলিঙ্গিত যে রসের উৎস হইতে নিখিল আনন্দধারা উৎসারিত,— যে ভাব ও রসের আবর্তন ও নর্তন-ছন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ববৈচিত্র্য বিকশিত,— যাহা সকল ভাব ও সকল রসের আদি বা মূল,— সেই এক 'মহাভাব'-পরিরম্ভিত 'রসরাজ' বা আনন্দ রাসমণ্ডল-বিলসিত,— শ্রীরাধিকাদি গোপরামাগণ-পরিবেষ্টিত

শ্রীকৃষ্ণই যে, বেদাদি সর্বশাস্ত্রের অন্বেষণীয় পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব,—এ-কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতি 'সর্ব্বরসঃ' নামে এই রসরাজ-স্বরূপকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন।

মীনসকল যেমন জলে উৎপন্ন হইয়া জলেই অবস্থান করে এবং পরিশেষে জলেই বিলীন হয়, সেইরূপ নিখিল জীব, আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া আনন্দকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে এবং পরিশেষে আনন্দেই লীন হইয়া থাকে— এ-কথা পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রুতি ইহাও আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে,— "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"— (বৃহদারণ্যকে)। অর্থাৎ রসের উৎস হইতে যে আনন্দধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে,— সেই পরমানন্দের 'মাত্রা' বা আভাসমাত্র উপভোগ করিয়া এই প্রাকৃত জগতের সকল ভূত— সকল প্রাণী জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

প্রাকৃত বিষয়-সুখকে পরমানন্দেয় প্রতিচ্ছবি বলিয়া শাস্ত্রাচার্যগণ নির্দেশ করিয়াছেন,— "বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবিরূপমেবেতি।" — (সিদ্ধান্তরত্ন, ১।৫৭)। প্রতিচ্ছবিকেই প্রতিবিম্ব বা আভাস বলা হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ে পৃথক বস্তু হইলেও, উভয়ের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকায়, প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন বিম্বের গঠনাদি বিষয়ে অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ বিম্ব-স্থানীয় পরমানন্দের যদিও আভাস মাত্রই আমরা এই জগতে উপভোগ করিয়া থাকি, তথাপি 'সুখ' নামে কথিত সেই 'সুখাভাস' প্রাপ্তির প্রণালী স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিতে পারিলে, পরমানন্দ বিকাশের মূলে 'রস' ও 'ভাব' রূপে পরতত্ত্বের পূর্ণতম-স্বরূপের অবস্থিতি-সংবাদ, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে,— আমরা তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি অর্জন করিতে পারি।

যাহা অবলম্বন-পূর্বক আনন্দের বা সুখের বিকাশ হয়, তাহাকে

আনন্দের 'আলম্বন' কহে। আলম্বন দ্বিবিধ ; যথা,— (১) বিষয়ালম্বন এবং (২) আশ্রয়ালম্বন। যে বিষয় হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দ বা সুখের সেই বিষয়কে 'বিষয়ালম্বন' এবং সেই বিষয় হইতে যে আনন্দিত হয়,— যাহাতে আসিয়া আনন্দ আশ্রয় করে, তাহাকে 'আশ্রয়ালম্বন' বলা হয়। সুখ বা আনন্দকে প্রকাশশীল হইতে হইলেই প্রধানতঃ উক্ত দ্বিবিধ অবলম্বন থাকা আবশ্যক, নচেৎ কোনও সুখের বিকাশ হয় না। যেমন, একদিকে চিত্রের বিষয়-রূপ চিত্রকরের অন্তর এবং অপরদিকে চিত্রের আশ্রয়-রূপ পটবস্ত্র না থাকিলে চিত্রের প্রকাশ সম্ভব হয় না, আনন্দের প্রকাশ সম্বন্ধেও কিয়দংশে সেইরূপ জানিতে হইবে।

জগতে দেখা যায়, ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র বা সঙ্গীত-শিল্পাদি যে-কোন বিষয় হইতে, যখন যিনি আনন্দ লাভ করেন, অর্থাৎ সুখের যিনি আশ্রয়ালম্বন হয়েন, তখন তাঁহার নিকট সেই সুখের বিষয় অর্থাৎ বিষয়ালম্বনটি রসতা প্রাপ্ত অর্থাৎ রসরূপে গ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত উহা আনন্দ বা সুখপ্রদ হয় না। যেমন কাব্যামোদী যখন কাব্য হইতে আনন্দলাভ করেন, তখন উহা শুধু কাব্যই থাকে না,— কাব্যরস হইয়া যায়। কাব্যরস না হওয়া পর্যন্ত কেবল কাব্য কাহারও নিকট আনন্দের বিষয় হয় না। এইরূপ হাস্যামোদী হাস্যরস হইতে, সঙ্গীতামোদী সঙ্গীতরস হইতে, নাট্যামোদী নাট্যরস হইতে, নৃত্যামোদী নৃত্যরস হইতে, বিদ্যামোদী বিদ্যারস হইতে, কলামোদী কলারস হইতে, ক্রীড়ামোদী ক্রীড়ারস হইতে,— এক কথায় বিষয়ামোদী বিষয়রস হইতে আমোদিত বা আনন্দিত হইয়া থাকেন।

বিষয়ালম্বন রসতাপ্রাপ্ত না হইলে যেমন আনন্দের কারণ হয় না, তেমনি আবার সুখের আশ্রয়ালম্বন হইতে যে পর্যন্ত বিষয়ালম্বনের প্রতি 'ভাব' নামক প্রিয়তা বা অনুকূলতাময়ী মনোবৃত্তিবিশেষ সঞ্চারিত না হয়, সে পর্যন্ত বিষয়ালম্বনটিও 'রস'-রূপে গ্রাহ্য হয় না, অর্থাৎ রসতাপ্রাপ্ত

হয় না ; সুতরাং উহা আনন্দের কারণ হয় না। যেহেতু 'রস' একমাত্র 'ভাবগ্রাহ্য' বস্তু।[১] ভাবুকই রসিক হইবার অধিকারী। এইরূপ সুখের আশ্রয় হইতে উচ্ছ্বসিত 'ভাব' নামক প্রীতিময়ী চিত্তবৃত্তি দ্বারা অভিষিক্ত না হইলেও, কোন বিষয় যেমন রসতাপ্রাপ্ত হয় না, তেমনি আবার কোন বিষয় রসতাপ্রাপ্ত না হইলেও, আশ্রয় হইতে সেই বিষয়ের প্রতি ভাবের সঞ্চার হয় না। অতএব যেখানেই আনন্দ যে পর্যন্ত ক্রিয়াশীল দৃষ্ট হইবে, সেখানেই ভাবের দ্বারা অভিষিক্ত 'রস' এবং রসের দ্বারা অভিষিক্ত 'ভাব'— এই ভাব ও রসের এবং রস ও ভাবের আবর্তন ও নর্তন অবিরত চলিতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। রস ও ভাব যুগপৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধ ; তাই আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

—(ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রে।)

অর্থাৎ কোথাও ভাবহীন রস, কিম্বা রসহীন ভাব পরিদৃষ্ট হয় না ; যেহেতু রস ও ভাবের বিকাশ পরস্পর-সাপেক্ষ।

এই প্রকারে যুগপৎ ভাব দ্বারা রস গ্রাহ্য হইয়া এবং রস দ্বারা ভাব পুষ্ট হইয়া রসের বিষয় হইতে উত্থিত আনন্দধারা, 'ভাবুক' বা আশ্রয়ালম্বনকে 'রসিক' অর্থাৎ আমোদী করিয়া থাকে। তাই শিখীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত মেঘমালা রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই শিখীকে আমোদিত করে ; অলির ভাব দ্বারা অভিষিক্ত কুসুম রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই অলিকে আমোদিত করে ; জননীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত শিশু, রসতাপ্রাপ্ত

১। উক্ত 'ভাব' আবার বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ব্যভিচারী ভাব প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রসকে পরিপুষ্ট করে। এসকল বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হওয়ায়, উহার আলোচনা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

হইয়াই জননীকে আমোদিত করে ; কৃপণের ভাব দ্বারা অভিষিক্ত ধনরাশি রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই কৃপণকে আমোদিত করে ; বিলাসীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত বিলাস-বস্তু রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই বিলাসীকে আমোদিত করে ;— এক কথায় বিষয়ীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত বিষয়, রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই বিষয়ীকে আমোদিত করে। প্রাকৃত যে-কোন সুখপ্রাপ্তির সংক্ষেপতঃ এই প্রণালী জানিতে হইবে। যাহার যে বিষয়ের প্রতি ভাব নাই, সে বিষয় তাহার পক্ষে সুখের হয় না ;— যেহেতু উহা তাহার নিকট রসতাপ্রাপ্ত হয় নাই।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কেবল আনন্দ হইতেই আনন্দ হয় না ;— আনন্দের মূলে যুগপৎ 'রস' ও 'ভাব' থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই এই জাগতিক সুখের মূলেও সর্বত্র ভাব ও রসের বিদ্যমানতা দেখা যায়। তবে প্রাকৃত সুখ যেমন পরমানন্দের 'আভাস' অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-স্থানীয়, তেমনি এই সুখাভাসের মূলে যে রস ও ভাব বিদ্যমান, উহাও সেই পরম রস ও পরম ভাবের 'আভাস'-মাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রতিবিম্ব-স্থানীয় এই জাগতিক সুখোদয়-রীতি প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিম্ব-স্থানীয়— জগৎ-কারণ সেই পরমানন্দ বা আনন্দ-ব্রহ্মেরও মূলে যে এক ভাব-পরিরম্ভিত রসব্রহ্ম, রমণীয় নৃত্য-কলাদির সহিত নিত্যই লীলায়িত,— তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ।

সৃষ্টির মূলে যদি মহাভাব ও রসরাজ রূপে পরতত্ত্বের এই পরিপূর্ণ স্বরূপ বিদ্যমান না থাকিতেন,— যদি মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপরামাগণের সহিত রসভূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রাসাদি-বিলাসের বিচ্ছেদ ঘটিত, তাহা হইলে সেই রসের উৎস হইতে উৎসারিত পরমানন্দধারা বা আনন্দ-ব্রহ্মেরও সত্তা সম্ভব হইত না এবং কায়া না থাকিলে ছায়াও যেমন মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়,— তেমনি যে পরমানন্দের ছায়া বা 'আভাস'-মাত্রকে অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাও চক্ষুর নিমেষকাল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত ;—

জগতের সমস্ত আনন্দ— সকল ভাব ও রস, মুহূর্তে বিলীন হইত, — ইহা এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব।

যখন ভাব ও রসের যুগপৎ বিদ্যমানতা ভিন্ন, একের অভাবে অপরের সত্তা হয় না,— সুতরাং উহা হইতে আনন্দেরও বিকাশ হয় না, তখন সর্বানন্দের— সকল ভাব ও সকল রসের মূলে অবস্থিত যাহা, সেই মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকা ব্যতীত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং রসভূপ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন মহাভাব শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়ব্যূহরূপা সখীগণের এবং এই উভয় ব্যতীত পরমানন্দের সত্তাই যে সিদ্ধ হইতে পারে না, এ-কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহানুভব শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর-কৃত একটি শ্লোকে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

বিনা রাধাং কৃষ্ণো ন খলু সুখদঃ সা ন সুখদা।
বিনা কৃষ্ণং দ্বাভ্যামপি বত বিলাস্যা ন সরসাঃ॥
বিনা রাত্রিং নেন্দুস্তমপি ন বিনা সা রুচিভাক্।
বিনা তাভ্যাং জৃম্ভাং দধতি কুমুদিন্যোঽপিনতরাম্॥

— (অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ)

অর্থাৎ,— রাধিকা বিনা কৃষ্ণও সুখদ নহেন, কৃষ্ণ বিনা রাধিকাও সুখদা নহেন ; এবং উভয় বিনা সখীগণও সরসিতা নহেন। যেমন, রজনী বিনা নিশাকর শোভাকর নহে, নিশাকর বিনা বিভাবরী শোভাকরী নহে, এবং উভয় বিনা কুমুদিনী প্রমোদিনী নহে।

পরতত্ত্বান্বেষণপর বেদাদি শাস্ত্রের ইহাই বিশ্রামস্থল। বেদব্যাসের সমাধির ইহাই হইতেছে পরিপূর্ণ ফল। শ্রুতিরূপ কস্তুরী মৃগ হইতে বিগলিত মৃগমদের ন্যায়, এই পূর্ণতম পরতত্ত্বের সংবাদরূপ সৌরভ বহন করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত জগতের উপর নামিয়া আসিয়াছেন।

'ভাব' এই শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে 'ভক্তি' ; সুতরাং 'ভাব-গ্রাহ্য' বলিতে 'ভক্তিগ্রাহ্য'— এই অর্থই বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান নিজেও বলিয়াছেন "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ঃ" —(শ্রীভাঃ) অর্থাৎ আমি

একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু। ভক্তিই পরতত্ত্বের রস-স্বরূপতা উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। 'ভক্তি', পরতত্ত্বের স্বরূপভূতা শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; ("স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে।"— তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ৩১।)। একই বৈদূর্যমণি যেমন নীল-পীতাদি বর্ণভেদে প্রতিভাত হয়, তেমনি এক স্বরূপ-শক্তিই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-ভেদে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতররূপে প্রকাশ হয়েন। তদীয় সেই স্বরূপান্তর্গত হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির সমবেত সাররূপাই হইতেছেন— ভক্তি ; ("হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি"— সিদ্ধান্তরত্ন।)। শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দময় হইয়াও এই হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন ও ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করেন ; যথা,— "হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি।"— সিদ্ধান্তরত্ন, ১।৪৩)। অর্থাৎ শ্রীভগবান হ্লাদাত্মা বা আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও নিজের যে শক্তিদ্বারা আনন্দিত হয়েন ও ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, তাঁহার সেই শক্তিকেই 'হ্লাদিনী' বলা হয়।

শ্রীভগবানের শক্তিসকল অমূর্ত অর্থাৎ কেবল ভাবরূপে এবং সমূর্ত অর্থাৎ মূর্তিরূপে,— এই দুই প্রকারে অবস্থিত। তদীয় সমস্ত শক্তিই ভাবরূপে তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও আবার মূর্তিরূপে তদীয় ধামে নিত্যই বিরাজমানা। হ্লাদিনী-শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদরূপে, ("শক্তি-শক্তিমতোরভিন্নঃ"— সর্ব্বসংবাদিনী।) ভাবরূপা বা অমূর্তা নিষ্ক্রিয় হ্লাদিনী-শক্তি, শক্তিমান পরতত্ত্বে নিত্যই অবস্থিত আছেন ; সুতরাং তদবস্থায় পরতত্ত্ব কেবল "হ্লাদাত্মা" অর্থাৎ "সুখরূপ" আর যেখানে সেই হ্লাদিনী-শক্তি সক্রিয় ও সমূর্ত এবং পরতত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে প্রকাশিত,— তদবস্থায় তিনি কেবল 'হ্লাদাত্মা' বা সুখরূপই নহেন,— সেই মূর্তিমতী হ্লাদিনী-সার দ্বারা নিরন্তর অভিষিক্ত বা সেব্যমান হওয়ায়, সেখানে তিনি "হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ" ; অর্থাৎ 'সুখরূপ' হইয়াও সুখাস্বাদন ও সুখপ্রদান করেন। যেখানে মূর্তিমতী হ্লাদিনীসার বা সমূর্ত মহাভাব-

স্বরূপা শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরায়ণ,— ("রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা"— ইত্যাদি। ঋক্-পরিশিষ্ট।) সেই রাস-মণ্ডলে "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখাস্বাদন"— ইহাই জানিতে হইবে। নচেৎ অমূর্ত হ্লাদিনী সহ একাত্ম অর্থাৎ কেবল 'হ্লাদাত্মা' যেখানে, তদবস্থায় তিনি শুধু "সুখরূপ-কৃষ্ণ।"

সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতেছেন; ("মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"—গীতা, ৭।৭ ; "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ" —শ্রীগোপাল-উপনিষদ্। পূর্ব্ব, ৪৯)।

অতএব এক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন অধিকারীর অধিকার-ভেদে কোথাও শ্রীমন্নারায়ণাদি বিলাস-পরতত্ত্বরূপে, কোথাও শ্রীরাম-নৃসিংহাদি স্বাংশ-পরতত্ত্বরূপে, কোথাও বা অন্তর্যামী পরমাত্মা-পরতত্ত্ব-রূপে, আবার কোথাও বা নির্ভেদ ব্রহ্ম-পরতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন ; সুতরাং কেবল হ্লাদাত্মা অর্থাৎ কেবল সুখরূপ কৃষ্ণ হইতেছেন — নির্বিশেষ "আনন্দ ব্রহ্ম"। আর যে অবস্থায় তিনি "হ্লাদাত্মাপি হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ" অর্থাৎ যেখানে সুখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখাস্বাদন ও বিতরণ,— সেই কৃষ্ণই হইতেছেন আনন্দ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পূর্ণ 'রস-ব্রহ্ম' অর্থাৎ সমূর্ত রসরাজ ; আর "যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ" অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত তদীয় স্বরূপভূতা যে হ্লাদিনী শক্তিসার দ্বারা তিনি পরম রসতা প্রাপ্ত হইয়া, নিখিল আনন্দের কারণ হয়েন, তদীয় সেই শক্তিই হইতেছেন,— মূর্তিমতী পরিপূর্ণ 'ভাব' অর্থাৎ মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকা। উক্ত শাস্ত্র-মর্ম্মই শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা,—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে নাহিক' প্রভেদ॥
কৃষ্ণরাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

'ভাব' দ্বারাই 'রস' গ্রাহ্য হয়। এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ভাবেরই প্রচলিত নাম 'ভক্তি'। ভাব বা ভক্তি ব্যতীত সুখের হেতুভূত 'রস' গ্রাহ্য হয় না; অর্থাৎ কোন বিষয় রসতা-প্রাপ্ত হইয়া তাহা সুখের কারণ হয় না,— যদি সেই বিষয়ের প্রতি ভক্তিরূপা ভাব প্রযুক্ত না হয়। অপ্রাকৃত বা পরমার্থ বিষয় সম্বন্ধেই হউক, কিংবা ব্যবহার বিষয় সম্বন্ধেই হউক, উভয় স্থলে এই একই নিয়ম। তবে উভয়ের মধ্যে কায়া ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর সাদৃশ্য থাকিলেও, নির্গুণ ও সগুণ-ভেদে উভয়ে ভিন্ন বস্তু।

চাবি যেমন বদ্ধ পেটিকাকে মুক্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ধন-রত্নাদি গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্রস্বরূপ হয়, তেমনি বিষয়ের রসতাকে মুক্ত করিয়া তন্নিহিত আনন্দকে গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্রবিশেষ হইতেছে—'ভক্তি'। চাবি ব্যতীত রত্নপেটিকা প্রাপ্ত হইলেও, তাহা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, সেইরূপ কোন বিষয়েরই আনন্দ গ্রহণযোগ্য হয় না, যদি তৎপ্রতি ভক্তির বা ভাবের সঞ্চার না থাকে। 'ভক্তি' আনন্দের বৃত্তি। 'ভক্তি'-রূপ যন্ত্রবিশেষ দ্বারা আনন্দ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ভক্তিহীন বা ভাবশূন্য হইয়া কেহ কোন বিষয় হইতে আনন্দ পাইতে পারে না,— ইহা সুনিশ্চয়। তাই হরিভক্তের ভক্তি দ্বারা শ্রীহরি রসতা-প্রাপ্ত হইয়া যেমন হরিভক্তকে আনন্দিত করেন, তেমনি সঙ্গীত-ভক্তি দ্বারা সঙ্গীত রসতাপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীতভক্তকে আমোদিত করে; নৃত্য-ভক্তি দ্বারা নৃত্য রসতাপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্যভক্তকে আমোদিত করে, কাব্যভক্তের ভক্তি দ্বারা কাব্য রসতাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে, নাট্যভক্তের ভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া নাট্যরস নাট্যামোদীর আনন্দের কারণ হয়; বিদ্যা-ভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া বিদ্যারস বিদ্যাভক্তকে

আনন্দিত করে ;— ইত্যাদি প্রকারে অপর সমস্ত আনন্দ-বিষয়েই জানিতে হইবে।

বিষয়সকল প্রধানতঃ সগুণ ও নির্গুণ বা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধ। নির্গুণ বিষয় নির্গুণা ভক্তি দ্বারা এবং সগুণ বিষয় সগুণা ভক্তি দ্বারা রসরূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। নির্গুণা ভক্তির অমিশ্রিত সর্বোত্তম অবস্থা যাহা, তাহাকে 'শুদ্ধা ভক্তি' বলা হয়। ইহা নির্গুণা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা হ্লাদিনী-শক্তির সাররূপা। এইজন্য নির্গুণ পরতত্ত্বের রস-স্বরূপতা অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-পরতত্ত্ব, কেবল শুদ্ধা ভক্তি কর্তৃক গ্রাহ্য হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই ভগবৎ-পরতত্ত্বের পূর্ণতার পরমাবস্থা ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরম রসস্বরূপ অর্থাৎ 'রসরাজ'-তত্ত্ব বা শ্রুতির ভাষায় 'সর্বরস' তিনি। তাই শুদ্ধা ভক্তির পরমাবস্থা যাহা, সেই মহাভাব-রূপা শ্রীরাধিকা কর্তৃক মূর্তিমান রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। হ্লাদিনীর সার 'ভক্তি'। ভক্তিরই ঘনীভূত অবস্থা বা ঘনীভূত হ্লাদিনীসারই 'প্রেম'। প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থার নাম 'ভাব' ; ভাবের পরমোৎকর্ষতাকেই 'মহাভাব' কহে। সেই মহাভাবের মূর্তিমতী অবস্থাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ।

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৪। ৫৯-৬০)

তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রীরাধিকাই হইতেছেন হ্লাদিনীসার বা শুদ্ধাভক্তির ঘনীভূত ও সমূর্ত পরমাবস্থা। সাধারণতঃ সহজ বোধের জন্য ভক্তির পরিচয়ে রাধিকাকে পরিচিত করা হইলেও জানিতে হইবে রাধিকাই যখন সকল ভক্তির মূল, তখন রাধিকার পরিচয়ে ভক্তির সকল

অবস্থাকে পরিচিত করাই অধিক সমীচীন। এক সমূর্ত— রসভূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন সকল রসের প্রকাশ, তেমনি এক মূর্তিমতী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী হইতে অমূর্ত ও সমূর্ত সকল ভাব— সর্ব ভক্তির বিস্তার হইয়া, তদনুরূপ রসতত্ত্বকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। 'হ্লাদিনী' 'প্রেম' 'ভাব' 'মহাভাব' প্রভৃতি সমস্ত এক বৃষভানু-নন্দিনীরই অমূর্ত ভাব-বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একই আলোকশিখা নীল, পীত লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের বিভিন্ন স্ফটিকাধারে সংস্থাপিত হইয়া যেমন বর্ণভেদে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ভক্তিরূপে প্রকাশিত শ্রীরাধিকারই অমূর্ত ভাব-বিশেষ যখন দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত বিভিন্ন ভক্তাধারে সন্নিহিত হয়েন, তখন উহা সেই সেই স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া তদুপযোগী রসতত্ত্বকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। গোপীরূপা, মহিষীরূপা ও লক্ষ্মী-রূপা শ্রীভগবৎ-কান্তাগণ সকলেই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীরই সমূর্ত অবস্থা-বিশেষ ; অর্থাৎ পরতত্ত্বের রস-স্বরূপতা গ্রহণোপযোগী অমূর্ত ও সমূর্ত সকল ভাবই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকারই বিভিন্ন প্রকাশ ; যথা,—

"কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥"

— (শ্রীচৈঃ চঃ ১। ৪। ৬২-৬৫)

'রস' 'ভাব' ও আনন্দ'— এই তিনে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ; অর্থাৎ ইহাদের একের অভাবে অন্যের প্রকাশ সম্ভব হয় না। যেখানে রস সেখানে ভাব, যেখানে ভাব সেখানে রস, যেখানে রস ও ভাব সেখানে আনন্দ,

এবং যেখানে আনন্দ সেখানেই রস ও ভাবের যুগপৎ অবস্থিতি জানিতে হইবে। ভাব ভিন্ন রস নাই, রস ভিন্ন ভাব নাই, এবং রস ও ভাব ভিন্ন আনন্দ নাই,— এই কথাটির যথার্থ তাৎপর্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে তৎসহ ইহাও বুঝিতে পারিব যে, জগৎ-কারণ ও সর্ব-কারণের মূলে, মহাভাব-পরিরম্ভিত মহারসের যে উৎস হইতে পরমানন্দধারা নিরন্তর উদ্‌গীরিত হইতেছে,— যাহার আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র অবলম্বন পূর্বক নিখিল বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান রহিয়াছে,— বেদাদি শাস্ত্রের সেই মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় যাহা পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে,— তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার প্রতিপাদ্য বিষয় জানিবার পর, পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে জীবের পক্ষে আর কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না,— ইহা সুনিশ্চয়। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীল রায় রামানন্দের মুখে পরতত্ত্বের এই পরিপূর্ণ স্বরূপানুভব-যোগ্য— পরিপূর্ণ প্রেমরূপ সাধ্য বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

"সাধ্যের অবধি এই সুনিশ্চয়।" —(২।৮।৭৩)

বাস্তবিক পক্ষে পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতা এইখানেই— এই রাস-লীলায় মহাভাবরূপা গোপীপ্রেম মধ্যেই সুনিশ্চিতরূপে অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহার পর তৎ-সম্বন্ধে মানব-মনীষার পক্ষে আর অধিক অগ্রসর হইবার সামর্থ্য বা জানিবার অবশেষ থাকে না। ইহার পরেও যদি আর কিছু, কেহ জানাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অপর কেহ নহেন,— তিনি যে সেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব— স্বয়ং, ইহাও সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-রায় রামানন্দ সংবাদে দেখা যায়, রাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গোপীপ্রেমকেই "সাধ্যের অবধি" বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার পর, তখনও যেন সেই

তরুণ সন্ন্যাসীর প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না ;— ইহার পর আরও নিগূঢ় কিছু কোথাও যেন অবশেষ থাকিয়া যাইতেছে— যে-কথা জানিবার ছলে জগতকে তিনি জানাইতে চাহেন। তাই যেন কিছু সঙ্কোচের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীল রামরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥" —(২।৮।৭৩)

নবাগত সন্ন্যাসীর এই প্রশ্ন শ্রবণে রামরায় চমকিত হইয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। আকার দেখিয়া তখনও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না ; কিন্তু প্রশ্নের প্রকারে বুঝিলেন,— "কপট সন্ন্যাসী !" তাই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,

"রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥" —(২।৮।৭৪)

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয় অতঃপর শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া নীরব হইলেন। এবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, শ্রীমুখ প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; তথাপি পূর্বেকার সেই তৃষ্ণারেখা, সে মুখ-চন্দ্রমা হইতে তখনও যেন বিলীন হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন,— "এই হয়, আগে কহ আর।" রামরায় এবার স্পষ্টরূপেই নিজের অক্ষমতার কথা জানাইবার জন্য বলিলেন—

"ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহিক আমার।"

বাস্তবিক পক্ষে ইহার পর যে, আর কাহারও বুদ্ধির গতি অগ্রসর হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার পর পরতত্ত্বের অবধি সম্বন্ধে যদি কোথাও আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে, তবে স্বয়ং সেই পরতত্ত্বই তাহা জানেন এবং তিনি যদি নিজে কাহাকেও জানান, তবে সেই মহাভাগ্যবান-ই উহা জানিতে পারেন।

পরতত্ত্বের পূর্ণতা রাসলীলাস্থলেই অবধি প্রাপ্ত হইলেও, সেই রাসলীলারূপ প্রেমবিলাসের অবধি বা সীমা যেখানে পর্যবসিত, তদ্বিষয়ে জগৎ এ-যাবৎ অচৈতন্য ছিল। জীব-জগতকে সে-বিষয়ে সচৈতন্য করিতে সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বই স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া প্রশ্নচ্ছলে শ্রীল রায় রামানন্দের মুখ দিয়া আজ সেই কথাই প্রকাশ করিতে চাহেন। তাই রামরায় "ইহার পর আর বুদ্ধির গতি নাই"— বলিয়া নীরবতা অবলম্বন করিলেও, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রেরণা বলে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে পরতত্ত্ব বিষয়ে সেই নিগূঢ়তম শেষ জ্ঞাতব্য যাহা, আবিষ্টের ন্যায় তাঁহা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল রামরায় বলিলেন,—

"যে বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তব সুখ হয় কি না হয়॥
এত বলি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥"

—(২।৮।১৫০-১৫১)

রসরাজ ও মহাভাবরূপ পৃথক হইয়া, পরতত্ত্ব যেখানে রাস-লীলায়— প্রেমবিলাসে বিলসিত, পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতা যে সেইখানেই, এ-কথা পূর্বে সুনিশ্চিতরূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীল রায় রামানন্দ সর্বশেষ "প্রেম-বিলাস বিবর্ত্ত" বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা হইতেছে পূর্বোক্ত প্রেমবিলাসেরই অবধি বা সীমা।

যে অবস্থায় প্রেমবিলাসে নিমগ্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যে পরস্পর কে রমণ, কে রমণী—এই ভেদবুদ্ধি পর্যন্ত তিরোহিত হইয়া, আবার উভয়ে মিলিত বা একীভূত হইয়া থাকেন,— প্রেমবিলাসের অবধি অর্থাৎ সীমা এইখানেই। ইহা মহাভাবের অন্তর্গত **এক অনির্বচনীয় অদ্বৈতা-বস্থা**। এইরূপ অবস্থার বিষয় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে (৭ম অঙ্ক) নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।"

অর্থাৎ— সেই সময়ে আমি কান্তা ও তুমি কান্ত—এরূপ বুদ্ধি ছিল না; যে হেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় "তুমি ও আমি"— এই ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল।

কান্ত ও কান্তার পরস্পর মিলন-জনিত এইরূপ একটি একীভূততা বা অভেদাবস্থার কথা উল্লেখপূর্বক শ্রুতিও পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্তেরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন ;—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং।
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্॥ —(বৃহদারণ্যকে)

অর্থাৎ— যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণীদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য বা অন্তর কিছুই অনুভব করে না; তদ্রূপ জীব, প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।

(১) শক্তি ও শক্তিমানের অভেদে— যেমন পরতত্ত্ব কেবল 'হ্লাদাত্মা' রূপে হ্লাদিন্যাদিশক্তির সহিত নির্ভেদ ও নির্বিশেষভাবে অবস্থিত; সেই অদ্বৈত বা অভেদত্ব, লীলা-বিলাসাদিবিহীন কেবল তত্ত্বাবস্থা। (২) যেখানে পরতত্ত্ব নিজ স্বরূপভূতা হ্লাদিনীর সহিত পৃথক মূর্তিতে ভিন্ন হইয়া 'রসরাজ' ও 'মহাভাব' রূপে, প্রেমবিলাসে— রাসলীলায় নিমগ্ন, সেখানে তিনি কেবল 'হ্লাদাত্মা' বা আনন্দ-স্বরূপই নহেন,— সে অবস্থায় তিনি আনন্দিত হয়েন এবং ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন; এই জন্য ইহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ বা পরমাবস্থা। (৩) আবার এই প্রেম-বিলাসী পরিপূর্ণ পরতত্ত্বই যখন সেই প্রেম-বিলাসের অবধি বা চরম সীমাকে প্রাপ্ত হয়েন, তদবস্থায় সেই সমূর্ত মহাভাব ও রসরাজ বা শ্রীশ্রীরাধামাধব উভয়ে পুনরায় মিলিত বা

একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হয়েন।

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

—(শ্রীচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত শ্লোক।)

অর্থাৎ— শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, (অর্থাৎ সেই প্রেমের মহাভাবরূপা গাঢ়তম অবস্থা) অতএব শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। এই জন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা বশতঃ) তাঁহারা উভয়েই একাত্মা; কিন্তু তত্ত্বতঃ একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলায় পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। অধুনা (বর্তমান কলিযুগে) সেই রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হইয়া, শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধাভাবকান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

রসরাজ ও মহাভাব এই উভয়েরই প্রেম-বিলাসে বিবর্তিত এই যে অদ্বৈত বা একীভূততা,— ইহা প্রথমোক্ত শক্তি-শক্তিমান বিষয়ক অদ্বৈতের ন্যায় লীলা-বিলাসশূন্য কেবল তত্ত্বাবস্থা নহে। ইহা প্রেম-বিলাসেরই চরমাবস্থা ও লীলাতরঙ্গে উচ্ছলিত; সুতরাং ইহা শ্রবণে সহৃদয় প্রেমরসজ্ঞের প্রাণে পরমানন্দেরই সঞ্চার হইবার কথা। তবে এই বিবর্তিত প্রেমবিলাস,— ইহাও এক প্রকার অদ্বৈতাবস্থা এবং অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়া ইহাকে পূর্বোক্ত লীলা-বিলাসহীন কেবল তত্ত্বরূপ অদ্বৈতাবস্থা বলিয়া মনে করিলে তাহা রসিক ভক্তজনের পক্ষে সুখকর না হইতে পারে, এই আশঙ্কাপূর্বক শ্রীল রামানন্দ রায় উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন,— "তাহা শুনি তব সুখ হয় কি না হয়।"

প্রেমবিলাস 'বিবর্ত' রূপ এই অবধিস্থলে আসিয়া, প্রেমবিলাসী

পূর্ণতম পরতত্ত্বের প্রেমবিলাসও সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহার পর, পরতত্ত্ব বা তৎসাধ্য সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য বা শ্রোতব্য থাকিতে পারে না ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এবং তিনিই যে সেই সীমা-প্রাপ্ত পরতত্ত্ব, এ-কথা তদীয় নিত্য-পার্ষদ শ্রীল রামানন্দ রায় বুঝিতে পারিয়া, অতঃপর যদি সেই কথা উত্থাপন পূর্বক, প্রচ্ছন্নরূপ তাঁহাকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন, এই আশঙ্কায় উক্ত প্রসঙ্গ হইতে রামরায়কে সত্বর নিরস্ত করিবার জন্য, হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহস্ত দ্বারা বক্তার মুখ আচ্ছাদন করিলেন,—

"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।"

সন্ন্যাসীর বেশে প্রচ্ছন্ন সেই চির প্রিয়তমকে চিনিয়া লইবার পক্ষে তখন পর্যন্ত যেটুকু বাধা ছিল, স্বয়ং সেই সীমাপ্রাপ্ত পূর্ণতম পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রেমময় শ্রীকরস্পর্শে তাহা অপসারিত হওয়ায়, রামরায় তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাই অতঃপর কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ সহকারে সে-কথাটি উত্থাপন পূর্বক বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন,—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানাভাবে চঞ্চল দুটি কমল নয়ন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥" —(২।৮।২২০-২২৪)

শ্রীগৌর-সুন্দর বুঝিলেন, আর লুকাইবার চেষ্টা বৃথা; তথাপি একবার নিজেকে লুকাইবার শেষ চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,—

"রাধা-কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥"

—(২।৮।২২৮)

কিন্তু লুকাইতে চাহিলেও "ভক্ত স্থানে নারে কৃষ্ণ আপনা লুকাইতে"—তাই আজ তাঁহার নিত্য-পার্ষদ রামানন্দ-স্থানে তাঁর এই লুকোচুরির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তখন—

"রায় কহে, তুমি প্রভু ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥"

—(২।৮।২২৯-২৩২)

ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের এই প্রণয়রোষ-বাক্য শ্রবণে একান্ত প্রীত হইয়া, তখন রামরায়ের প্রতি স্মিতঃ-চন্দ্রিকা বিতরণ পূর্বক আপন স্বরূপ দর্শন করাইলেন।

"তবে প্রভু হাসি তারে দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

—(২।৮।২৩৩)

হেম-বিজড়িত মরকতমণির শোভা হইতেও অতি সুন্দর—মহাভাব-বিজড়িত রসরাজরূপে পূর্ণতম পরতত্ত্ব যখন প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থায় বিলসিত হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধায়িত ও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণায়িত এবং ক্রমে উভয়ের সেই বিবর্তিত পৃথক-রূপতা, নিবিড়তা প্রাপ্তিতে—শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রে এক রূপায়িত হইয়া থাকেন। প্রেমবিলাস-বিবর্তের এই

পরিনতিই প্রেম-বিলাসের অবধি অর্থাৎ সীমা। অতএব এইখানেই এই স্বর্ণগৌরাঙ্গরূপেই পরতত্ত্বের পূর্ণতমতাও সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।২।৯২)

বেদাদিশাস্ত্র যাঁহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলারূপ প্রেম-বিলাসে যাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে,— সেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতিতে সীমাপ্রাপ্ত হইলে যে লীলার প্রকাশ হয়, তাহারই নাম "শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা" বা স্ব-প্রেমানন্দ-আস্বাদন ও বিতরণ লীলা— যে লীলা হইতে জীবেরও সৌভাগ্য চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদাদির অন্বেষণীয়— এই সীমাপ্রাপ্ত-পরতত্ত্বেরই মধুরাদপি মধুর প্রেমময়ী লীলা-কথা ও তত্ত্বাদি বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রুতিসকল, অত্যন্ত নিগূঢ়তা বশতঃ যাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, অতি সংক্ষেপে "রুক্মবর্ণং—" (মুণ্ডক. ৩।১।৩), "মহান্ প্রভুঃ —" (শ্বেতাশ্ব' ৩/১২), "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ—" (মুণ্ডক' ২।১।২) প্রভৃতি উক্তি দ্বারা যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন, সেই অস্পষ্ট শ্রুতিসকলেরই বিস্তারিত অর্থ বা সঙ্গীত-মুখর সানন্দ মূর্তি হইতেছেন— শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রন্থসকল।

শ্রুতিরূপ কস্তূরীমৃগ হইতে বিগলিত মৃগমদের ন্যায়, যে শ্রীমদ্ভাগবত জগতের ভাগ্যে নামিয়া আসিয়া পূর্ণতম পরতত্ত্বের সংবাদরূপ সৌরভ দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন,—জীবের বক্ষ ও ললাটের— সেই মৃগমদাঙ্কিত তিলক-স্বরূপ যাহা, তাহাই হইতেছেন— "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।"

পূর্বে 'রস' ও 'ভাব' সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম হইতেছে এই যে, ভাবদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যখন কোন বস্তু

রসতাপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই রস-সঞ্জাত "আনন্দ" ভাবেরই গ্রাহ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু 'রস' স্বয়ং সেই আনন্দ গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য রস হইতে প্রকাশিত আনন্দের, রস হইতেছে কেবল 'বিষয়' মাত্র এবং ভাবই সেই আনন্দের 'আশ্রয়' ; অর্থাৎ যে-পর্যন্ত 'রস' ও 'ভাব' পৃথক থাকিয়া ক্রিয়াশীল হয়, সে-পর্যন্ত রস হইতে উত্থিত আনন্দ আসিয়া ভাবকেই আশ্রয় করে— ভাবই আনন্দিত হয় ; আর 'রস' তখন সেই আনন্দের কেবল বিষয় হইয়া থাকে।

আরও স্বল্প কথায় ইহার মর্মার্থ হইতেছে এই যে,— রস হইতেছে আস্বাদনের বস্তু ; সুতরাং রস— আনন্দের বিষয় অর্থাৎ আস্বাদ্য ; ভাব — আনন্দের আশ্রয় অর্থাৎ আস্বাদক। যাহা আস্বাদ্য, তাহা তৎকালে নিজের আস্বাদক হয় না ; আস্বাদকই আস্বাদ্যকে আস্বাদন করে।

সকল রস ও সকল ভাবের মূল যেখানে, সেই 'মহারস' ও 'মহাভাব'-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা যে-পর্যন্ত পরস্পর পৃথকরূপে লীলা-পরায়ণ হয়েন, সে-পর্যন্ত রসরাজ হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দের মহা-ভাবই আশ্রয় হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তখন আনন্দের কেবল বিষয় হইয়া, সেই মহারসোৎস হইতে উৎসারিত আনন্দে শ্রীরাধিকাকে পূর্ণ করিয়া থাকেন। পৃথগ্‌ভূত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রেম-বিলাস কালে সেই প্রেম-গ্রাহ্য সুখের শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্বাদ্য বা 'বিষয়' এবং প্রেম-রূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণই উহার আস্বাদিকা বা 'আশ্রয়'।

যদিও প্রেম-বিলাস কালে গোপাঙ্গনাগণের রূপ-গুণাদি বিষয় হইতে প্রাপ্ত আনন্দের 'আশ্রয়' হইয়া এবং তাঁহাদিগের প্রেমসেবা দ্বারা সেবিত হইয়া, সুখরূপ কৃষ্ণও সুখাস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকেও বিবিধ প্রকারে সুখী করিয়া থাকেন ; কিন্তু তৎকালে নিজ স্বরূপভূত মহামাধুর্য আস্বাদন-জনিত আনন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিষয় ও মহাভাব-রূপা শ্রীরাধিকা উহার পরমাশ্রয় হওয়ায়, সেই অসমোর্দ্ধ মহামাধুর্যাদি-মণ্ডিত মহারস বা 'রসরাজ' হইতে সমুত্থিত পরমানন্দ আস্বাদনে—

শ্রীরাধিকাদি গোপরামাগণই আস্বদিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্বাদ্য মাত্রই হইয়া থাকেন। সুতরাং তদবস্থায় সেই আনন্দবিশেষের কেবল 'বিষয়' যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারও নিরন্তর এই অভিলাষ হয়, যাহাতে উহার 'আশ্রয়' হইয়া, স্বীয় মহা-মাধুর্যরাশি প্রাণ ভরিয়া তিনিও আস্বাদন করিতে পারেন। পূর্ণতম পরতত্ত্বের অন্তরের এই নিগূঢ়তম অভিলাষের নিগূঢ়তম বার্তা, শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় নিম্নোক্ত প্রকারে জগতে সুপ্রকাশ হইয়াছে ; যথা,—

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে সেই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥"— ইত্যাদি।

—(১।৪।১১৪-১১৭)

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপে ভিন্ন হইয়া প্রেম-বিলাস কালে, পূর্ণতম পরতত্ত্ব তদীয় মহামাধুর্যাদির কেবল 'বিষয়ালম্বন' হওয়ায়, উহার 'আশ্রয়ালম্বনের' আশ্রয় গ্রহণ না করা অবধি, তদবস্থায় তিনি অনুভব করিতে পারেন না, যে—

(১) নিজ অসমোর্দ্ধ সেই মহামাধুর্যরাশি কি প্রকার ?

(২) 'মহাভাব'রূপ যে প্রেমদ্বারা তাঁহার মহারসতা সম্পাদন পূর্বক, শ্রীরাধিকা উহা আস্বাদন করিতে সমর্থা হয়েন,— সেই প্রেমই বা কি প্রকার ?

(৩) তদীয় 'রসরাজ'-স্বরূপের মহা মাধুর্যাদি আস্বাদন পূর্বক, সেই মহারসোদ্গীরিত আনন্দের আশ্রয়স্বরূপা শ্রীরাধিকা যে সুখাতি-

শয় অনুভব করেন,— সেই সুখের পরিসীমাই বা কি প্রকার ?

উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুভব,— উহার পরমাশ্রয়-স্বরূপা শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। তাই মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকারই শরণ লইয়া,— রাধিকার সহিত একীভূত শ্রীকৃষ্ণ,— রাধাভাব-দ্যুতি-প্রধান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে নিজ আবির্ভাববিশেষ দ্বারা উক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় প্রকৃষ্টরূপে নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্রের এই নিগূঢ় অভিপ্রায়ই বিস্তৃতভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কর্তৃক জীব-জগতে প্রচারিত হইয়াছে ;—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

—(১।১।৬)

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা অর্থাৎ মাধুর্যাতিশয় আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার ? আমার মাধুর্যই বা কিরূপ ? এবং আমার অনুভব জন্য শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় হইয়া থাকে, সেই সুখই বা কি প্রকার ?— এই ত্রিবিধ বিষয়ে সাতিশয় লোভ হেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রাধাভাব-সমন্বিত হইয়া শ্রীশচীগর্ভরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতিতেই যেমন প্রেম-বিলাস সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি পূর্ণতম পরতত্ত্বও সেইখানেই সীমাপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

"অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।"

—(১।২।৯২)

এক পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা "স্বয়ম্ভগবান" পূর্বোক্ত প্রেম-বিলাস,

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত ও প্রেম-বিলাস-বিবর্তের পরিণতি বা এক কথায় 'প্রেম-বিলাসের পরিণতি'— এই ত্রিবিধ অবস্থায় নিত্যই লীলা-পরায়ণ রহিয়াছেন। তন্মধ্যে 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'-রূপে পৃথক হইয়া প্রেম-বিলাসকালে আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপাঙ্গনা ও অন্যান্য-ভক্তগণের প্রেমসেবা দ্বারা সেবিত হইয়া তজ্জনিত ও অপর বিবিধ প্রকারে আনন্দিত হইলেও এবং ভক্তগণকে বিবিধ প্রকারে আনন্দ দান করিলেও, তদবস্থায় নিজ অপরিসীম রূপ, লীলা, বেণু, প্রেমাদি মহামাধুর্য বিষয়ক আনন্দের কেবল 'বিষয়' বলিয়া তখন তিনি সেই আনন্দবিশেষ অনুভব করিতে পারেন না এবং যে 'প্রেম' নামক ভাববিশেষ দ্বারা তদীয় মহা-রসতা গ্রাহ্য হয়, তদবস্থায় সেই প্রেমে বিভাবিত না থাকায় উহাও অপরকে দান করিতে সমর্থ হয়েন না। যেহেতু তদীয় মাধুর্যাদি জনিত সুখের আশ্রয় যাঁহারা, সেই ভক্তগণেই উহার প্রকাশ থাকায়, সর্বোত্তম ভক্তভাবে অর্থাৎ মহা-ভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত না-হওয়া অবধি সেই প্রেমও বিতরণ করেন না। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে— প্রেম-বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণ, মুক্তি প্রভৃতি অবাধে দান করিয়া থাকেন কিন্তু তদীয় মহা-মাধুর্যরাশির রসতা গ্রহণোপযোগী 'প্রেম' নামক ভক্তি বা ভাববিশেষ তখন দান করেন না, (মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগম্— শ্রীভাঃ ৫।৬।১৮)—ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়।

প্রেম-বিলাস-বিবর্তে যেখানে পৃথকভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের পরস্পর ভাব-বিপর্যয়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভোর, তদবস্থায় নিজ মাধুর্যাদি সুখের 'বিষয়'-রূপ শ্রীকৃষ্ণ, তদাশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে বিবর্তিত হওয়ায়, সেই মহাভাব দ্বারা নিজ মহামাধুর্যাদি বিষয়ের মহারসতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু তন্ময়তার আবেশে, তৎকালেও সেই প্রেম দান করা হয় না।

অনন্তর প্রেম-বিলাসের পরিণতিতে মহাভাব-বিভাবিত রসরাজ ও রসরাজ-বিভাবিত মহাভাব, যখন উভয়ের নিত্যযুক্ত একরূপতায়

প্রেম-বিলাসের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়েন, তখন রাধাভাবকান্তি-প্রধান—মূর্তিমান প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-লীলার প্রকাশ করেন।

পূর্ণতম পরতত্ত্ব এইখানেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়া, 'বিষয়' ও 'আশ্রয়ে' একরূপায়িত হইয়া পূর্বোক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই আনন্দবিশেষ পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন পূর্বক অপরিসীম আনন্দের আতিশয্যে, উহার আনুষঙ্গিক কার্যস্বরূপ নিজ রস-স্বরূপতা গ্রহণোপযোগী সেই 'প্রেম'— যাহা পূর্বাবস্থায় দান করা হয় নাই, তাহাই এখন অবাধে ও বিপুলভাবে তাঁহা কর্তৃক জীব-জগতে বিতরণ করা সহজ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই আমরা এ-সকল কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি ; যথা—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥ (ইত্যাদি)

—(১।৮।১৬-১৮)

অতএব এইখানেই— এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিশ্বম্ভররূপেই পরতত্ত্ব সীমা-প্রাপ্ত। কেবল এই অবস্থাতেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, নিজ অসমোর্ধ্ব মাধুর্যরাশির আস্বাদন-সুখ নিজে অনুভব করিয়া, সেই বিষয়ে অচৈতন্য জগতকে পূর্ণ চৈতন্য প্রদান করেন এবং নিজ পূর্ণ রস-স্বরূপতা গ্রহণ করিবার উপযোগী পূর্ণপ্রেম শ্রাবণের ধারার মত তৎকালে এমন বিপুলভাবে বিতরণ করেন, যাহাতে বিশ্ব ভরিয়া উঠে।

মঞ্জরী দেহ লাভ করিয়া প্রেম-বিলসিত ব্রজকিশোর-যুগলের সুদুর্লভ প্রেম-সেবাপ্রাপ্তিরূপ যে চরম সৌভাগ্য জীবের ভাগ্যে কদাচিৎ

উদয় হইয়া থাকে,— সেই মহাভাগ্যেরও সীমা এইখানে,— এই শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সম্পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন উহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। এইজন্য শ্রীনবদ্বীপ-লীলার মধ্যেই জীবের সৌভাগ্যও যে সীমাপ্রাপ্ত,—ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

একই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা 'স্বয়ম্ভগবানের' বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর— এই ত্রিবিধ বয়সের মধ্যে, কৈশোরেই তদীয় বয়ঃমাধুর্য সীমাপ্রাপ্ত হইলেও ("বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং— " ২।১৯।১০)[১] বাল্য ও পৌগণ্ডেও তাঁহার সেই পূর্ণতমতা বা স্বয়ং-ভগবত্তা যেমন অণুমাত্রও হ্রাসবৃদ্ধি না হইয়া পরিপূর্ণই থাকে, সেইরূপ, সেই এক পূর্ণতম পরতত্ত্বই প্রেম-বিলাস, প্রেম-বিলাস-বিবর্ত ও উহার চরম সীমা বা প্রেম-বিলাসের পরিণতিতেই প্রেম-বিলাস সীমাপ্রাপ্ত বলিয়া, পূর্ণতম পরতত্ত্বও এই অবস্থাতেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং ইহা বুঝিতে পারিলে, পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহার পর আর কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না।

প্রেম-বিলাস কালে তদীয় বাঞ্ছাত্রয়ের অপূর্ণতার কথাও তদবস্থায় প্রেম দান বিষয়ে প্রতিবন্ধকতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তিনিই আবার প্রেম-বিলাসের পরিণতি বা চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সেই অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন এবং সেই প্রেম অবাধে জীবকে দান করিতেছেন।

একই স্বয়ম্ভগবানের 'প্রেম-বিলাস' বা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা এবং 'প্রেম-বিলাসের পরিণতি' বা শ্রীনবদ্বীপ-লীলা,— এই উভয় অবস্থাই

১। "বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥"
—(শ্রীচৈঃচঃ, মধ্য, ১৯পঃ)

প্রপঞ্চাতীত ধামে যুগপৎ ও নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া, সেই লীলাই আবার আলাতচক্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অপর ব্রহ্মাণ্ডে পর্যায়ক্রমে যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে। শ্রীভগবানের সকল লীলাই কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ড অবলম্বনে সর্বকালেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব একই পূর্ণতম পরতত্ত্বের পক্ষে বাঞ্ছাত্রয়ের অপূর্ণতা ও পূর্ণতা এবং প্রেম অপ্রদান ও প্রদান— যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে বলিয়া, ইহা দ্বারা তদীয় অচিন্ত্য বিরুদ্ধ-ধর্মরূপ মহামহিমা বিঘোষিত হইতেছে। সুতরাং উহা দূষণ না হইয়া ভূষণই হইয়াছে জানিতে হইবে।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলার আনুগত্যে জীব, প্রেমলাভ করিয়া, মঞ্জরী-রূপে কেবল যে শ্রীব্রজ-লীলারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন তাহা নহে; স্বরূপতঃ একই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্র-রূপে প্রেম-বিলাসের অবস্থা-ভেদে নিত্যই লীলা-পরায়ণ রহিয়াছেন বলিয়া, তাই সিদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে যুগপৎ উভয় লীলাতেই নিত্য স্থিতির কথা, মহাভাগবতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন ;—

"হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ।"

পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা ব্যবহিত না হইলে, অপ্রাকৃত কোন কিছুই উপলব্ধির বিষয় হয় না। এইজন্য অপরিচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্-লীলাদি বিষয়কেও কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্নের মতই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইতে হয়। একই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং-ভগবানের স্বরূপাভেদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে দ্বিবিধ লীলাই অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য ; সুতরাং যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে। কেবল পূর্ণতম পরতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ম্ভগবানের কৃষ্ণ ও গৌর-লীলাই নহে,— পরতত্ত্বের অপরাপর স্বরূপের সকল লীলাই অনাদি, অনন্ত বা নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন। পূর্বে ছিল না, পরে হইল, কিংবা আবার পরে থাকিবে না— এরূপ নহে। শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপ-

লীলা অনাদিকাল হইতে যুগপৎ চলিতেছে ও অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে। এক স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ম্ভগবানই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণরূপে পৃথক হইয়া যেমন প্রেম-বিলাসে নিত্যই বিলসিত হইতেছেন তেমনই আবার নিজ অবিচিন্ত্য শক্তি দ্বারা, প্রেম-বিলাসের পরিণতিতে — সেই উভয়ের এক নিত্য-যুক্ত অবস্থায়— সেই একই স্বয়ম্ভগবান নিত্যই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীনবদ্বীপ-লীলার বিস্তার করিতেছেন।

একই স্বরূপের যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপ উভয় লীলাই নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও— "বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দুই রূপে ছিলেন, পরে উভয়ে মিলিয়া নবদ্বীপে গৌর হইয়াছেন", কিম্বা "রাধাকৃষ্ণই প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ হয়েন" অথবা "কৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন"— ইত্যাদি প্রকারে কালগত পরিচ্ছেদ-বোধক পূর্বাপর ক্রমে, শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে যে পরিচিত করান হইয়া থাকে, তাহার প্রধান দুইটি কারণ এই যে,— প্রথমতঃ কালাদি পরিচ্ছেদ ভিন্ন আমরা কোন অপরিচ্ছিন্ন বিষয়ের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা "স্বয়ং ভগবান" বলিয়া, এবং পরতত্ত্বের অন্যান্য স্বরূপসকল সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, বিলাস ও স্বাংশাদিরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। স্বয়ম্ভগবানের যে বিশেষ আবির্ভাবটি প্রেম-বিলাসের পরিণতি বা সীমাপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থিত, তাহা অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়া, সেই একই স্বয়ম্ভগবানের প্রসিদ্ধ যে প্রেম-বিলাসাবস্থা,— সেই প্রেম-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয়ে তৎ-স্বরূপাভিন্ন— নিগূঢ় শ্রীগৌরচন্দ্রকে "সেই কৃষ্ণ", বলিয়া প্রথমে পরিচিত করাইয়া লওয়া একান্তই আবশ্যকবোধে, তাই সাধু ও শাস্ত্রসকল কর্তৃক পূর্বোক্ত প্রকারের নির্দেশ দেখা যায়। "স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব" অর্থাৎ স্বয়ং-ভগবানের বিলাস, স্বাংশাদি "তদেকাত্ম" রূপের সহিত,— এমন কি প্রকাশের সহিতও স্বয়ংরূপের যে পার্থক্য

আছে,[১]— শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌররূপে লীলায়িত এক স্বয়ম্ভগবানের এই আবির্ভাবদ্বয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ সেরূপ কোন ভেদও না থাকায়, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পরিচয়ে নিগূঢ় গৌরকে "সেই কৃষ্ণ" বলিয়া জীবের নিকট পরিচিত করা যেমন সম্পূর্ণ সঙ্গতই হইয়া থাকে, তেমনি আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপেও যে, সেই একই স্বয়ং-রূপতত্ত্ব— স্বয়ম্ভগবান, ইহা বুঝিতে পারিলে, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেও 'সেই গৌর' বলিয়া পরিচয় প্রদানকরা,— ইহাও সেইরূপ সুসঙ্গত হইয়া থাকে। তাই দেখা যায়, মহাভাগবতগণ প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রকে 'সেই কৃষ্ণ' বলিয়াই জীবের নিকট পরিচিত করাইয়াছেন ; যেমন ;—

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই ॥" ইত্যাদি

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।২।৬)

এইরূপ বহু স্থলেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে, সেই একই শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিচিত করাইয়া, তখন আবার সেই গৌরচন্দ্রের পরিচয়েই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ; যেমন,—

"এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে ॥" — ইত্যাদি

(—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে।)

১। স্বয়ং-রূপের সহিত তদেকাত্ম-রূপের যে ভেদ আছে, প্রকাশ ও স্বয়ং-রূপের মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ না থাকিলেও তদেকাত্মরূপের ন্যায় প্রকাশও 'অনন্যাপেক্ষী' নহে— স্বয়ংরূপাপেক্ষী, অতএব কেবল স্বয়ং-রূপ-তত্ত্বই অনন্যাপেক্ষী অর্থাৎ 'স্বতন্ত্র' বা স্বয়ংসিদ্ধ রূপ। এই স্বয়ং-সিদ্ধরূপকেই স্বয়ম্ভগবান বলা হয়।

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

— শ্রীলঘুভাগবতামৃতে

এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই প্রদান করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে অধিক উল্লেখ করা হইল না।

অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্র স্বরূপে সম্পূর্ণ অভিন্নই হইতেছেন; অর্থাৎ এক স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংরূপেরই প্রেম-বিলাসের অবস্থাভেদে আবির্ভাব ভেদ মাত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-বিলাসী শ্রীগোবিন্দই শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌররূপে প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থায় যেমন নিত্যই লীলায়িত রহিয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীনবদ্বীপের সেই শ্রীগোরাঙ্গই শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপে পৃথক হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যই প্রেম-বিলাস বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং কেবল 'কৃষ্ণই গৌরাঙ্গ' বলিলে ঠিক বুঝা হয় না, যদি তৎসহ 'গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ'— ইহাও না বুঝা হয়। স্বয়ংরূপের সহিত তদীয় প্রকাশ, বিলাস ও স্বাংশাদির যে ভেদ,— শ্রীগৌর ও শ্রীগোবিন্দে সেরূপ কোন ভেদই না থাকায় 'শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ' বলিবার সঙ্গে 'শ্রীগৌরাঙ্গই কৃষ্ণ'— ইহাও বুঝিতে হইবে। নচেৎ উভয় আবির্ভাবের মধ্যে একের স্বয়ংরূপতা অর্থাৎ 'অনন্যাপেক্ষিতা' এবং অপরের প্রকাশ-বিলাসাদির ন্যায় স্বয়ংরূপাপেক্ষিতা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উভয় আবির্ভাবেরই স্বতন্ত্রতা বা স্বয়ম্ভগবত্তা থাকে না। একমাত্র স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ম্ভগবানই 'স্বতন্ত্র'।

গোবিন্দে ও গৌরাঙ্গে স্বরূপাভিন্নতা বশতঃ অর্থাৎ যুগপৎ 'গোবিন্দই গৌর' এবং 'গৌরই গোবিন্দ' বলিয়া, তাই কৃষ্ণচন্দ্রের মতই গৌরচন্দ্রকেও সেই এক স্বতন্ত্রই ('গৌরচন্দ্রে স্বতন্ত্রে'—আচার্য্য প্রভু-কৃত শ্লোক হইতে) বলা হইয়াছে। যুগপৎ এক স্বতন্ত্র—স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্বের গোবিন্দ ও গৌররূপে আবির্ভাব ভেদ মাত্র; সুতরাং স্বরূপতঃ যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর, যিনি গৌর তিনিই কৃষ্ণ। অতএব 'কৃষ্ণই গৌর হইয়াছেন' কেবল ইহাই বলিলে ও ইহাই বুঝিলে—তাহা ঠিক বলা বা ঠিক বুঝা হয় না।

বিশেষতঃ স্বয়ম্ভগবান যেখানে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে সীমাপ্রাপ্ত,

যেখানে 'বিষয়ে' ও 'আশ্রয়ে' বা 'মহারসে' ও 'মহাভাবে' একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া, পূর্ণতম পরতত্ত্ব আপন মাধুর্যরাশি নিত্যই পরিপূর্ণ-রূপে আস্বাদন ও তদনুভবযোগ্য 'প্রেম' অবাধে অজস্রভাবে জীবকে দান করিতেছেন,— সেই সীমাস্থল হইতেই পরতত্ত্বের সকল পরিচয় প্রদান করা অধিকতর সমীচীন হইয়া থাকে।

এক স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্বেরই লীলারস-পাথারে রসিক ভক্ত-মরালগণ নিরন্তর সন্তরণশীল হইয়া থাকেন। সেই রস-সাগরে উজাইয়া যাইলে, উহা ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়া গৌরলীলায় সীমাপ্রাপ্ত হয়; আবার তথা হইতে ভাসিয়া আসিলে, উহাই শত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া, বিচিত্র তরঙ্গরঙ্গরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম-বিলাস বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতময়ী ভাষায় সে-কথা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গ লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥"

—ইত্যাদি। (২।২৫।২২৩)

অর্থাৎ,— শত শত ধারায় কৃষ্ণলীলামৃতসার যাহা হইতে দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে,— সেই গৌরলীলারূপ অক্ষয় সরোবরে মনহংসকে বিহার করাও।

এখানে গৌরাঙ্গ-লীলারূপ পরতত্ত্বের সীমাস্থল হইতেই তদভিন্ন-স্বরূপ-প্রেমবিলাসী পূর্ণতম পরতত্ত্বেরও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

সেইরূপ, পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা স্বয়ম্ভগবান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান প্রভৃতি 'তদেকাত্ম' নিখিল পরতত্ত্ব-স্বরূপের মূল অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বলা হয়, তেমনি সেই পূর্ণতম পরতত্ত্বের অভিন্ন-স্বরূপও বিশেষতঃ সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা

বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ সেই সীমাস্থল হইতেই উক্ত পরতত্ত্ব-সকলের পরিচয় ঘোষণা করিতে দেখা যায় ; যথা ;—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।৩ শ্লোক)

অর্থাৎ,— উপনিষদে যিনি অদ্বৈত-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত, তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা বলিয়া কথিত, তিনিও ইহার অংশ বিভূতি ; তত্ত্ববিচারে যিনি ষড়ৈ-শ্বর্যপূর্ণ ভগবান অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ বলিয়া খ্যাত,—তিনিও ইহার বিলাস ; এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ংরূপ (অর্থাৎ স্বয়ম্ভগবান), এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর পরতত্ত্ব নাই।

'আশ্রয়ে' ও 'বিষয়ে' এক-রূপায়িত শ্রীগৌরচন্দ্রেই পরতত্ত্ব সীমাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাই তাঁহাতেই যুগপৎ ভক্তভাবের ও ভগবদ্-ভাবের পূর্ণতম সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

রাধাভাব হইতে আরম্ভ করিয়া কখন সখীভাব, কখন মঞ্জরী-ভাব ইত্যাদি সর্বভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ এবং প্রধানরূপে মহাভাব-লক্ষণের অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকাশসকল দ্বারা একদিকে যেমন তদীয় স্বরূপের 'পরামাশ্রয়ত্ব' প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তেমনি অপরদিকে আবার 'বিষয়ত্বের' পূর্ণতম অবস্থা অর্থাৎ সর্বাবতারী— স্বয়ংরূপ পর-তত্ত্বেরও সীমা বলিয়া তাই শ্রীগৌররূপে, তদীয় অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সহিত যেমন পরিদৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনই সেই তাঁহাতেই বিলাস ও স্বাংশাদি তদেকাত্মস্বরূপ সকল মহাভাগবতগণের দর্শনে প্রতিভাত হইয়াছেন ; মহৎগণের বর্ণনা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় ;—

(১)

"গৌরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিয়া ঢাকিয়া ব্যাপক হইয়া
নিজ রূপ প্রকাশিল ॥
নবদ্বীপে আসি গৌর রূপ রাশি
গণের সহিত নাচে।
সে রূপ রতনে যে দেখে নয়নে
সে কি গো পরাণে বাঁচে ॥
সে নৃত্য সে প্রেম সে বরণ হেম
সে সব সঙ্গিয়া সনে।
দেখিল নয়নে তখন যে জনে
সে আনন্দ সেই জানে ॥

(২)

কিবা চমৎকার প্রেমের বিকার
নাহি লোক বেদে শুনি।
কভু হেম তনু মল্লি পুষ্প জনু
কভু পদ্মরাগ মণি ॥
কভু হেমপিণ্ড কভু খণ্ড খণ্ড
অস্থি সন্ধি ছুটি যায়।
কভু লোমকূপে রক্তধারা ব্যাপে
অশ্রু পিচকারী প্রায় ॥
বুঝি প্রেমরস হইয়া সরস
উপছি বহিয়া যায়।

মণিমুক্তা যথা অনুভব তথা
সুভগ সোণার গায় ॥

(৩)

প্রকাশি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য
দেখায় ভক্তগণেরে।
কভু চতুর্ভুজ কভু ষড়্ভুজ
নিজ নানা রূপ ধরে ॥
কভু রাধাসহ নীলকান্ত দেহ
মুরলীবদন রূপে ॥
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে কীর্ত্তনে বিরাজে
কভু বহু রূপে ব্যাপে ॥" —ইত্যাদি।

—(শ্রীভক্তমাল হইতে)

অতএব স্থিরভাবে যদি সকল দিক চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে যে— "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" রসরাজ ও মহাভাবে নিত্য-যুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গরূপেই পরতত্ত্ব সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং কৃষ্ণচৈতন্য হইতে ইহার পর আর কোন পরতত্ত্ব জানিবার নাই।

পরতত্ত্বের যে পূর্ণতম স্বরূপকে নানা প্রকারে ব্যক্ত করিবার প্রয়াসে ব্যাকুল শ্রুতিসকল 'অন্নব্রহ্ম' হইতে আরম্ভ করিয়া অব-শেষে 'রসব্রহ্ম' বলিয়া যাঁহাকে নির্দেশপূর্বক, যাঁহার সীমাস্থল অন্বেষণ করিতে যাইয়া পূর্বোক্ত 'রুক্মবর্ণ' 'মহান্‌প্রভু'—ইত্যাদি শব্দে কেবল যাঁহার অস্ফুষ্ট ইঙ্গিতমাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন— সেই পূর্ণতম রসতত্ত্ব বা পরব্রহ্মকে পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুটরূপে জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে পরতত্ত্বের সেই পূর্ণতম স্বরূপকে প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু উহার

'সীমা' সেরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় নাই,— যেহেতু জগতে উহার প্রকাশ, একমাত্র সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বের প্রকট হইতেই সম্ভব হইয়া থাকে।

অতএব পরতত্ত্বের যে শেষ সংবাদ জীব-জগতের পক্ষে জানিবার অবশেষ ছিল,— যাহা না জানিলে জীবের সৌভাগ্যও উহার চরম সীমাকে বরণ করিতে পারিত না,— সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্ব স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্বিষয়ে অচৈতন্য জগতকে সচৈতন্য করিয়াছেন এবং নিজ মহারস-স্বরূপতা গ্রহণোপযোগী প্রেমাখ্য সমুন্নত ভাববিশেষ পরিপূর্ণ-রূপে জীবকে প্রদান করিয়াছেন। যে অবস্থায় পূর্ণতম পরতত্ত্ব বা মহা-রস, মহাভাবাখ্য প্রেমের সহযোগে— প্রেমরূপে মূর্তিমন্ত হইয়া, প্রেম-দ্বারা নিজ মহামাধুর্য-রস আস্বাদন পূর্বক, সেই প্রেম পাত্রাপাত্র নির্বিচারে— অবাধে— অজস্রভাবে জীবকে প্রদান করেন,— উহাই হইতেছে পরতত্ত্বের সীমাবস্থা। পরতত্ত্বের এই 'সীমা' বা শেষকথা, যাহা পূর্বে কেহ সম্যকরূপে জানিতে ও জানাইতে পারেন নাই, শ্রীচৈতন্য-লীলা হইতে জগৎ তাহা কেবল জানিয়াই নহে— পাইয়াও ধন্য হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম চারিটী পরিচ্ছেদ সেই লীলারই ভূমিকা বা সূচনা এবং অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসকল সেই মহারস ও মহাভাবে নিত্যযুক্ত— সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বেরই অমৃতময়ী লীলাকথা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রন্থই হইতেছেন, সেই বেদগুহ্য নিগূঢ়তম পরতত্ত্ব বা প্রেমাবতারের প্রেম-লীলাকথার জগতে প্রথম প্রচারক।

প্রেমমূর্তিতে প্রচ্ছন্ন প্রেম-বিলাসীর সেই নিগূঢ়তম অবতারকে বুঝিবার পক্ষে পূর্বে কেহ সমর্থ হয়েন নাই। তাই দেখা যায়, পরি-ব্রাজক-রাজ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ যখন জগতে এই পূর্ণতম পরতত্ত্বের প্রেমরূপে অবতরণ ও অত্যাশ্চর্য প্রেম-বিতরণের নিগূঢ় রহস্য তাঁহারই কৃপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন, তখন গৌরানুরাগ-বন্যার

প্রবল আঘাতে বাঁধভাঙা হৃদয়ের মহোচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে,— লেশমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—

"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

—(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে, ৪।১৮)

অর্থাৎ নিজ গণের সহিত অবতীর্ণ প্রেমাবতার ও তৎপ্রদত্ত যে প্রেমভক্তি বিশেষের নির্দেশ বিষয়ে ব্যাসাদি মুনীশ্বরগণও (সেই ভগবদিচ্ছায়) ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেব যাহা হয়ত জানিতে পারিয়াও জানাইতে সমর্থ হয়েন নাই, যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজেও কাহারও নিকট উদ্ঘাটিত করেন নাই,— সেই— সমুজ্জ্বল ভক্তি পথে এক্ষণে গৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। অর্থাৎ ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টরূপে পরতত্ত্বের সীমাবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় নাই তাহার আরও কারণ এই যে,— পূর্ণতম পরতত্ত্ব প্রেম-বিলাসের পরিণতিতে যেখানে সীমাপ্রাপ্ত, সেখানে তিনি পূর্ণতম ভক্তভাবদ্বারা ছন্ন সুতরাং অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়া ("ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ —।" শ্রীভাঃ ৭।৯।৩৮) তাই শ্রীমদ্ভাগবত তদীয় সেই ছন্ন লক্ষণের ও নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যতিক্রম না করিয়া কেবল বিশেষণে সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সেই তিনিই যে তদীয় আবির্ভাবিতযুগের (অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ কলিযুগের) প্রধান উপাস্য, শ্রীভাগবতে এ-কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রীকরভাজন, নিমিরাজের নিকট যে কয়টী শ্লোকে উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বর্তমান বিশেষ কলিযুগের প্রধান উপাস্য

সেই পূর্ণতম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন পূর্ণতম ভগবানকেই সঙ্কীর্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক অর্চনা করিবার স্পষ্টই উপদেশ করা হইয়াছে ; যথা,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

—(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩১)

অর্থাৎ, যিনি কৃষ্ণকে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন পূর্বক সকল লোককে কৃষ্ণ বিষয়ে উপদেশ করেন, এবং যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামের মধ্যে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় নিহিত রহিয়াছেন ; কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত ("শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।"-- শ্রীভাঃ, ১০।৮।১৩) বা বিদ্যুৎ-গৌর হইয়াও, আবার ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হয়েন ; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ ; শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যাঁহার উপাঙ্গ, শ্রীহরি নাম যাঁহার অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি যাঁহার পার্ষদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ (বর্তমান বিশেষ কলিযুগে, "— কলাবপি তথা শৃণু।" — শ্রীভাঃ, ১১।৫।৩০) শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অর্চন করিয়া থাকেন ; — উক্ত শ্লোকের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য।

বেদাদি সনাতন ধর্মশাস্ত্রসকল, সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব— পরমেশ্বর হইতেই সৃষ্টির সহিত পূর্ব সৃষ্টির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। "অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।"— ইত্যাদি।

—(বৃহদারণ্যকে,-২।৪।১০)

অর্থাৎ— অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ মহত-ভূতের অর্থাৎ বিভুরূপ এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

উক্ত শাস্ত্রসকলের সহিত রচয়িতার ন্যায় যে সকল মুনি, ঋষি, দেবতা মহৎগণের নাম সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায় তাহার কারণ,— তাঁহারা 'কারক' বা রচয়িতা বলিয়া নহে, তাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রের 'স্মারক' বলিয়া অর্থাৎ গুরু-পরম্পরায় যথাশ্রুত বিষয়সকল যখন যাঁহা কর্তৃক যথাকালে বিশেষভাবে জনসমাজে প্রচারিত বা প্রসিদ্ধ হয়, সেই শাস্ত্রের সহিত তখন হইতে তাঁহার নাম জয়যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল সনাতন ধর্মশাস্ত্রের একমাত্র সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ প্রণেতা বা 'কারক' নাই; শিব-ব্রহ্মাদি ঋষি পর্যন্ত সকলেই শাস্ত্রের 'স্মারক মাত্র', কেহই 'কারক' নহেন। ("শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ।" —শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যধৃত-স্মৃতিবাক্য।)

অতএব পরতত্ত্ব-নির্ণায়ক সনাতন ধর্ম-শাস্ত্রসকল মূলতঃ এক পরমেশ্বর হইতেই প্রাদুর্ভূত হইলেও এই প্রাদুর্ভাবরীতি স্থিরভাবে অনুভব করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়,— শ্রুতিসকল যেন তাঁহার নিঃশ্বাসের মত,— তাই অস্পষ্ট; শ্রীমদ্ভাগবত যেন তাঁহার শ্রীমুখের বাণীর মত,— তাই সুস্পষ্ট; আর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত যেন তাঁহার সরস সঙ্গীতের মত,— তাই আরও সুস্পষ্ট এবং আরও সুমিষ্ট।

প্রথম প্রকাশ ঃ— শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-ই-শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ।
(মাসিক পত্র) ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা হইতে ১৮শ বর্ষ,
৫ম সংখ্যা পর্যন্ত। আষাঢ়, ১৩৪৭ হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সাল।

——

ভক্তি ও শ্রীভানু-নন্দিনী

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে নহি কোন ভেদ॥
কৃষ্ণ রাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

—(শ্রীচৈঃচঃ, আদি ৪।৯৬-৯৮)

শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী— রাধারাণীই যে পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, — ইহা জানিতে হইলে, প্রথমে শক্তি ও শক্তিমান-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার আবশ্যক— যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তির অমূর্ত স্বরূপ যাহা, তাহাই 'ভক্তি' এবং সেই ভক্তিঘন সবিশেষ ও সমূর্ত স্বরূপ যাহা, — তাহাই ভানু-নন্দিনী— শ্রীরাধিকা।

অগ্নি, তাহার প্রভা ও স্ফুলিঙ্গাদির কারণ ও আশ্রয়; প্রভাদি অগ্নির কার্য ও আশ্রিত। যদিও প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদি অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন বস্তু নহে, তথাপি একান্ত অভিন্নও নহে। প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদি অগ্নি হইতে উৎপন্ন— অগ্নিরই শক্তি বা কার্য ব্যতীত অপর কিছু নহে। অতএব একদিকে যেমন অগ্নি হইতে অভেদ, তেমনি অন্যদিকে তাহারা অগ্নি হইতে ভেদও বটে; যেহেতু অগ্নিই প্রভাদির আশ্রয়, প্রভা ও স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি অগ্নির আশ্রয় নহে— আশ্রিত অগ্নিই প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদির কারণ, প্রভাদি অগ্নির কারণ নহে— কার্য।

সুতরাং অগ্নি এবং তাহার প্রভা ও স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যেমন উক্ত-

প্রকার যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ এবং ভগবৎ-স্বরূপ ভিন্ন আর যাহা কিছু— এই উভয়ে এক অচিন্ত্যনীয় ভেদাভেদ-সম্বন্ধে নিত্য সংবদ্ধ। শ্রীভগবান শক্তিমান; গোলোক, দ্যুলোক, ভূলোক,— জীব, জড় আর যাহা কিছু, সমস্তই তাঁহার শক্তি বা বিভূতি; শ্রীভগবান কারণ-তত্ত্ব, জীব ও জড়-জগৎ তাঁহার কার্য। শ্রীভগবান আশ্রয়-তত্ত্ব, জীব ও জড়শক্তি তাঁহার আশ্রিত। শ্রীভগবান সেব্য, শক্তি মাত্রেই তাঁহার সেবিকা। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার শক্তির উক্তপ্রকার অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি উক্ত হইয়াছে;—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না-বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

— (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২২।৫৬)

অর্থাৎ, একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বহুদেশ-ব্যাপিনী হয়, তেমনি পরব্রহ্ম শ্রীহরিরই শক্তি অখিল জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের বহুবিধ শক্তির কথা ও নিখিল বিশ্ব-সংসার যে তাঁহারই শক্তির প্রকাশ,— এ-কথা শ্রুতিও ভক্তিভরে গাহিয়াছেন;

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

— (শ্বেতাশ্বঃ, ৪।১)

অর্থাৎ, এক পরমেশ্বর— অদ্বিতীয়। আর যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সেই সমস্তই তাঁহার শক্তি। তিনি স্বশক্তিমাত্র সহায়ে, আদিতে এই বিশ্বের সৃজন করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি ও শুক্লাদি বিবিধ বর্ণরহিত হইয়াও স্বীয় বিভিন্ন শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ও শুক্লাদি বিবিধ বর্ণসকল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে

সেই পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন ; তৎকর্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি স্বপ্রকাশ ও চিদানন্দময় পুরুষ। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করুন।

এক অগ্নির শক্তি যেমন প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম— এই ত্রিবিধাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই প্রকার শক্তিমান শ্রীভগবানের নিখিল শক্তিই নিম্নোক্ত ত্রিবিধা প্রধান শক্তির অন্তর্গত ; যথা,—
(১) চিৎ-শক্তি, (২) চিদচিৎ-শক্তি, (৩) অচিৎ-শক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, ('পরাশক্তি'— ইহার আর একটি নাম।) চিদচিৎ-শক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি এবং অচিৎ-শক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। উক্ত শক্তিত্রয়ের বিষয় বিষ্ণুপুরাণে এই-রূপ উক্ত হইয়াছে ;—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

— (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৭১)

অর্থাৎ,— বিষ্ণুর পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া নামক তিনটি শক্তি আছে। বিষ্ণুর স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাঁহার কার্য— এবংবিধ শক্তিকে মায়াশক্তি বলে।

দৃষ্টান্ত স্থানীয় অগ্নি ও অগ্নিশক্তির সহিত ভগবান ও ভগবচ্ছক্তির তুলনা করিলে কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, চিচ্ছক্তি—প্রভা-স্থানীয় ; জীবশক্তি— স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়, এবং মায়াশক্তি— ধূম-স্থানীয়।

বিশ্ব-প্রপঞ্চাদি জড়-জগৎ যে শ্রীভগবানের মায়া-শক্তিরই পরি-ণাম, এ-কথা সুন্দর দৃষ্টান্তসহ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;—

যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ —(মুণ্ডক, ১।১।৭)

অর্থাৎ— যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, সেইরূপ এখানে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জীবশক্তি স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় ও অপরিসংখ্যেয়। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিরই কণা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ জীবরাশি চিচ্ছক্তিরই কণা। অতএব জীবের স্বরূপ শুদ্ধ চিৎ-কণ বলিয়াই জানিতে হইবে। যথা,—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
— (শ্রীভাগবতে—শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ হইলেও তাহাকে যে চিদচিৎ (চিৎ+অচিৎ) বলা হইয়াছে, তাহা অনাদিবদ্ধ সংসারী জীবকেই লক্ষ্য করিয়া। মায়াবদ্ধ জীবের আত্মা চিৎকণ, আর তাহার মায়িক দেহেন্দ্রিয়াদি অচিৎ বা জড়বস্তু। এই চিৎ ও অচিদের সংযোগবশতঃ বদ্ধজীবকেই চিদচিৎ শক্তিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অবিদ্যার তিরোধানে জীব মুক্ত হইলে, তখন সেই জীব চিদ্ভাব বা চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান বা তদীয় সিদ্ধভক্তগণের দেহ, জড়ীয় বা অচিদ্‌বস্তু নহে ; তাহা ভগবৎ-সদৃশ সচ্চিদানন্দময়। শ্রীভগবানের দেহ ও অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের দেহ, এই উভয়ের মধ্যে মহান পার্থক্য রহিয়াছে। শ্রীভগবানের মূর্তি চিদ্‌ঘন বা চিদানন্দময় ; আর সংসারাবদ্ধ জীবের দেহ অচিৎশক্তির বিকার বা জড়ময়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জীবগোস্বামী, লিখিয়াছেন—

"জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যাভূতো দেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্‌ঘনবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ।" — (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ)

অর্থাৎ— জীবের অবিদ্যা কর্তৃক মিথ্যাভূত দেহসম্বন্ধ ; আর ভগবানের যোগমায়া কর্তৃক চিদানন্দঘন শ্রীমূর্তির প্রকাশ। বদ্ধজীবের ও ঈশ্বরের দেহে এই মহান পার্থক্য।

তাহা হইলে 'চিদচিৎ' অবিদ্যা-পাশবিমুক্ত জীবের স্বরূপ নহে; উহা মায়াপাশবদ্ধ জীবের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়া থাকে। অগ্নির যেমন স্ফুলিঙ্গ-শক্তি, সেইরূপ জীবের স্বরূপ চিৎকণ বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রুতি জীবশক্তিকে স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; যথা,—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥

—(মুণ্ডক, ২।১।১)

অর্থাৎ যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন এবং তাঁহাতে বিলীন হয়।

পরা বা চিৎশক্তি অগ্নির প্রভাস্থানীয়। শ্রীভগবৎস্বরূপের মতই সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া পরাশক্তির অপর নাম স্বরূপ-শক্তি। একই পরাশক্তি আবার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামক ত্রিবিধা বৃত্তির কথা শ্রুতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে;—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

[টীকা,— পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বুহ্যুষ্ণতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া— সংবিৎ-সন্ধিনী-হ্লাদিনী-রূপা ক্রমাদ্ বোধ্যা॥— কান্তি-মালা।] অর্থাৎ, — শ্রীভগবানের পরাশক্তি বিবিধা বলিয়া শ্রুত হয়। জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নামক শক্তি— তাঁহার স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপভূতা। অগ্নির স্বাভাবিকী উষ্ণতা-শক্তির ন্যায় শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নামক শক্তিত্রয়কেই যথাক্রমে সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপে জানিতে হইবে।

উক্ত হ্লাদিন্যাদি ত্রিবিধা স্বরূপশক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই

বর্ণিত হইয়াছে ;—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

—(বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯)

ধ্রুব বলিয়াছেন— হে ভগবন্! সকলের আশ্রয়রূপ তোমাতে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ— এই ত্রিবিধা-বৃত্তিরূপা একটি শক্তি বিদ্যমান আছে, সেই শক্তির সহিত তোমার ভেদ নাই। ত্রিগুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য হ্লাদকরী সত্ত্বগুণ, তাপকরী রজোগুণ বা মিশ্রা ত্রিগুণা মায়াশক্তি তোমাতে নাই।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে ;—

"সৎ চিদ্ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
এই চিৎ-শক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী আর সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

— (মধ্য ৬।১৫৮-১৫৯

এই পর্যন্ত শক্তিতত্ত্বের কথা বলা হইল। অতঃপর শক্তিমত্তত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া তদনন্তর শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীই যে পূর্ণতমা ভক্তির স্বরূপিণী, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সর্বশক্তিমান— নিখিল কার্য ও কারণের কারণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ; ("কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"— ভাঃ ১।৩।২৮) তিনি সমগ্র অগ্নিরাশি-স্থানীয়। শ্রীরাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্মাদি তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপ বা অবতারসকল অগ্নিরাশির বিশেষ বিশেষ শিখাস্থানীয়। অবতারসকল অংশ ; অবতারী যিনি, তিনিই অংশী। একই পরিপূর্ণ তত্ত্বের যেখানে পরিপূর্ণ প্রকাশ, সেখানে তিনি অবতারী বা স্বয়ং-ভগবান ; আর যেখানে আংশিক প্রকাশ, সেখানে অবতাররূপে উক্ত হয়েন। প্রতি কলায় বিবর্ধিত সুধাকরের দ্বিতীয়া, তৃতীয়াদি রূপ ও

নাম ভেদ সকল, যেমন একই পূর্ণচন্দ্রের আংশিক প্রকাশভেদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে ;— কিন্তু পূর্ণিমা যেমন সেই একই পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ,— তেমনি একই শ্রীভগবান বা পরতত্ত্বের আংশিক ও পরিপূর্ণ প্রকাশে সেইরূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে। অবতারী ও অবতার স্বরূপতঃ একই শক্তিমান -তত্ত্বের প্রকাশভেদ মাত্র ;—

পূর্তিঃ সার্ব্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি।
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তি-ব্যক্ত্যব্যক্তি-কৃতং ভবেৎ॥

— (প্রমেয় রত্নাবলী ১।২১)

অর্থাৎ, যদ্যপি সমস্ত অবতারে শ্রীভগবানের ভগবত্তার পূর্ণতা তুল্য, তথাপি তাঁহার শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশে তারতম্য হইয়া থাকে।

অগ্নিরাশি ও তাহার শিখাসকল যেমন একই অভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, সেইরূপ অবতারসকল অবতারীরই অভিন্ন স্বরূপ বা 'তদেকাত্ম' রূপ ; —

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥

— (লঘুভাঃ, ১।১৪)

অর্থাৎ, — শ্রীভগবানের যে-রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকারাদিতে অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাহাকেই তদেকাত্মরূপ কহে।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীরাম-নৃসিংহ-বামনাদি নিখিল অবতারই স্বয়ং-রূপ বা স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই 'তদেকাত্মরূপ'। অতএব প্রকাশভেদ থাকিলেও সকল প্রকাশই এক 'শক্তিমান' তত্ত্ব। অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিরাশির আংশিক প্রকাশ, কিন্তু প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম প্রভৃতির ন্যায় অগ্নির শক্তি নহে, তেমনি অবতারসকল একই শক্তিমান-তত্ত্বের অংশী ও অংশরূপ প্রকাশভেদ মাত্র। শাস্ত্র দৃষ্টান্তসহ তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন ; —

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥

—(শ্রীভাঃ ১।৩।২৬)

অর্থাৎ,— হে দ্বিজগণ। যেমন এক অক্ষয় হ্রদ হইতে বহু সহস্র নদী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সত্ত্বতনু শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশ রহিয়াছেন।

'হরি' শব্দে নিখিল ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল অবতারের অবতারী বা "স্বয়ং-ভগবান" বলিয়া তিনি আরও শ্রীভাগবতে (১০।৭২।১৪), "আদ্য হরিঃ" শব্দে কীর্তিত হইয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ, "আদ্যো হরিঃ — শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা" —অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আদ্য হরি— এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

অতএব অবতারী ও নিখিল অবতারসকল একই শক্তিমান-তত্ত্বের অংশী ও অংশরূপ প্রকাশভেদে অভিন্ন হইলেও ভগবত্তা প্রকাশের তারতম্যে 'স্বয়ং ভগবান' বা 'আদ্য হরি' শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বোৎ-কর্ষতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ষোড়শ কলায় প্রকাশমান একই পূর্ণচন্দ্রের যেমন পূর্ণিমা-প্রকাশে সর্বোৎকর্ষতার সহিত পরিপূর্ণ মাধুর্যাদির অভিব্যক্তি আছে, তদ্রূপ সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি আছে বলিয়া তাঁহাকেই "পূর্ণ শক্তিমান" এবং নিখিল শক্তিতত্ত্বের মধ্যে সকলের আদি ও সর্বোত্তমা বলিয়া শ্রীরাধিকাকেই "পূর্ণশক্তি" রূপে তাই চরিতামৃতকার বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান"

—(আদি, ৪।৯৬)

শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর পূর্ণশক্তিত্ব নিরূপণের জন্য অতঃপর সংক্ষেপে ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শক্তিবর্গের মধ্যে ভক্তিই

সর্বোত্তমা ও পূর্ণশক্তি শ্রীরাধিকাই ভক্তির সমূর্ত প্রকাশ।

শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত ত্রিবিধা শক্তির মধ্যে মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি অপেক্ষা তটস্থা বা জীবশক্তি শ্রেষ্ঠা ; আবার তটস্থা শক্তি হইতেও স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বথা শ্রেষ্ঠা ;— যাহার অপর নাম পরাশক্তি।

শ্রীভগবানের রূপ— চিদানন্দঘন। তাঁহার নিজ রূপের ন্যায় সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া, অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তিকে 'স্বরূপ শক্তি' বলে। একই বৈদূর্য মণি হইতে যেমন নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণ-প্রভা নির্গত হয়, সেইরূপ একই চিন্ময় স্বরূপ-শক্তি হইতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামক ত্রিবিধা চিচ্ছক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ-শক্তিই সর্বোত্তমা ; আবার স্বরূপশক্তির মধ্যে সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ ও সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠা। তাহা হইলে জানিতে হইবে শ্রীভগবানের সর্ব শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী হইতে শ্রেষ্ঠতরা শক্তি আর কিছুই নাই।

"তত্র সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিন্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি। তত্তৎ প্রাধান্যেন স্ফূর্তৈস্তত্তদ্রূপতা তস্য একস্য বৈদূর্য্যবদসীয়তে।"— (সিদ্ধান্তরত্নঃ ১।৪৩) অর্থাৎ,— সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই শক্তিত্রয় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠা জানিবে। 'আছেন' এইরূপ নিত্যসত্তাবিশিষ্ট ভগবান, যে নিজশক্তি দ্বারা সত্তা ধারণ করেন, এবং দ্রব্য, কর্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব— এই সকলে সত্তা অর্থাৎ কার্য সামর্থ্য প্রদান করেন, তাহাই সন্ধিনী শক্তি। ঐ সন্ধিনী শক্তি সর্ব দেশ-কালাদির ব্যাপ্তি-হেতু। ভগবান নিজে জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও যে নিজ শক্তিদ্বারা জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীবসকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন তাহারই নাম সম্বিৎশক্তি ; আর তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে নিজ শক্তিদ্বারা আনন্দিত ও জীব-

সকলকে স্ব-সামুখ্য প্রদান দ্বারা আনন্দিত করেন,— তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীভগবানের এক পরা নামক শক্তি পূর্বোক্ত ত্রিবিধারূপে প্রকাশ পাইয়া বৈদূর্য মণির ন্যায় সন্ধিন্যাদি ত্রিবিধ আকারে ভাসমান হয়েন।

শ্রীভগবান যে কেবল ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হয়েন একথা— সকল-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,— "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ তিনি ভক্তির বশ ;— "ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" অর্থাৎ তিনি ভক্তিযোগে অবস্থিত ; ইত্যাদি। শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,— "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" (৯।৪।৬৩)— অর্থাৎ আমি সর্ব বিষয়েই স্বাধীন হইয়াও ভক্তপরাধীন ; আমি সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র ; "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ',—(১১।১৪।২১ শ্রীভাঃ")— ইত্যাদি— শ্রীভগবানের নিজোক্তি। সেইজন্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় সিদ্ধান্তরত্নে (১।৩৯) লিখিয়াছেন ;—

"ভক্তৌ খলু ভগবান্ স্বয়মেব বশীভূয় তিষ্ঠতি তামরসকোষে মধুপ ইব রসিকযুবযুবত্যাং রসিকযুবেবেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ প্রতীয়তে।" অর্থাৎ,— ভক্তিতে শ্রীভগবান স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন। মধুপ যেমন মকরন্দলোভে তামরস-কোষে আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেমন রসিকা যুবতীতে প্রেমবদ্ধ হয়েন,— শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হয়েন। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই পাওয়া যায়।

অতএব শ্রীভগবান যখন ভক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন এবং একমাত্র ভক্তিই যখন ভগবানকে আনন্দিত ও বশীভূত করিয়া থাকেন, তখন ভক্তি যে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার বা বৃত্তিবিশেষ—একথা সহজে অনুমিত হইতেছে। আবার জ্ঞান ব্যতীত আনন্দেরও ধারণা করা অসম্ভব। যাহার জ্ঞান নাই, যাহা অচেতন বা জড় বস্তু, তাহাতে আনন্দ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে পারে না। আনন্দ চিৎ বা জ্ঞানবস্তুরই ধর্ম ; সুতরাং আনন্দের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ জানিতে হইবে।

জ্ঞান নিস্তরঙ্গ নদীস্থানীয় ; আর ভক্তি, তরঙ্গায়িত তটিনীর মত নৃত্য-শোভায় রমণীয়া। তরঙ্গায়িত জলরাশি যেমন নিস্তরঙ্গ জলরাশির ভাববিশেষ, আনন্দ ও জ্ঞানে সেইরূপ পার্থক্য। উভয় ভাবই নিত্য। অতএব হ্লাদিনীসারভূতা ভক্তি জ্ঞানসম্বন্ধশূন্যা নহে। ভক্তিকে জ্ঞান-বিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে। যথা ;—

"ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি।"— (সিদ্ধান্তরত্ন ১।৩২)

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তির অন্তর্গত যে আনন্দ,— কেবল তাহারই নাম যেমন হ্লাদিনী শক্তি, সেইরূপ তদন্তর্গত যে জ্ঞান, কেবল তাহাকেই সম্বিৎশক্তি বলিয়া জানিতে হইবে ; ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে 'ভক্তি' যখন সেই পরাশক্তির অন্তর্গত আনন্দ ও জ্ঞানের সারভূতা হইতেছেন, তখন ভক্তি অবশ্যই হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সার। শ্রীভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে, ভক্তিকে হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সার রূপেই নির্ণয় করিয়াছেন ;—

"ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি ; কিং প্রাকৃতসত্ত্ব-ময়জ্ঞানানন্দরূপা কিংবা ভগবজ্-জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈব-জ্ঞানা-নন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসার সমবেতসম্বিৎসাররূপেতি। নাদ্যঃ ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ।"

—(১।৩৮)

অর্থাৎ,— যে-ভক্তি শ্রীভগবানকেও বশীভূত করেন, তাঁহার স্বরূপটি কি ? উহা কি (১) প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপা, কিম্বা উহা (২) শ্রীভগ-বানের জ্ঞানানন্দ রূপা, অথবা উহা (৩) জীবের জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা উহা (৪) পরাশক্তির সাররূপা যে হ্লাদিনী শক্তি তাহার ও সমবেত সম্বিৎ শক্তির সার ? ভক্তি কখনই প্রাকৃত বা মায়িক জ্ঞানানন্দরূপিণী

নহেন ; যেহেতু ভগবানকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ভক্তির আছে— প্রাকৃত শক্তির সে সামর্থ্য নাই ; কেননা শ্রীভগবানের কখনও মায়ায় বশীভূত হইবার কথা শুনা যায় না। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে ; কেন না শ্রীভগবান ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন ; ভগবান পূর্ণ, সুতরাং স্বরূপানুবন্ধী জ্ঞানানন্দ হ্রাসবৃদ্ধির অসম্ভাবনা বশতঃ ইহাও অতিশয় অযুক্ত হইতেছে। তৃতীয়তঃ জীবের জ্ঞানানন্দও ভক্তি নহে, কেননা জীবের আনন্দ পরিচ্ছিন্ন ক্ষয়শীল ; আর ভক্তি নিত্যা ও বিপুলা ; সুতরাং জীবের জ্ঞানানন্দ কখনও বিপুলজ্ঞানানন্দস্বরূপা ও নিত্যা, 'ভক্তি' রূপে গণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য হইতেছে ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরাশক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি। শ্রীভগবান যখন ভক্তিদ্বারা আনন্দিত ও বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তি যে তাঁহার হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপিণী,— ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

প্রভাকরের প্রখর তেজোরাশি সুধাকরের সংস্পর্শ লাভ করিয়া যখন ধরণীতলে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা যেমন স্নিগ্ধজ্যোৎস্নারূপে পরিদৃষ্ট হইয়া প্রাণিগণের সন্তাপহরণ ও হর্ষবিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ সমবেত সম্বিৎশক্তিসার যখন হ্লাদিনী-শক্তির সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন তাহা হইতে সর্বসন্তাপহারিণী— পূর্ণানন্দদায়িনী —ভগবদ্বশীকারিণী— 'ভক্তি'রূপ জ্যোৎস্নার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। সেই ভক্তির এমনই প্রভাব যে, কেবল এই ভক্তি-চন্দ্রিকালোকেই শ্রীভগবৎ-কৈরবের প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিবার অধিকার ভক্তি ব্যতীত আর কাহারও নাই। এই অধিকার তিনি স্বেচ্ছায়— সাধ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা ভক্তিরাণীকেই প্রদান করিয়াছেন।

যে জ্ঞানদ্বারা জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদরূপে চিন্তা করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন,— নির্গুণ

ব্রহ্মানুভূতির উপায়স্বরূপ সেই জ্ঞান অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মানুভূতির উপায়স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ নামক যে জ্ঞানবিশেষ তাহাও প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতিকে সম্বিৎ-শক্তিরই অংশ-বিশেষ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা সমবেত সম্বিৎ শক্তির সার ; সম্বিৎসার হ্লাদিনীসারের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'ভক্তি' নামে কীর্তিত হয়েন। নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ জ্ঞান অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ, —ইঁহারা সম্বিৎ-শক্তির অংশ মাত্র ; অতএব সমবেত সম্বিৎ-শক্তির আশ্রিত। তাই পরম পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞান আদি সব যার পরিবার ॥"

—(আদি, ৪।৬৭)

[তাৎপর্য ঃ— যে জ্ঞান সমগ্র সম্বিৎ শক্তির সার, সেই জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ম্ভগবদ্‌বুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে ; আর যাহা অভেদ ব্রহ্ম-ভাবনা ও অন্তর্যামী প্রভৃতির অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান, তাহা উক্ত সমগ্র সম্বিৎসার-রূপ পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিবার ;— অর্থাৎ তদধীন বা তদংশ মাত্র।]

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, হ্লাদিনীসারের সহিত সম্মিলিত যে সমবেত সম্বিৎশক্তির সার,— তাহাই হইতেছে 'ভক্তি' ; আর কেবল সম্বিদংশ যাহা, —তাহাই 'জ্ঞান' ও 'যোগ' নামে, নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির ও পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপায়রূপে কথিত হইয়া থাকে। এই নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগাদি, ভক্তির সহিত মিশ্রিতা হইলে, ভক্তির শুদ্ধত্বের হানি হয় ; কিন্তু সমবেত সম্বিৎসাররূপ জ্ঞান যাহা,— তাহা ভক্তিরই উপাদান— এ-কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভক্তিই শ্রীভগবচ্ছক্তি মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। (নারদ-ভক্তিসূত্র।)

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তি প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায়

আদরিণী হইয়া থাকেন ; কিন্তু জ্ঞান— পরিত্যক্তা পত্নীর ন্যায় ভগবৎ-প্রসাদ-সৌভাগ্যহীন ; সুতরাং ভক্তির তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তি যে কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতরা—সে-কথা দেবর্ষিও স্পষ্টই বলিয়াছেন ; —"সা তু কর্ম্ম-জ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।" —(নারদ-ভক্তিসূত্র ২৫।)

দারুপাষাণাদি বিদারণক্ষম হইয়াও মকরন্দলোলুপ ভ্রমর যেমন স্বেচ্ছায়— সাধ করিয়া সুকোমল তামরস-কোষে আবদ্ধ হয় ; স্বরূপতঃ পুরুষ সেব্য ও স্ত্রী সেবিকা হইয়াও— তরুণ যুবক যেমন ইচ্ছা করিয়াই তরুণীর প্রেম-প্রভাবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে,— সেইরূপ সর্বাশ্রয় ও সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তৎশক্তিরূপিণী ও তদধীনা ভক্তিদেবীর নিকট স্বেচ্ছায়— সাধ করিয়াই বশীভূত হইয়া থাকেন।

ভক্তিবশ শ্রীভগবান কেবল যে ভক্তি দ্বারাই গ্রাহ্য ও অর্জিত হইয়া থাকেন, এ-কথা তিনি নিজমুখেই জগতে প্রচার করিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ,— হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক ভক্তিদ্বারা আমাকে যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন তপস্যা ও ত্যাগাদির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিলেই উক্ত শ্রীভগবদুক্তির মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

শ্রীভগবান যে ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন— সে কেবল ভক্তির বশীভূত বলিয়াই ; তাঁহার ভক্তবশ্যতা— ভক্তিবশ্যতারই পরিচায়ক। তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ 'ভক্তের ভগবান',— উহা 'ভক্তির ভগবানেরই' নামান্তর মাত্র। যিনি ভক্তির কৃপা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি ভক্তি-মকরন্দ হৃদয়-কমলে অবরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন,— ভক্তির

সহিত একীভূত হইয়া— ভক্তিময় হওয়ায়, তিনি ভক্ত। ভক্তির সম্বন্ধে শ্রীভগবানের ভক্তের সহিত সম্বন্ধ।

শ্রীভগবচ্ছক্তির নির্বিশেষ ও সবিশেষ ভেদে দুইটি ভাব আছে। নির্বিশেষ ভাব— নিরাকার বা অমূর্ত অবস্থা এবং সবিশেষ ভাব— সাকার বা সমূর্ত অবস্থা। এই বিষয়ে পরমপূজ্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন ;—

"তত্র তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যেকাত্ম্যেন স্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রী-রূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্।"—(ভগবৎসন্দর্ভ, ১১৭ অনুঃ।)

অর্থাৎ, কেবল শক্তিমাত্ররূপে, হ্লাদিনী প্রভৃতি শক্তি, ভগবদ্‌বিগ্রহের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থান করেন ; কিন্তু তদধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা মূর্তিমতী এবং শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপা। এই প্রকারে হ্লাদিনী প্রভৃতি শক্তিবর্গের সমূর্ত ও অমূর্তভেদে দুইরূপে অবস্থিতি জানিতে হইবে।

অমূর্ত ভক্তির সমূর্ত অবস্থা যাহা, —তাহারই নাম 'শ্রীরাধিকা'। শ্রীরাধারাণীই সাক্ষাৎ ঘনীভূতা মূর্তিমতী ভক্তি। এই পরিদৃশ্যমান, সাকার বা সমূর্ত জগৎ যেমন নিরাকার বা অমূর্তা ত্রিগুণা প্রকৃতিরই ঘনীভূত কার্যাবস্থা বিশেষ, সেইরূপ একই অমূর্ত ভক্তির যাহা পূর্ণতম সাকার বা সাবয়ব অবস্থা, শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি— শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীই সেই তত্ত্ব। একই তরলাবয়ব দুগ্ধ, ঘন হইলে যেমন ক্ষীর নামে কথিত হইয়া, ক্রমে উহা নিবিড়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাতেই যেমন ক্ষীর-পুত্তলিকা নির্মিত হয়, তেমনি একই তরলাবয়ব ভক্তি ঘন হইলে 'প্রেম' নামে কথিত হইয়া ক্রমশঃ ঘনতম হইলে, সেই প্রেমঘন মূর্তিই 'শ্রীরাধিকা' নামে কীর্তিত হয়েন। পূর্ণতম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমা আনন্দদায়িনী শক্তিই শ্রীরাধিকা। গোবিন্দ-মোহিনী শ্রীরাধারাণীই সমবেত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-সারের পূর্ণতম সবিগ্রহ ভাববিশেষ। শক্তিতত্ত্বের পূর্ণতম ভাব বা পরাবস্থার পূর্ণতম অভিব্যক্তির

অবসান এইখানে— এই শ্রীরাধাতত্ত্বেই জানিতে হইবে। তাই পরম পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"সৎ, চিৎ, আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি ॥"

— (মধ্য, ৮।১৫৩-১৫৪)

* * * *

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥"

—(মধ্য, ৮।১৫৬-১৬২)

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, ভক্তির যাহা সমূর্ত পরমাবস্থা— তাহাই শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধিকার যাহা অমূর্ত শক্তিরূপ অবস্থা,—তাহাই ভক্তি। এক শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই ভক্তি এবং ভক্তিই শ্রীভানুনন্দিনীরূপে

অভেদতত্ত্ব হইলেও, কারণ ও কার্যভেদে উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। মূর্তিমতী শ্রীরাধিকাই অমূর্ত ভক্তিব কারণ, ভক্তি— শ্রীরাধিকার কারণ নহেন। প্রাকৃত জগতে নিরাকার সূক্ষ্ম বস্তুকেই সাকার— সমূর্ত বস্তুর কারণরূপে দেখা যায়; যেমন এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম প্রকৃতির কার্য; অমূর্ত প্রকৃতিই সমূর্ত জগতের কারণ। ত্রিগুণময় প্রাকৃত জগতে নিরবয়ব পদার্থ সাবয়ব বা স্থূল পদার্থের কারণরূপে পরিদৃষ্ট হইলে, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় জগতে এই নিয়ম বিপরীত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে; অর্থাৎ সেখানে নিবিড়াবয়ব বা সাকার পদার্থই বিরলাবয়ব বা নিরাকার পদার্থের কারণ। তাহার হেতু এই যে, পূর্বাভিমুখী বিম্বের মুকুরস্থিত প্রতিবিম্ব যেমন পশ্চিমাভি-মুখী বা বিপরীত ভাবে সংস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অনেকাংশে প্রতিবিম্ব বা ছায়া সদৃশ প্রাকৃত জগতের কার্য-কারণ-রীতি,— বিম্ব বা কারণ-স্থানীয় চিন্ময় জগতের কার্য-কারণ-রীতির, বিপরীত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। তাই কার্যরূপে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ হইতে কারণরূপ সূক্ষ্ম— নিরাকার প্রকৃতি যেমন শ্রেষ্ঠা, সেইরূপ অপ্রাকৃত— চিন্ময়— স্বরূপ-শক্তির রাজ্যে কার্যরূপা— অমূর্তা ভক্তি অপেক্ষা, কারণ-রূপা সমূর্তা শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা; সুতরাং মূর্তিমতী পরমা ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই অমূর্ত ভক্তির কারণ বা আশ্রয়স্বরূপিনী হইতেছেন। সমূর্ত বা সাকার মৃগনাভি হইতে যেমন আকারহীন সৌরভ নির্গত হয়, কিন্তু সৌরভ হইতে মৃগমদের প্রকাশ হয় না— তেমনি সমূর্ত শ্রীরাধা-তত্ত্বই মূর্তিহীন ভক্তিতত্ত্বের মূল কারণ বা আশ্রয়। ভক্তি— শ্রীরাধিকার কারণ বা আশ্রয় নহে, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তবে বিশেষভাবে স্মরণীয় বিষয় এই যে, কারণরূপা প্রকৃতির কার্যরূপ এই সাকার জগৎ যেমন প্রকৃতির বিকার সুতরাং অনিত্য বা নশ্বর, স্বরূপশক্তির রাজ্যে— চিদানন্দ-বিলাসের দেশে ইহা সেরূপ নহে,— সেখানে কারণ ও কার্য উভয়ই নিত্য— অবিনশ্বর। কারণরূপা শ্রীরাধিকার ন্যায় তৎ-কার্যরূপা

ভক্তি,— শুধু ভক্তি কেন,— সেখানকার সকল পদার্থই অনাদি অবিকারী ও নিত্য। অনিত্য বলিয়া প্রকৃতির কার্যকে 'বিকার' শব্দে অভিহিত করা হয়; আর নিত্য বলিয়া চিচ্ছক্তির কার্য ও কারণসকল প্রায়শঃ 'বিলাস' বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন।

একই ভক্তি প্রধানতঃ সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি— এই ত্রিবিধাকারে অবস্থিত। এক বস্তু হইলেও সাধনরূপা ভক্তি হইতে ভাবরূপা ভক্তি ও ভাবভক্তি হইতে প্রেমরূপা ভক্তি যেমন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠভাবাপন্না,— তেমনি প্রেমভক্তি আবার ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব রূপে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া পরিশেষে মহাভাবরূপা পরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তির অভিব্যক্তির অবসান হইয়া থাকে। এই মহাভাবেরই ঘনীভূত সবিগ্রহ অবস্থা— মূর্তিমতী— ভক্তিদেবী শ্রীরাধারাণী। অতএব শ্রীরাধিকাই যেমন ভক্তির সকল অবস্থার সাররূপা, তেমনি ভক্তির সকল অবস্থার কারণ-স্বরূপিণীও তিনি।

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম, এক গোবিন্দ-মোহিনী— শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই সবিগ্রহ অবস্থায় শ্রীরাধিকারূপে ও অবিগ্রহ অবস্থায় ভক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণসুখবিধানের জন্য নিত্যই বিরাজমানা। প্রেমঘন-মূর্তি শ্রীভানুনন্দিনী কেবল যে মূর্তিমতী শ্রীরাধিকা ও অমূর্তা ভক্তিরূপেই বিরাজিতা তাহা নহে,— এক সর্বাংশী— সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবভেদে— অসংখ্য বিলাস ও স্বাংশাদি মূর্তিতে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ এক শ্রীরাধিকাই ভাবভেদে শ্রীকৃষ্ণাবতার-সকলের অসংখ্য প্রেয়সীরূপে নিত্যই নানাভাবে শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-বিধানে তৎপর রহিয়াছেন। শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীগণ সকলেই শ্রীরাধিকারই প্রকাশভেদ মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে,—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্ ॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥

—(বিঃ পুঃ, ১।৯।১৪২-১৪৫)

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পরিপূর্ণতা বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে ; — এইরূপে দেবশ্রেষ্ঠ জগৎস্বামী জনার্দন যেমন অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহার সহায়ভূতা লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ অবতীর্ণা হইয়া থাকেন। যখন শ্রীহরি অদিতিপুত্র বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মীদেবী পদ্ম হইতে আবির্ভূতা হয়েন। শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মী সীতা-রূপে, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণাবতারে লক্ষ্মী রুক্মিণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সমুদয় অবতারে বিষ্ণুর সহায়া ছিলেন। বিষ্ণু দেবদেহরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবদেহা, মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী মানুষী হইয়া থাকেন। বিষ্ণুর দেহানুরূপ লক্ষ্মীও শরীর ধারণ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীগণ সকলেই লক্ষ্মীরূপা। তন্মধ্যে সর্বপ্রধানা ও সকলের অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধিকাই মহালক্ষ্মী হইতেছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণতম ভগবান, বৃষভানুতনয়া শ্রীরাধিকাও তেমনি পূর্ণতমা লক্ষ্মী। শ্রীভগবানের সর্বশক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাধিকা বলিয়া শ্রীরাধিকাই সর্বলক্ষ্মীময়ী বলিয়া গৌতমীয়তন্ত্রে কীর্তিত হইয়াছেন।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

অর্থাৎ,— শ্রীরাধিকাই পূর্ণ পরাশক্তি। তিনিই দেবী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

পট্টমহিষী। তিনি কৃষ্ণময়ী পরদেবতা। তিনি সর্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেয়সী বা লক্ষ্মীগণের অংশিনী ও তাঁহাদিগের কান্তিস্বরূপিণী এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণানুরঞ্জিনী।

শ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় সিদ্ধান্তরত্ন (২।২৫) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;— "তদেবং মহালক্ষ্মীত্বাদেব শ্রীরাধয়াঃ পূর্ণত্বং নির্ব্বাধম্। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ খলু সর্ব্বা লক্ষ্ম্য এব, তন্মুখ্যত্বাৎ সা তু মহালক্ষ্মীরিতি সুশ্লিষ্টম্।"

অর্থাৎ— অতএব মহালক্ষ্মীত্বহেতু শ্রীরাধিকার পূর্ণত্বে কোন বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ সকলেই লক্ষ্মীরূপা ; তন্মধ্যে মুখ্যা বলিয়া শ্রীরাধিকা মহালক্ষ্মী হইতেছেন,— ইহাই সমীচীন মত।

লক্ষ্মীগণ ও শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ যে শ্রীরাধিকারই অংশ-বিশেষ, একথা শ্রুতিতে কীর্তিত হইয়াছে। অথর্বোপনিষদে পুরুষ-বোধিনী শ্রুতির পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে—

"গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্প-তরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি যস্যা অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকাশক্তিরিতি।"

অর্থাৎ মথুরামণ্ডলে— শ্রীগোকুলাখ্য-বৃন্দাবনমধ্যে কল্পতরুমূলে সহস্রদল পদ্ম মধ্যে— অষ্টদলকেশরে— শ্যামবর্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন। তিনি পীতাম্বরধারী, দ্বিভুজ, ময়ূরপুচ্ছকৃতশিরোভূষণ এবং হস্তে বেণু ও বেত্র ধারণ করিয়া আছেন। তিনি নির্গুণ (অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অতীত) এবং সগুণ (অর্থাৎ ভক্তবৎসল, লীলাময়, কৃপালু ইত্যাদি), তিনি নিরাকার (অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্তিরহিত) এবং সাকার (অর্থাৎ চিদানন্দঘন— মনুষ্যাকার), তিনি নিরীহ (অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশূন্য) এবং সচেষ্ট (অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় নিজ উল্লাসাত্মক নিত্য চেষ্টাযুক্ত),

তাঁহার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী ; বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিবৃন্দ শ্রীরাধিকারই অংশ। মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদুর্গা স্বয়ং শ্রীরাধিকাই। —(শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা)

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন নিখিল অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ অংশিনী শ্রীরাধা হইতে নিখিল ভগবৎ-প্রেয়সীগণের প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥ কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। লক্ষ্মীগণ এক নাম মহিষীগণ আর ॥ ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের প্রচার ॥ লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি। বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর তথি ॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর অংশ বিলাসাংশ রূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ বহু কান্তা বিনে নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥ গোবিন্দা-নন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ সর্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥

—(আদি, ৪।৬৮-৮২)

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, শ্রীভগবান যে ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন— তিনি কেবল ভক্তিবশ বলিয়াই ; আবার তিনি যে ভক্তিদ্বারা বশীভূত হয়েন— সে কেবল তিনি শ্রীরাধিকার বশীভূত বলিয়াই। শ্রীরাধিকাই ঘনীভূত ভক্তির সবিশেষ ও সাকার মূর্তি এবং

ভক্তিই শ্রীরাধিকার অমূর্ত প্রকাশ। ঘনীভূতা ভক্তির নামই প্রেম ; এবং মূর্তিমতী ঘনীভূতা প্রেমই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ। অতএব ভক্তি ও শ্রীরাধিকা একই তত্ত্বের সাকার ও নিরাকার প্রকাশভেদ মাত্র। প্রভেদ এই যে, শ্রীরাধা হইতেই ভক্তি, — ভক্তি হইতে শ্রীরাধা নহেন। শ্রীরাধারাণীই ভক্তির কারণ, ভক্তি শ্রীরাধারাণীর কারণ নহেন, কার্য। তবে অগ্নিপ্রভা ও অগ্নিতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ হইয়াও যেমন উভয়ে যুগপৎ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ ভক্তি ও শ্রীরাধিকায় কার্য-কারণ সম্বন্ধ হইয়াও উভয়েই নিত্যা। সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীভগবান যে একমাত্র ভক্তির বশ,— তাহার প্রকৃত অর্থ তিনি একমাত্র শ্রীরাধার বশ— এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এক অয়স্কান্ত বা চুম্বক ভিন্ন লৌহকে যেমন অপর কোন ধাতুই আকর্ষণ করতে পারে না, সেইরূপ একমাত্র শ্রীরাধাতত্ত্ব ব্যতীত শ্রীভগবানকে আকর্ষণ ও বশীকরণ করিতে অপর কিছুই নাই। কোনও লৌহখণ্ড কর্তৃক অপর লৌহকে আকৃষ্ট হইতে দেখিলে, যেমন সেই আকর্ষক লৌহ নিশ্চয়ই চুম্বকশক্তি বা চুম্বকত্ব সংক্রামিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হয়, তেমনি অসংখ্য ভক্ত কর্তৃক শ্রীভগবানকে যে আকৃষ্ট হইতে শুনা যায়, ভক্তগণের সেই ভগবদাকর্ষণী-শক্তি যে সঞ্চারিত রাধাশক্তিই— ইহা স্থিররূপে জানিয়া রাখা কর্তব্য। ভক্তের ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান যখন আকৃষ্ট ও বশীভূত হয়েন, এবং শ্রীরাধিকাই যখন সেই ভক্তির মূল উৎসস্বরূপিণী বা ঘনীভূতা মূর্তিমতী ভক্তি, তখন ভক্তের ভক্তি যে শ্রীরাধিকার ভাববিশেষ, একথা এখন সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। ভক্তি যেমন শ্রীরাধারাণীরই অমূর্ত ভাব, সেইরূপ শ্রীললিতাদি গোপাঙ্গনাগণ, শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, শ্রীসীতা প্রভৃতি ভগবৎ-প্রেয়সীগণ ও শ্রীলক্ষ্মীগণ সকলেই পূর্ণশক্তিস্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণবল্লভাপ্রধানা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরই সবিগ্রহ ভাববিশেষ ; সমস্তই এক রাধাতত্ত্বের বিলাস ও অংশাদিরূপ প্রকাশভেদ মাত্র। চুম্বকের অংশবিশেষ দ্বারা

অথবা চুম্বকাবিষ্ট শক্তিদ্বারা লৌহকে আকর্ষণ করা যাইলেও, যেমন এক পূর্ণ-চুম্বক সকল আকর্ষণের মুখ্যতম কারণ, তেমনি কি গোপীগণ, কি মহিষীগণ, কি লক্ষ্মীগণ, কি ভক্তগণ,—যেখানেই ভগবদাকর্ষণের নিদর্শন পাওয়া যাইবে, যেখানেই ভগবদ্বশীকরণ পরিলক্ষিত হইবে— জানিতে হইবে সেখানেই একমাত্র গোবিন্দমোহিনী— শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর জয় বিঘোষিত হইতেছে। একই অগ্নি যেমন নীল, পীত লোহিতাদি বর্ণের স্ফটিকাধারে সংরক্ষিত হইলে নীল, পীতাদি বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি একই রাধাতত্ত্বের অমূর্ত প্রকাশ বা ভক্তি, দাস্যাদি আধার বিশেষে সংস্থিত হইলে, তাহাই শান্ত দাস্যাদি বিবিধ ভাবে অভিব্যক্ত হয়েন। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ॥"

—(আদি, ৪'৫৯-৬০)

অতএব হ্লাদিনীসার— ভগবদাকর্ষণী ভক্তি যে মূলতঃ শ্রীরাধিকারই ভাববিশেষ—ইহাই আমাদের সর্বদা স্মরণীয়।

অতঃপর এতাদৃশী ভক্তি জীবের পক্ষে সুলভ কিম্বা দুর্লভ—ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভক্তি নির্গুণা ; সুতরাং অপ্রাকৃত— চিদানন্দ দেশের সামগ্রী। প্রাকৃত জগতের সহিত,— সগুণ বা মায়িক সংসারভূমির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে যে এই মায়িক জগতে ক্বচিৎ কোনও জীবকে ভক্তির অধিকারী হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ চিদানন্দময়ী ভক্তি— কৃপাবলে মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে ভক্ত-পরম্পরায় অর্থাৎ ভক্তরূপ প্রণালী বা আধারের মধ্য দিয়া এই মায়িক প্রপঞ্চেও নিত্য প্রবাহিতা হইতেছেন। মন্দাকিনী-

ধারার সংস্পর্শ পাইয়া, জীবের সংসারপাশ যেমন বিমুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্তহৃদয়স্থিত ভক্তিধারার পুণ্য স্পর্শ প্রাপ্ত হইলে জীব অমৃত-ময় হইতে পারেন।

"এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি
তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি।" —সিদ্ধান্তরত্ন (১।৫৪)

অর্থাৎ,—এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থিত নিত্যপরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন ভক্তবর্গে মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় আগমন করেন।

অতএব ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু হইলেও, ভক্ত-হৃদয়-ভূমি আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত জগতেও সর্বকাল অবস্থান করিতেছেন। ভক্তি-কৃপাধারা ভক্তরূপ উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে উহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীচরিতামৃতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, — "মহৎকৃপা বিনে কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়" — (মধ্য, ২২।৫১)— ইত্যাদি। এস্থলে ইহাই জানিতে হইবে যে ভক্ত, ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায়, ভক্তি-কৃপাকেই ভক্ত-কৃপা বা মহৎকৃপা নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহা কখনও স্পর্শমণিতে পরিণত হয় না; কিন্তু ভক্তি-স্পর্শমণির এমনই অচিন্ত্যনীয় প্রভাব যে, ভক্তিদেবীর কৃপাকণা কাহাকেও স্পর্শ করিলে সেই জীবকে আত্মস্বরূপতা প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্তিরূপে পরিণত বা তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত যে জীব,— তাহারই নাম 'ভক্ত'; সুতরাং ভক্তকৃপার অর্থ যে ভক্তিরই কৃপা, এবং শ্রীরাধিকাই যখন সাক্ষাৎ ঘনীভূতা মূর্তিমতী ভক্তি বা ভক্তির মূল কারণ-স্বরূপিণী হইতেছেন, তখন আবার সেই ভক্তির কৃপা যে মূলতঃ শ্রীরাধারাণীরই কৃপা,— ইহা সর্বতোভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমরা অতঃপর যে যে স্থানে ভক্তের কৃপার কথা উল্লেখ করিব, তাহাকে যেমন ভক্তিকৃপা বলিয়া জানা আবশ্যক, সেইরূপই যেখানেই ভক্তির কথা উল্লেখ

থাকিবে, তাহাকে শ্রীরাধিকারই ভাববিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবান যেমন প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট, তেমনি ভক্তিদেবী একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম শক্তিমান এবং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি বা ভক্তির পরিপূর্ণ অবস্থা। রাজা সর্ব বিষয়ে স্বাধীন হইয়াও প্রিয়তমা রাণীর প্রেমাধীনতা বশতঃ যেমন তাঁহাকেও স্বীয় ক্ষমতা পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তির অধীন শ্রীভগবান ("ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" —শ্রুতিঃ।) স্বীয় ক্ষমতা ভক্তি-দেবীকে প্রদান করায়, ভক্তি ভগবানের অপেক্ষা না করিয়াও, স্বাধীনভাবে জীবকে কৃপা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। ভক্তরূপ উৎস হইতেই ভগবৎকৃপা বা ভক্তিকৃপা জীবের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপা অথবা ভক্তকৃপারূপ ভক্তিকৃপা ব্যতীত জীবের পক্ষে ভক্তিকে লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্তৃক তদীয় ভক্তি-সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥"

অর্থাৎ, কেবল ভক্তকৃপা বা শ্রীভগবৎকৃপাকণাই ভক্তিলাভের মূল কারণ।

শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় লিখিয়াছেন,— "এতচ্চ কৃষ্ণতদ্ভক্তকৃপয়ৈকলভ্যম্"— শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্-ভক্তের কৃপা হইতেই ইহা লভ্য হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের কৃপালেশ প্রাপ্ত হইলে, অথবা ভক্তিরাণী স্বেচ্ছায় কাহাকেও কৃপা করিলে তখন সেই জীবে, প্রথমে সাধনময়ী রূপে, পরে ভাবময়ী রূপে ও তদনন্তর প্রীতিময়ী রূপে ক্রমশঃ ভক্তি উদিত হইয়া থাকেন। একই নির্গুণা ভক্তির উক্ত অবস্থাত্রয়ের নামই যথাক্রমে 'সাধনভক্তি', 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি'। একই কমল যেমন ক্রমশঃ পূর্ণস্ফুট ও অর্দ্ধস্ফুট হইবার পূর্বে, প্রথমে সৌরভ, সৌন্দর্য ও মধুহীন মুকুলিত ভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিদানন্দময়ী ভক্তি,

জীব-হৃদয়ে ক্রমশঃ অর্দ্ধস্ফুট কমলরূপ ভাবভক্তি ও পূর্ণস্ফুট কমলরূপ প্রেমভক্তির আকারে বিকশিত হইবার পূর্বে, মুকুলিত কমল সদৃশ সাধনভক্তিরূপে সপ্রকাশ হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুকূল অনুশীলনকে সাধন-ভক্তি কহে। ভক্তির এই নববিধ অঙ্গ আবার বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি উপাঙ্গে বিভক্ত হইয়া "সাধনাঙ্গ" নামে কীর্তিত হয়েন। এই সাধন ভক্তি, কর্মের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইলেও, বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে— ইহা সগুণ কর্মের ন্যায় প্রাকৃত চেষ্টা নহে। অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীই স্বেচ্ছায় জীবের মহাভাগ্যোদয়ের জন্য কর্মের আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন— ইহাই জানিতে হইবে।

কোটি জ্ঞান, যোগ, কর্ম ও তপঃক্লেশ দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই শ্রীভগবৎসেবা-সুখ যাঁহার কৃপালেশ হইতেই উদিত হইয়া থাকে, নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল দেবতা ঋষি, প্রজাপতি, রুদ্র ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণের অধীশ্বর হইয়াও শ্রীভগবান নিত্য যাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন— শ্রীভগবৎ-পট্টমহিষীস্বরূপিণী ভক্তিদেবী জীবের পক্ষে কখনও সুলভ হইতে পারেন না। যেমন কোন রাজ-চক্রবর্তীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার পরক্ষণ হইতে রাজপুত্র সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে ; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর এই মহতী কৃপা সেই রাজকুমারের নিকট অত্যন্ত সহজলভ্য বিষয় বলিয়া মনে হইলেও অন্যের পক্ষে যেমন সেই রাজ্যশ্রীপ্রাপ্তি একান্ত দুর্লভ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সেইরূপ কোনও অতিভাগ্য বশতঃ ভক্তকৃপারূপে ভক্তিকৃপা যাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজলভ্য সামগ্রীর মত বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা যে অত্যন্ত সুদুর্লভ সম্পদ,— ভক্তির স্বরূপটি চিন্তা করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, 'ভক্তিকে' 'সুদুর্লভা' আখ্যাই প্রদান করা

হইয়াছে ; যথা,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।"— ইত্যাদি

—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

—(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

অর্থাৎ, হে মহামুনে! যাঁহারা মুক্তি ও সালোক্যাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এতাদৃশ কোটিজনের মধ্যে একজন হরিভক্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা ব্যক্তি অতি দুর্লভ।

অতএব ভক্তি যে জীবের পক্ষে অতি সুদুর্লভ বস্তু, ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে। বিশেষতঃ ভক্তি যখন শ্রীরাধিকারই অমূর্ত ভাববিশেষ, তখন ভক্তি যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা, সে-কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। কথায় বলে "রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়",— শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী— শ্রীব্রজরাজকুমারের আদরিণী ও জীবনধারণ-মহৌষধ-স্বরূপিণী— শ্রীরাধারাণী নিজের ইচ্ছায় যখন যাহা কিছু করিবেন, তাহার উপর কথা কহিবার কেহই নাই। রাজ্য রাজার আইনে চলে, কিন্তু রাজরাণী সকল আইনের উপর। সেইরূপ নিখিল বিশ্বের সমস্ত আইন কানুন যাঁহার অধীন,— সেই বিশ্বরাজাধিরাজ শ্রীভগবান আবার নিয়ত যাঁহার প্রেমাধীন— তাঁহাকে কোন আইনের নির্দেশ মানিয়া চলিবার প্রত্যাশা করা যে একান্তই অসঙ্গত,—এ-কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। অতএব শ্রীরাধাস্বরূপিণী— ভক্তিমহারাণী কোন আইন কানুনাদির বাধ্য নহেন। জ্ঞান, যোগ ও কর্মাদি অপরাপর সাধনকে ভক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয় ; কিন্তু ভক্তি কোনও সাধনার অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই কৃপা করিতে পারেন। ভক্তির এই স্বতন্ত্রতার সম্বন্ধে, ভক্তি-

শাস্ত্রের সার চয়ন করিয়া, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার আমাদিগকে দুইটি ছত্রে জানাইয়া দিয়াছেন,—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সর্ব্ব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ —(মধ্য, ২৪।৮৭)

অপর কোন সাধনাদির কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া— সর্বদা স্বাধীনভাবে বা স্বরূপেই সিদ্ধ হয়েন বলিয়া, ভক্তির অপর একটি নাম "স্বরূপসিদ্ধা"। রাজনন্দিনী— রাজঘরণী— কৃষ্ণসোহাগিনী ভক্তিরাণী খামখেয়ালী মেয়ের মত, নিজ খেয়ালে, কখন কাহাতে কি ভাবে প্রকাশিত হয়েন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ভক্তিকৃপার কোনও পাত্রাপাত্র, কালাকাল, স্থানাস্থান বা এক কথায় কোনও কারণের অপেক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু জ্ঞান ও যোগাদির অস্বতন্ত্রতার বা ভক্তির অধীনতা নিবন্ধন এরূপ সার্বজনীনতা নাই।

ভক্তির অধিকার যে কেবল মনুষ্য জাতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, এরূপ নিয়মের বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া, দেবতা গন্ধর্ব, কিন্নর যক্ষ, অপ্সর, নাগ, পশু, পক্ষী— এক কথায় স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সর্ব জীব সর্ব জাতিতেই ভক্তিদেবী নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজ স্বতন্ত্রতার মহিমা প্রদর্শন করাইয়াছেন। আবার বয়োবৃদ্ধ ভীষ্মের ন্যায় প্রাচীন কেহ ভক্তি-কৃপা পাইয়াছেন বলিয়া, কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত প্রাচীনেরাই যে তাঁহাকে লাভ করিবে— এরূপ নিয়মের বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া শিশু ধ্রুবের ন্যায় নবীন কোনও জীবহৃদয়েও ভক্তি উদিত হইয়া নিজ স্বতন্ত্রতার মহিমা প্রদর্শন করাইয়াছেন। আবার বৃদ্ধে ও শিশুতে,— প্রবীণে ও নবীনে উদয় হইয়াছেন বলিয়া, সকল প্রবীণে ও নবীনে— সকল বৃদ্ধে ও শিশুতেই যে ভক্তিকৃপা স্পর্শিত হইবে, এমন কোনও নিয়মেরও তিনি বাধ্য নহেন। যুধিষ্ঠির ভীমাদির ন্যায় পুরুষেরা ভক্তিকৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, কেবল পুরুষেরাই যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে, এরূপ নিয়মের বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া ভক্তিদেবী কুন্তী, দ্রৌপদী, মীরাবাঈ

প্রভৃতি স্ত্রীজাতিতে প্রকাশিত হইয়া, নিজ স্বতন্ত্রতার প্রভাব প্রদর্শন করাইতেছেন। আবার পুরুষে ও স্ত্রীতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া সকল পুরুষে ও সকল স্ত্রীতেই ভক্তিকৃপা বর্ষিত হইবে এমন কোন নিয়মেরও তিনি বাধ্য নহেন। ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় ভৃগু-ভরদ্বাজাদি ব্রাহ্মণকুলের কাহারও ভিতর আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া, কেবল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ-বর্ণই যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে,— এতাদৃশ নিয়মের বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া তিনি গুহকাদি চণ্ডাল কুলেও উদিত হইয়া সতত নিজ স্বাধীনতার প্রভাব প্রদর্শন করাইতেছেন। আবার ব্রাহ্মণে ও শ্বপচে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়া, সকল ব্রাহ্মণ ও সকল চণ্ডালই যে ভক্তিকৃপা প্রাপ্ত হইবে, এমন কোনও নিয়মেরও তিনি বাধ্য নহেন।

ভক্তিরাণী এইরূপ স্বেচ্ছায়— স্বাধীনভাবে কখনও ব্রহ্মার ন্যায় দেবতায়, কখনও চিত্রকেতুর ন্যায় গন্ধর্বে, কখনও শুক-নারদাদির ন্যায় ঋষিতে, কখন উদ্ধবাদির ন্যায় মনুষ্যে, কখনও বিভীষণাদির ন্যায় রাক্ষসে, কখন অঙ্গদাদির ন্যায় বানরে, কখন প্রহ্লাদের ন্যায় বালকে, কখন অম্বরীষাদির ন্যায় রাজন্যে, কখন কখনও সুদামার মত দরিদ্রে, কখন শবরী ও ধর্মব্যাধের ন্যায় কিরাতে, কখন গরুড়াদির ন্যায় বিহঙ্গে, কখন কালীয়াদির ন্যায় সর্পে, কখন যমলার্জুনের ন্যায় বৃক্ষে, কখন অহল্যাদির ন্যায় পাষাণে প্রকাশিত হইয়া নিজ অহৈতুকী কৃপা-খেয়ালের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতেছেন। স্ত্রী-পুরুষে, বালকে-বৃদ্ধে, পণ্ডিতে-মূর্খে, বিপ্রে-চণ্ডালে, স্থাবরে-জঙ্গমে, দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে কখন, কোথায়, কিভাবে, কাহাতে, ভক্তিদেবীর অভ্যুদয় ঘটে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। "লটারীর" খেলার মত ভক্তিকৃপা ভক্তকৃপা রূপে কখন কাহাকে বাদ দিয়া, কাহার ভাগ্যে উদয় হয়েন, তাহা বলিবার বা বুঝিবার কোন উপায় নাই। স্বাধীনা ভক্তি নিজ খেয়ালের বশে, কুল, শীল, বয়স, বর্ণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া, ভগবৎসেবোপযোগী নিজের স্বরূপতা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই

প্রদান করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তং সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥"

— (পদ্যাবলী - শ্লোক ৮)

তাৎপর্য,— যদি বল সদাচার থাকিলেই ভক্তিকে লাভ করা যায়,— তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু ধর্মব্যাধের কি সদাচার ছিল ? বয়সের দ্বারা ভক্তিকে পাওয়া যায়,— এ কথাও বলা যায় না, কেন-না ধ্রুবের কি-ই বা বয়স হইয়াছিল ? বিদ্যা দ্বারাও নহে ; তাহা হইলে গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল ? রূপের দ্বারা ভক্তিকে পাওয়া যায়, তাহাও বলা যায় না ; কেন-না কুব্জার কি-ই বা রূপ ছিল ? ধনের দ্বারা ভক্তি লভ্য হইলে, দরিদ্র সুদামা বিপ্র ভক্তিকে পাইলেন কিরূপে ? উচ্চকুলে জন্মলাভ দ্বারা ভক্তিকে পাওয়া যায় ইহাও বলা সঙ্গত নহে ; যেহেতু বিদুরের কি বংশগৌরব ছিল ? পৌরুষের দ্বারা ? তাহাও নহে,— তাহা হইলে যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল ? সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বাধীনা ভক্তিদেবী কোনও গুণাগুণের বা কারণাকারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজ খেয়ালের বশে যখন যাহার অন্তরে উদিত হয়েন, ভক্তিসহ তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত সেই জীব কেবল ভক্তিসম্বন্ধবশতঃ শ্রীভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন। ভগবদাদরিণী ভক্তিরাণীর খামখেয়ালের যথেষ্ট পরিচয় শ্লোকার্থে অবগত হওয়া গেল।

জীবের যাহা একান্ত প্রয়োজন,— ব্যাধির ঔষধ, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল,— এমন কি নিশ্বাসের বায়ু অপেক্ষাও যাহা জীবাত্মার পক্ষে অত্যধিক আবশ্যকীয় বিষয়, সেই ভক্তিলাভের পথে এত দুর্লভতা ও অনিশ্চয়তার অবরোধ,— ইহার প্রতিকার-পরায়ণ না হইলে শ্রীভগবানের 'অগতির-গতি' নামের সার্থকতা থাকে না। জীব

তাঁহার 'তটস্থা' নামক নিজ শক্তিবিশেষ ; সুতরাং তাঁহার একান্ত পর নহে। পূর্ণতমা ভক্তিদেবী বা শ্রীভানুনন্দিনী তাঁহার প্রিয়তমা পট্টমহিষী হইলেও, অনন্তকোটি জীবের ভক্তিপ্রাপ্তিরূপ জীবন-মরণ সমস্যা, শুধু একটি খেয়ালী কিশোরী মেয়ের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে,— দুর্লভ স্বাতী-জল হইতে শুক্তির বুকে মুক্তার প্রাদুর্ভাবের মত, সুদুর্লভ মহৎ-কৃপা-স্পর্শ হইতে ক্বচিৎ কোন অতি ভাগ্যবান জীবের অন্তরে ভক্তি-মকরন্দের সঞ্চার হইবে,— যিনি সর্বজগতের নাথ, সর্বজীবের বন্ধু, পতি ও পরিত্রাতা,— সেই শ্রীভগবান কখন এরূপ ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত ও নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। তাই তাঁহার অন্তরের একান্ত অভিলাষ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় ভক্তিধারার— প্রতিকল্পে একবার অজস্র বর্ষণে, স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সমস্ত জীবজগৎ প্লাবিত হইয়া যায়, এবং সেই যুগের ভাবী জীবগণের জন্যও "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল" স্বরূপ দুর্লভ মহৎকৃপারূপ ভক্তিবীজ জগতে পরিপূর্ণরূপে সঞ্চার করিয়া রাখেন, যাহার প্রাপ্তি সর্বজীবের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়।

আবেগভরা প্রাণের এই অদম্য অভিলাষ লইয়া, সেই জীবের জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ— পূর্ণতম ভগবান যেদিন এই ধরাধামে প্রকট হয়েন, সুদীর্ঘ কল্পকাল মধ্যে সেই দিন জীব-জগতের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সুদিন হইলেও—উহা যথেচ্ছভাবে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া,—এই দানকার্যে ভক্তেরই অধিকার ভাবিয়া, তৎকালে আবার নিরস্ত হয়েন ; ("কভু না দেয় প্রেম রাখে লুকাইয়া।" — শ্রীচৈঃ চঃ আদি, ৮।১৮)। স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম ভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত ; তাঁহাতে ভক্তভাবের স্থান নাই ; যেহেতু তিনি সর্বাধীশ সর্বনিয়ন্তা— "সকলের প্রভু" ("একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য",—শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৫।১৪২)। সুতরাং কেবল পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপে থাকিয়াই, যথেচ্ছ প্রেমভক্তি প্রদান করিতে যাইলে, ভক্তের— মূলতঃ শ্রীরাধিকার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়।

প্রেমাধীন তিনি— ভক্তবৎসল তিনি, তাই স্বেচ্ছায় সাধ করিয়াই এই অধিকার নিজ প্রিয়তমা কান্তা শ্রীরাধাকে নিজেই অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। কেবল ভগবদ্ভাবে উহা অবাধে প্রদান করিবার পক্ষে এই বাধা উপস্থিত হইলেও, যদি শ্রীভগবান স্বয়ংই ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া, নিজ ইচ্ছামত প্রেমভক্তি দান ও তৎকারণ সঞ্চার করেন, তাহা হইলে উক্ত উভয় সমস্যারই এক কালে সমাধান হয় ভাবিয়া, পূর্ণতম ভগবান শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরই সর্বভক্তস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্য স্বীকার পূর্বক, তদীয় ভাবে বিভাবিত ও কান্তিদ্বারা বিমণ্ডিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে জগতে প্রকট হইয়া তৎকালে সুদুর্লভ প্রেমভক্তি বিপুলভাবে বিতরণ ও ভাবী জীবগণের জন্য তাহার কারণ বা বীজ পূর্ণরূপে পৃথিবীতে সঞ্চার করিয়া থাকেন ; তাই—

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৬।১০৭)

এখন যে-কোন ভক্তিভাব যে-কোন জীবকে যথেচ্ছ বিলাইবার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ বাধাহীন,— এখন প্রেমভক্তি দানে তিনি অন্য কোনও ভক্তের সম্পূর্ণ অপেক্ষা রহিত। তাই এখন—

মাগে বা না মাগে কেহো পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাই জানে দিব মাত্র॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৯।২৯)

একমাত্র শ্রীগৌরপ্রকটকালেই সুদুর্লভ প্রেমভক্তি প্রতি কল্পে একবার করিয়া সর্বজীবের পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। বর্তমান কলি-যুগই সেই মহাসৌভাগ্য লাভে বরেণ্য ও কৃতার্থ !

খণ্ডিত মেঘবিশেষ হইতে ক্বচিৎ স্থানবিশেষে বারিধারা বর্ষিত হইলেও, জগতকে প্রতি বর্ষে একবার সম্যকরূপে অভিষিক্ত করিবার পক্ষে যেমন বর্ষা ঋতুর সমাগমেই সহজ ও সম্ভবপর হয়, তেমনি ভক্তরূপ

মেঘবিশেষে কখন কোন ব্যক্তিবিশেষে ভক্তিধারা বর্ষিত হইলেও, প্রতি কল্পে একবার— একযোগে এক ব্রহ্মাণ্ডগত সর্বজীবকে প্রেমভক্তি-ধারায় পূর্ণরূপে অভিষিক্ত করিবার শ্রেষ্ঠতম সুযোগ, বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরান্তর্গত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়, জীবের ভাগ্যাকাশে এক অখণ্ড স্থির দামিনীমণ্ডিত গৌর-জলধরের উদয় হইতেই সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে।

(১) বসুন্ধরাকে সরস ও সিক্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমুদ্রই প্রধান কারণ হইলেও, যেমন কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত না হইয়া, সমুদ্রের পক্ষে পৃথিবী সেচন কার্য সম্ভব হয় না, সেইরূপ জীব-জগতে পরিপূর্ণ-রূপে প্রেমভক্তিধারা বর্ষণের পক্ষে, একমাত্র পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-জলধিই পরম কারণ হইলেও, কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত না হইয়া অর্থাৎ কেবল নিজ পূর্ণতম ভগবদ্‌ভাব লইয়াই তৎকালে তাহা সম্ভব হয় না।

(২) সিন্ধু যেমন নিজ বাষ্পভাব-বহুল বারিদাকারে (মেঘরূপে) ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়াই সর্বজগতে বারিধারা বর্ষণ করিবার উপযোগী হয়, সেইরূপ শ্যাম-সিন্ধু, নিজ বাষ্পময়ী— প্রেমাশ্রুময়ী শ্রীরাধিকার ভাববহুল গৌর-বারিদাকারে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়াই জীব-জগতের উপর পরিপূর্ণরূপে প্রেমধারা বর্ষণ করিবার উপযোগী হয়েন।

(৩) নিজভাবে অবস্থানকালে সিন্ধুর নিকট হইতে অমৃতলাভের পরিবর্তে লবণাক্ত ক্ষার দ্রবাই অধিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও আবার সেই সিন্ধুই বারিদরূপে যেমন অজস্র ধারায় মধুর বারি দান করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্যাম-সিন্ধু হইতে তৎকালে লবণাক্ত মুক্তি প্রভৃতি সহজলভ্য ও প্রেমামৃত দুর্লভ হইলেও, ("মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং"—শ্রীভাঃ, ৫।৬।১৮) প্রেমভক্তিরূপ জীব-চাতকের পরমাস্বাদ্য পানীয় যাহা, তাহা কেবল গৌর-বারিদের উদয়ে ও তদানুগত্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৪) জলধর জলধিরই ভাবান্তর ও রূপান্তর হইলেও যেমন জলধরেই বাষ্পভাব ও বিজলীপ্রভা বহুলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই শ্রীগৌর-জলধরে বাষ্পময়ী— প্রেমাশ্রুময়ী ও সর্বভক্তশিরোমণি শ্রীরাধিকার ভাব ও বিদ্যুদ্বর্ণা শ্রীরাধিকার কান্তি একীভূত হইয়া তাহারই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। ("গৌরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া গৌরাঙ্গী সরস ভেল।")। সৌদামিনীর স্ফুরণে যেমন জলধরের শ্যামলিমা অত্যুজ্জ্বল তড়িতালোকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ তড়িদ্বর্ণা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীশ্যামল-সিন্ধু, শ্রীগৌর-বারিদরূপে জীবের ভাগ্য-গগনে উদয় হইলেও, কান্তার ভাবাধিক্য বশতঃ সৌদামিনী হইতেও সুন্দর শ্রীরাধিকার কান্তি দ্বারা বিমণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়ায়, নিজ শ্যামল বারিদবর্ণ ভিতরে ও কান্তার তড়িৎকান্তি বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া, শ্রীশ্যামসুন্দর কোনও এক স্থির-দামিনী-মণ্ডিত মেঘমালা হইতেও মনোরম— শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মহাভাগবত শ্রীল রায় রামানন্দের দর্শনেও ইহাই প্রতিভাত হইয়াছিল,—

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ৮।২৬৮)

(৫) জলধি যেমন স্বীয় বাষ্পশক্তি-বহুল জলধররূপে ভাবান্তরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-জলধি, প্রতি কল্পে একবার মাত্র যখন নিজ হ্লাদিনীশক্তি-বহুল— সর্বভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি ধারণ করেন, তখনই শ্রীগৌর-জলধরের আবির্ভাব ঘটে। জলধি ও জলধর অভিন্নস্বরূপ হইলেও, যেমন জলধর জলধিরই সূক্ষ্মতম ভাব, তেমনি এক ও অভিন্ন-স্বরূপ হইলেও শ্রীগৌর-জলধর শ্রীশ্যাম-জলধিরই সূক্ষ্ম বা নিগূঢ়তম ভাববিশেষ।

(৬) আবার এক হইয়াও জলধি ও জলধর যেমন পৃথকভাবে সমকালেই অবস্থিত হয়, তেমনি অভিন্ন-স্বরূপ হইয়াও শ্রীশ্যামসুন্দরভাবে

ও শ্রীগৌরসুন্দরভাবে স্বয়ম্ভগবান সমকালে ও সর্বকালে লীলাপরায়ণ হয়েন। সূর্য মহাকাশে নিরন্তর উদীয়মান ও প্রভাবান থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে তাহার উদয় ও অস্তরূপ পরিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলা ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টির ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান হইয়াও, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট ও অপ্রকট রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

যিনি পূর্ণশক্তিমানরূপে তদীয় পূর্ণশক্তি হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়া নিজ অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা পূর্ণতম লীলায় শ্রীব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণ ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধিকারূপ দেহভেদ প্রকাশ পূর্বক, আবার নিজ রসবিশেষ আস্বাদনের সহিত, জীব-জগতে অবাধে— অজস্রধারায় প্রেমামৃতরূপ পূর্ণতম পুরুষার্থ বর্ষণ করিতে, উভয়ে একতাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীশচীনন্দন—গৌরহরিরূপে জীবের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হয়েন, — সেই পূর্ণতম ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অনুগত ও ভাব-কান্তি-বিভূষিত পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

[শ্রীচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কৃত শ্লোক— ১।১।৫]

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর। (মাসিক পত্রিকা।)
কার্ত্তিক— চৈত্র, ১৩৪১ সাল। ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
হইতে ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত।

——

শ্রীভগবন্নামের ফল

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

—(শিক্ষাষ্টক- ১ম শ্লোক।)

শাস্ত্রবাক্য ও তদনুগত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া যদি শ্রীভগবানের অপার ও অচিন্ত্য শক্তিশালী নামের ফল সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ অবগত হইতে ইচ্ছা করি,— তবে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, সাধারণতঃ 'নাম' বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাকে প্রথমতঃ দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা,—

(১) নামাভাস ও (২) নাম।

এখন নামাভাস বলিতে যাহা বুঝিব, তাহাই প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীভগবানের নাম বলিতে, শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার নিখিল অবতার-সম্বন্ধীয় যে-কোনও নামকেই বুঝায়; যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ', 'নারায়ণ', 'রাম', 'নৃসিংহ', 'বামন', 'হরি', 'মধুসূদন', 'সঙ্কর্ষণ', 'জগন্নাথ', 'বিষ্ণু' প্রভৃতি। যখন শ্রীভগবানের এই সমস্ত নাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য না করিয়া, অন্য কাহারও নামরূপে ব্যবহার করা হয়, তখন তাহা 'নাম'-রূপে গণ্য না হইয়া 'নামাভাস'-রূপেই গণ্য হইয়া থাকে; যেমন কাহারও পুত্রের নাম 'গোবিন্দ' ভ্রাতার নাম 'রাম', ভৃত্যের নাম 'হরি', গ্রামের নাম 'রামকৃষ্ণপুর' ইত্যাদি। অপর ব্যক্তি বা বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ ভাবে যে ভগবানের নামোচ্চারণ,— ইহাই 'নামাভাস'। অজামিল তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন

'নারায়ণ'। তিনি নিজ পুত্রকে যে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতেন, বুঝিতে হইবে তাহা নামাভাসই হইত, নাম হইত না। কিন্তু শ্রীভগবানের নামের এমনই অচিন্ত্য মহিমা যে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নহে— অপর ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম গৃহীত হইলেও অর্থে সম্পূর্ণ অমিল থাকা সত্ত্বেও, কেবল শব্দে মিল আছে বলিয়া, এরূপ নামাভাসেও জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে,—

"যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৩।৫৪)

পরে সে-কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে। নামাভাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শাস্ত্র-বর্ণিত শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩২৩)

অর্থাৎ,— পৃথিবীতে যদি কোনও লোকের 'গোবিন্দ' এই নাম থাকে, তাঁহাকেও আহ্বান করিলে (এইরূপ নামাভাস প্রভাবেও) সেই আহ্বানকারীর পাপরাশি সহস্র প্রকারে অপসৃত হইয়া যায়। নামাভাস ঘটিলেও যাঁহার নামের অব্যর্থ শক্তি প্রতিহত না হইয়া অশেষ মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার 'নাম' গৃহীত হইলে যে তদপেক্ষা অধিক শক্তি প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপগোস্বামী তদীয় স্তবমালা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

জীয়ান্নাম মুরারেঃ প্রেমমকরন্দস্য নব্যমরবিন্দম্।
ভবতি যদাভাসোঽপি স্বাতিজলং মুক্তিমুক্তায়াঃ॥

—(ছন্দঃ ১)

অর্থাৎ,— স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু স্পর্শে শুক্তিতে যেমন মুক্তার উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার যাহার নামাভাসরূপ স্বাতি জলেও মুক্তিরূপ মুক্তালাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মকরন্দপূর্ণ নামরূপ প্রফুল্ল অরবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

এখন আমরা নামাভাসেরই বা কতদূর কি ফল ও নামেরই বা কি শক্তি, শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বনে তাহাই অবগত হইতে সচেষ্ট হইব।

পরম পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে নামাভাসের ও নামের পৃথক ফল ও উভয়ের তারতম্য সুন্দর-ভাবে দেখাইয়াছেন, সেই সুসিদ্ধান্তের প্রতি সর্বদা স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ও তৎসিদ্ধান্তের পোষকতাস্বরূপ অপরাপর শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যদি নামতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করা যায়, তবে জীবের এই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতব্য বিষয়টির তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অন্ততঃ কিয়দংশও যে আমরা সুবিদিত হইতে পারি তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীচরিতামৃতকার প্রথমে নামাভাসের মহিমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

নামাভাস হৈতে সব পাপ ক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী॥

—(অন্ত্য ৩।৬১,৬৪)

উক্ত চারি ছত্র পয়ার হইতে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, নামা-ভাস হইতে (১) পাপক্ষয় হয়, নামাভাস হইতে (২) সংসারের ক্ষয় (অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ) হয়, ও নামাভাস হইতে (৩) মুক্তি (মোক্ষ) হইয়া থাকে। নামাভাসের চরম ফল যখন মুক্তি (বা মোক্ষ) পর্যন্তই, একথা স্পষ্ট বর্ণিত হইল, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মুক্তির অধিক সম্পদ,— মোক্ষের অধিক পুরুষার্থ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই

নামাভাসের দ্বারা লভ্য নহে,— 'নামাভাস' অপেক্ষা অধিক শক্তি যে 'নাম'— মোক্ষাতিরিক্ত বস্তু সেই নামের দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকেন। মোক্ষাধিক সম্পদ যেমন নামাভাস দ্বারা লভ্য না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, তেমনি ইহাও অযৌক্তিক নহে যে— যে-সকল বিষয় মোক্ষের অধীন— মুক্তি হইতে যাহাদের স্থান নিম্নে,— তাহারা কেন না নামাভাস প্রভাবে লভ্য হইবে ? লক্ষপতি জনের কোটি মুদ্রা আয়ত্তাধীন না হইলেও যেমন সহস্র ও শত মুদ্রা সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত-- ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; এবং সহস্রপতি বা শতপতি হওয়া যেমন লক্ষপতিত্বের আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল, সেইরূপ নামাভাসের মুখ্য বা চরম ফল যখন মুক্তি পর্যন্তই হইতেছে, তখন যে তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলে তদধীন সংসার-ক্ষয় ও তদধীন পাপনাশ (শুভাশুভ কর্মবীজ ধ্বংস) হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? যখন পাপক্ষয় বা কর্মবীজ ধ্বংস না হইলে সংসারবন্ধন ক্ষয় হয় না, এবং সংসারবন্ধনের ক্ষয় না হইলে যখন জীবের মুক্তি হইতেই পারে না, তখন মুক্তিলাভ হইলে যে তৎসহ সংসার-ক্ষয় ও পাপক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, একথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি ?

শ্রীভগবন্নামের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে— নাম ত দূরের কথা, একটি নামাভাস ঘটিলেও যে তাহারই ফলে লোকের মুক্তি পর্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিরাজ গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী ॥"

অজামিলের পুত্রের নাম ছিল 'নারায়ণ' একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই পুত্রকেই লক্ষ্য করিয়া, অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাতকী অজামিল মৃত্যুকালে অবসন্ন ভাবে, ব্যাকুল চিত্তে ও যদৃচ্ছাক্রমে 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন,— তথাপি সেই নামাভাসই তাঁহার মুক্তির কারণ হইয়াছিল ! যাঁহার নামাভাসের এইরূপ মহিয়সী শক্তি তাঁহার নামের মহিমা কে কবে নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় ! শ্রীভাগবতের সেই শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

— (শ্রীভাঃ ৬।২।৪৯)

অর্থাৎ, ম্রিয়মাণ অবস্থায় (মৃত্যুকালে) পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করায় (নামাভাসে) যখন অজামিল মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধা সহকারে সেই নাম গ্রহণ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কি আর বলিবার কথা!

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্র আর একটি শ্লোকে বলিয়াছেন ; —

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥

— (শ্রীভাঃ ৬।৩।২৪)

[(টীকা) ভগবতো গুণানাং নাম্নাঞ্চ যদ্বা গুণকর্ম্মসম্বন্ধিনাং বিচিত্রাণাং নাম্নাং বহূণাং সম্যক্ কীর্ত্তনং পুংসাম্ অঘনির্হরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি যৎ এতাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নাস্তি। কুতঃ অজামিলো মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেব বিক্রুশ্য, ন ত্ববতারসম্বন্ধি গুণকর্ম্মমাধুরী-বিশিষ্টং নামবিশেষং সম্যক্ কীর্ত্তয়িত্বা। তত্র চ পুত্রং বিক্রুশ্য, ন তু হরিম্। অঘবান্ অশুচিরপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপীতি বা ম্রিয়মাণ অস্বস্থ-চিত্তোঽপি মুক্তিমবাপ। নত্বঘনির্হরণ-মাত্রং, তদানীমজামিলস্য বর্ত্তমা-নত্বেন জীবন্মুক্তত্বৈব সিদ্ধা। অতো নামাভাসেনাপি যথা কথঞ্চিজ্জাতেন মুক্তিরপি স্যাৎ কিমুত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ।— (শ্রীসনাতন। হঃ ভঃ বিঃ ১১।২১৮)]

অর্থাৎ,— শ্রীভগবানের গুণ ও নামসকল অথবা গুণলীলাসংযুক্ত বিচিত্র নামসকল বহুবার সম্যক প্রকারে পরিকীর্তিত হইলে যে লোকের

পাপক্ষয় হয়, একথা বলিবারই বা কি আবশ্যকতা আছে ? কেন-না, মহাপাতকী হইয়াও অজামিল কেবল 'নারায়ণ' এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের বিশেষ অবতার সম্বন্ধে কোনও পবিত্র গুণ-কর্ম-মাধুরীযুক্ত নামবিশেষ সম্যক প্রকারে কীর্তন করে নাই ; তাহাও আবার পুত্রকে উদ্দেশ পূর্বক উচ্চারণ করিয়াছিল, শ্রীহরিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। আবার অজামিল কৃত পাপের কোন প্রায়শ্চিত্তও করে নাই ; সুতরাং অশুচি থাকিয়াই ডাকিয়াছিল,— তাহাও আবার ম্রিয়মাণ অবস্থায় অস্বস্থ চিত্তে ;— সুতরাং স্থির চিত্তেও ডাকে নাই। এরূপ নামাভাসের ফলেও কেবল যে অজামিলের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে— অজামিল জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে নামাভাস হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে পাপক্ষয় হইবে—ইহা আর অধিক কথা কি ?

সুতরাং নামাভাসের মুখ্য ফল মুক্তি এবং পাপনাশ ও সংসার-বন্ধন মোচন তাহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল— এই যে পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইহা অতীব সুসিদ্ধান্ত। এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে—

নামাভাসের ফল—

আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল। ১। পাপনাশ (শুভাশুভ কর্মবীজ ধ্বংস।)
২। সংসার-ক্ষয় (অবিদ্যার নাশ।)

মুখ্য ফল। ৩। মুক্তি (মোক্ষ)।

অতঃপর নামের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"কেহো বলে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়।
কেহো বলে নাম হৈতে জীবের মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥"

* * * * * *

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তম হয় ক্ষয় ॥
চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদি ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মঙ্গল প্রকাশ ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"

—(অন্ত্য ৩।১৭৬-১৭৭, ১৭৯, ১৮২-১৮৫)

যদি কেহ বলেন যে পাপনাশই নামের মুখ্য ফল, অথবা অপর কেহ বলেন, না তাহা নহে, নামের ফল মুক্তি পর্যন্ত,— তবে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, না তাহাও নহে,— পাপনাশ ও মুক্তি ইহা নামের মুখ্য ফল নহে ; নামের ফলে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে 'প্রেম' উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন নামাভাসের মুখ্য ফল মুক্তি, সংসার-ক্ষয় ও পাপনাশ তাহার আনুষঙ্গিক ফল ; সেইরূপ নামের মুখ্য ফল 'প্রেম', মুক্তি সংসার-ক্ষয় ও পাপনাশ তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল মাত্র। সুতরাং এত বড় মহিমা যাঁহার, সেই নামের মহিমাকে যদি কেহ পাপক্ষয় ও মুক্তির সীমায় সংবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহার সেই ধারণা যে কেবল-মাত্র ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা নহে—উহা প্রবল অপরাধেরও কারণ হইয়া থাকে।

একটি নাম সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইবামাত্র যে প্রভাব বিস্তার করেন তাহার বর্ণনা— সে ত অনেক দূরের কথা! একটি নামের যৎকিঞ্চিৎ অংশও উদয়ের আরম্ভেই 'নাম' সমস্ত আনুষঙ্গিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এই তত্ত্বটি শাস্ত্র একটি শ্লোকের দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। যথা,—

অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।১৩৮)

(টীকা,— সুনির্ম্মলাঃ অত্যন্ত মলহীনাঃ হি যস্মাৎ হরিকীর্ত্তনে রাগঃ শ্রদ্ধা নৃণাং তমঃ পাপমলং কৃৎস্নম্ অবিধূয় অনিরস্য নোদেতি ; অপি তু বিধূয়ৈবোদেতি। যথা সূর্য্যোঽন্ধকারং সর্ব্বং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বৎ। —শ্রীসনাতন।)

অর্থাৎ,— অহো, তোমাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়াছে ; (অথবা তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হইয়াছ) যেহেতু শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে তোমাদের শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা শ্রদ্ধায় হরি-সংকীর্তন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে পাপক্ষয় মাত্রের অনুমান-- ইহা আর অধিক কথা কি ? কেননা উদয়ারম্ভেই সূর্যের তমঃনাশের ন্যায়, শ্রীহরিনাম মনুষ্যের সকল পাপরাশি সম্যক প্রকারে বিনষ্ট না করিয়া উদিত হন না। তাৎপর্য এই যে— নাম, উদয়ারম্ভেই আনুষঙ্গিক ফল এবং উদিত হইলে মুখ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"

সূর্য সম্পূর্ণ উদিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ উদয়ারম্ভেই যেমন অন্ধকার অপসারিত করিয়া দস্যু, প্রেত ও রাক্ষসাদি নিশাচরগণ হইতে যে ভীতি,— সেই ভয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং উদয় হইলে যেমন জগতে ধর্ম ও সব কর্মাদির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাচরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নাম উদয়ারম্ভেই গৌণ ফলসকল প্রকাশ করিয়া, উদিত হইবামাত্রই মুখ্যফল যাহা সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে 'প্রেমোদয়' করিয়া

থাকেন। যথা—

"তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥"

শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীভগবন্নাম উদয়ারম্ভেই গৌণ ফল প্রদান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অংশও উদিত হইবামাত্র মুখ্যফল প্রদানে সমর্থ হয়েন; সেই জন্য একটি নামের বর্ণসকল যদি অপর কোন শব্দ দ্বারা ব্যবহিত বা পরিচ্ছিন্নও হয়েন, অথবা একটি নামের কিয়দংশ গৃহীত হইয়া অবশিষ্টাংশ বর্জিতও হয়েন, কিংবা অশুদ্ধ ভাবেও উচ্চারিত হয়েন, তথাপি নামের অপ্রতিহত শক্তিরও অণুমাত্রও ব্যর্থতা ঘটে না; কিন্তু এরূপ স্থলে যাহা নামাত্মক বর্ণ নহে— এরূপ শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়; এই হেতু শ্রীহরিনাম সর্বমন্ত্র-শিরোমণি— এই হেতু শ্রীহরিনাম— 'মহামন্ত্র'।

ভাবাবেশে কিম্বা আসন্নকালে অথবা ব্যস্ততা-নিবন্ধন বা এই প্রকার অপর কোনও কারণ বশতঃ অনেক সময়ে নাম যে উক্ত প্রকারে গৃহীত না হইতে পারেন এমন নহে; কিন্তু ইহাতেও নামের প্রভাব অণুমাত্রও নিষ্প্রভ হয় না—এমনই অব্যর্থ শক্তি কৃষ্ণনামে! তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নামের অক্ষর সবার এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হইলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩।৫৯)

এই তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রচার করিবার জন্য শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥"

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২৮৯)

(টীকা,— বাচিগতং প্রসঙ্গাদ্বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। শুদ্ধবর্ণং

বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। (১) ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ ব্যবধান-রহিতমিত্যর্থঃ। (২) যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ (৩) তৎরহিতঞ্চাপি বা, তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবংরূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিত-মিত্যর্থঃ ; রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং— কেনচিদংশেন হীন-মিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব।"— শ্রীসনাতন।)

তাৎপর্য— শ্রীভগবানের একটি নামও যদি কাহারও প্রসঙ্গক্রমে জিহ্বায় উচ্চারিত কিম্বা কিঞ্চিৎমাত্রও মনঃস্পৃষ্ট অথবা কর্ণে শ্রুত হয়— আবার সেই নাম যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ রূপেও গৃহীত হয়, কিম্বা তাহাও যদি আবার 'ব্যবহিত-রহিত,' 'ব্যবহিত' বা 'রহিত'ও হয়, তথাপি নাম সেই ব্যক্তিকে নিশ্চয় উদ্ধার করিয়া থাকেন।

'ব্যবহিত-রহিত' অর্থে, অপর কোনও অক্ষর বা শব্দান্তর দ্বারা যে ব্যবধান— অর্থাৎ যেমন 'নারায়ণ' নাম কিঞ্চিৎ উচ্চারণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে অপর কোনও শব্দান্তর তদন্তর্বর্তী হইয়া ভগবন্নাম সম্বন্ধে যে ব্যবধান ঘটাইয়া থাকে, এরূপ ব্যবধানশূন্যরূপে বা অব্যবহিতরূপে যে নামগ্রহণ তাহাকেই 'ব্যবহিত-রহিত' নাম কহে ; আর নামাত্মকভিন্ন 'রাজমহিষী' বা 'হলং রিক্তং' এইরূপ শব্দের ও বাক্যের মধ্যে যথাক্রমে 'জ' দ্বারা ব্যবহিত হইয়া 'রাম' নাম এবং 'লং' দ্বারা ব্যবহিত হইয়া 'হরি' নাম রহিয়াছেন ; এইরূপ অক্ষর দ্বারা ব্যবহিত নহে— এমন যে ভগবন্নাম, তাহাকেই "ব্যবহিত-রহিত" নাম কহে। 'ব্যবহিত-রহিত' নামে যে নামের ফল লাভ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি

আছে ? যেহেতু সেই ভগবন্নাম 'ব্যবহিত' অর্থাৎ শব্দান্তর দ্বারা উক্ত প্রকার বাধিত হইলে, অথবা 'রহিত' অর্থাৎ একটি ভগবন্নামের কিয়দংশ উচ্চারণ করিয়া যদি অবশিষ্টাংশ কোন কারণে গ্রহণ না করাও হয়, এরূপ ভাবে শ্রীভগবন্নাম গৃহীত হইলেও নিখিল পাপ ও অপরাধাদি হইতে এবং সংসার-পাশ হইতে সেই নাম সত্যই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অংশ অপেক্ষা পূর্ণের এবং 'এক' অপেক্ষা 'বহুর' শক্তি যে অধিক ইহা কে-না স্বীকার করিবেন। একটি মাত্র নাম, যে-কোনও প্রকারে অথবা তাঁহার যথা-কথঞ্চিৎ অংশ গৃহীত হইলেও তাহার ফলস্বরূপ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমোদয়ের কারণ সদ্যই প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত— একথা আমরা বুঝিলাম। কিন্তু ইহা হইতে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগিতে পারে যে, অংশ অপেক্ষা পূর্ণের এবং 'এক' অপেক্ষা 'বহু'র শক্তি যখন অধিক হওয়াই স্বাভাবিক, তখন নামের যৎকিঞ্চিৎ অংশও যে-কোন ভাবে গৃহীত হইলেও যদি প্রেমভক্তি লাভ হয়, তবে একটি পূর্ণ নাম বা বহু নাম গৃহীত হইলে তদধিক কি সম্পদ আছে যাহা জীবের লভ্য হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আংশিক নাম অপেক্ষা একটি পরিপূর্ণ নামের এবং একটি নাম অপেক্ষা একাধিক নামের শক্তি যথাক্রমে অধিকতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলে কি হইবে, একটি বা একটি নামের যথাকথঞ্চি-দংশেরই অনির্বচনীয় মহিমা হইতে সেই প্রেমরূপ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রাপ্ত হইবার কারণ হওয়ায় এবং প্রেমাধিক উৎকৃষ্টতর পুরুষার্থ আর কিছু না থাকায়, একাধিক নাম-গ্রহণকারীর নিকট অবশিষ্ট নামসকল "প্রেমভক্তির সমান বা অধিক অপর কোনও দেয় বস্তু না থাকায় প্রদান করিতে পারিলাম না"—ইহাই ভাবিয়া নামগ্রহণকারীর সমীপে যেন লজ্জিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। অহো ! কি অনির্বচনীয় মহিমা নামের ! ভাবিতেও বুদ্ধি স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়। এমন নামাশ্রয় না করিয়া আমরা আর কাহার আশ্রয়ে এই সুদুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ? এই

তত্ত্বটি সুন্দররূপে বুঝাইবার জন্য দেখিতে পাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ ॥

— (হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২৬৮)

[(টীকা)— অন্তকালে মরণসময়েঽপি। আদ্য প্রাগুক্তঃ, শব্দঃ কৃষ্ণনাম। অন্যৌ দ্বৌ শব্দৌ ঋণস্থৌ ঋণিণৌ সন্তৌ তিষ্ঠতঃ। তদ্বশ্যতয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সদা তন্মুখাদিষু প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ। নাম-নামিনোরভেদেন নাম্ন ঋণস্থত্বাৎ নামিনোঽপি ঋণস্থতয়া ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্ঞেয়ম্।—শ্রীসনাতন।]

তাৎপর্য— যদি কেহ মৃত্যুকালেও ম্রিয়মাণ অবস্থায়— অস্থির চিত্তে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপ তিন বার শ্রীভগবন্নাম জপ করে (উচ্চারণ করিতে না পারিলেও) সেই নামগ্রহণকারীর পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমোক্ত কৃষ্ণ নামই যথেষ্ট হইয়া থাকেন ; অবশিষ্ট নামদ্বয় আর কিছু দিবার নাই দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে তাহার নিকট ঋণীর ন্যায় অবস্থান করেন। নাম ও নামী অভেদ বলিয়া নাম ঋণী হওয়ায়, নামীও ঋণী অর্থাৎ শ্রীভগবানও উক্ত নামগ্রহণকারীর বশীভূত হয়েন। এই বশ্যতা নিবন্ধনই একবার কৃষ্ণনাম গ্রহণকারীর মুখ হইতে স্বপ্রকাশ নাম স্বয়ংই একাধিকবার স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

সুতরাং তিনবার কৃষ্ণনাম গ্রহণের যে কি শক্তি, তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া সে ত' অনেক দূরের কথা,— একবার হরিনাম গ্রহণেই যে অব্যর্থ, অসীম, অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ করেন, তাহা বলিতে যাইয়া যখন চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও সহস্রবদন অনন্তদেবও অক্ষম হয়েন, তখন অন্যের পক্ষে আর কথা কি ?

তাই শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥

— (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৪২)

অর্থাৎ,— শ্রীহরির ন্যায় চিদাত্মক তাঁহার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত হইলে যে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং অনন্তদেব সহস্র বদনেও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না।

অতঃপর নামের পরমাদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে কেবল নামাপরাধ বশতঃ নাম যদি তাঁহার নিজ শক্তিকে স্বেচ্ছায় সংযত করিয়া না রাখেন, (গ্রন্থকারকৃত শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি দ্বিতীয় কিরণ বা নামাপরাধ-দর্পণ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য) তবে তাঁহার শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে, নাম-শক্তির বিরুদ্ধে নিমেষের জন্যও দাঁড়াইতে পারে, এমন অপর কোন শক্তি কোথাও নাই। বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষণে স্বকীয় শক্তির প্রকাশে যে যত সমর্থ, সে তত অধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া দাবি করিবার অধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর মন্ত্রাদি বা যাগ-যজ্ঞাদির সাধনা,— ইহাদের কতকগুলি শত্রুপক্ষ আছে, যাহাদের আক্রমণে তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে; যেমন স্বরভ্রংশাদি মন্ত্রের শত্রু; অশুচি, অনাচার, অপবিত্রতা প্রভৃতি দোষ— যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজাদির শত্রু। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণে উক্ত সাধনা সকল অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে; কিন্তু নামের শক্তিকে পরাস্ত করিতে এরূপ অপর কোন বিরুদ্ধ শক্তি কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। নাম অন্য বিরুদ্ধ শক্তি কর্তৃক অবসন্ন ত হয়েনই না, বরং মন্ত্র-সাধারণ ও যাগ-যজ্ঞাদি, শত্রুপক্ষের আক্রমণে মৃতপ্রায় হইলে নিজ অমৃতময় স্পর্শ দিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করেন, এমন কি অধিক ফল দান করেন—এতই নামের প্রভাব! তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব॥

— (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০)

(টীকা,— মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন। তন্ত্রতঃ ব্যুৎক্রমাদিনা, দেশতঃ কালতশ্চ, অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা, বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিনা।

যচ্ছিদ্রং ন্যূনং তৎ সর্ব্বং তব নামসংকীর্ত্তনেব নিশ্ছিদ্রং করোতি রিক্তং পূরয়তি অধিকফলঞ্চজনয়তীত্যর্থঃ।— শ্রীসনাতন।)

অর্থাৎ,— মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদির দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, হে হরে! তোমার নাম সংকীর্তন, সে সমুদয়কে নিশ্ছিদ্র করিয়া তাহার ন্যূনতা পূরণ করেন এবং তদপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

নামের অব্যর্থ শক্তিকে ব্যর্থ করিতে পারে এমন কোনও বিরুদ্ধ শক্তি নাই। সুতরাং নাম দেশ, কাল, পাত্র বা কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন— নাম, নামীরই ন্যায় সর্বাধীশ— সকলের উপরে। একমাত্র নামাপরাধ-পরিশূন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন সময়ে— যে কোন স্থানে— যে কোন অবস্থায়— যে কোন প্রকারে, নাম গৃহীত হইলেই,— অমোঘ তাঁহার শক্তি, উহা 'কারণরূপে' সদ্যই ব্যক্ত হইয়া 'কার্যরূপে' ক্রমশঃ স্বকৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২০২)

অর্থাৎ,— হে লুব্ধক! শ্রীহরিনাম গ্রহণ সম্বন্ধে দেশকালাদির নিয়ম নাই; এমন কি, উচ্ছিষ্ট মুখেও নাম গ্রহণের নিষেধ নাই।

অন্যত্র— চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২০৩)

[টীকা,— তস্য চক্রায়ুধস্য কীর্ত্তনে অশৌচং নাস্তি, শুচিনৈব কীর্ত্তনং কার্য্যং, নৈবাশুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি নাম-নামিনোরভেদাভিপ্রায়েণ, যতঃ স্বনামাত্মকঃ চক্রায়ুধ এব পবিত্রং

করোতীতি তথা। যথাচমনাদিব্যতিরেকেণাশুদ্ধস্য শ্রীযমুনাদি জলাচমনাদিনৈব শুদ্ধিঃ, যথা চ তত্রাশুদ্ধেন কথং শ্রীযমুনাদিজলং স্প্রষ্টব্যমিতি শঙ্কা ন সম্ভবেৎ, অনন্যগতিত্বাৎ তথাত্রাপীত্যর্থঃ। যদ্বা— যতঃ স নামকীর্ত্তকপুরুষ এব অন্যমপি পবিত্রং করোতি, কিং বক্তব্যং তস্যাশৌচমিত্যর্থঃ— শ্রীসনাতন।]

অর্থাৎ— শ্রীহরি যেমন পবিত্রকারী, শ্রীহরি হইতে তদীয় নামের অভিন্নতা বশতঃ হরিনাম কীর্তনেও অশৌচাদির আশঙ্কা নাই ; সুতরাং সর্বদা সর্বত্র তাঁহার নাম কীর্তন করা কর্তব্য।

শ্রীভগবন্নামের আরও অত্যদ্ভুত অমোঘ মহিমার কথা শাস্ত্র বলিতেছেন যে—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

—(শ্রীভাঃ, ৬।২।১৪)

[টীকা— নন্বয়ং পুত্রনামাগ্রহীৎ ন তু ভগবন্নাম, তত্রাহুঃ সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সংঙ্কেতিতং। পরিহাস্যং পরিহাসেন কৃতং। স্তোভং গীতালাপপূরণাদ্যর্থে কৃতং। হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণম্। —(শ্রীসনাতন। হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৫২)

অর্থাৎ,— পুত্রাদির নাম গ্রহণচ্ছলে, পরিহাসচ্ছলে, গীতাদি আলাপপূরণাদিচ্ছলে বা অবহেলা করিয়াও শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও সেই ব্যক্তির অশেষ পাপ বিদূরিত হইয়া সকল সংসার-দুঃখের অবসান হয়।

এ বিষয়ে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে—

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

—(শ্রীভাঃ ৬।২।১৫)

টীকা,— ননু নায়ং সংকল্পপূর্ব্বকং বৈকুণ্ঠনামাগ্রহীৎ, কিন্তু পুত্রস্নেহ-

পরবশঃ সন্ তত্রাহুঃ পতিত ইতি। অবশেনাপি যো হরিরিত্যাহ স যাতনা নার্হতি। পুমানিত্যনেন নাত্র বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইত্যুক্তং। অবশত্বমেবাহুঃ পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ, স্খলিতো মার্গে; ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ, সংদষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। তপ্তো জ্বরাদিনা, আহতো দণ্ডাদিনা।

—(শ্রীসনাতন। হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৫৩)

তাৎপর্য— কেবল সঙ্কল্পপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেই যে ফল লাভ হইবে, নচেৎ হইবে না, এমন নহে; অবশেও নাম গৃহীত হইলে তাহার শক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না—তাহাই বলিতেছেন। প্রাসাদাদি হইতে পতিত, পথ হইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জ্বরাদিপ্রতপ্ত বা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইবার কালে যদি লোকে (সে যে-কেহই হউক না কেন, বর্ণাশ্রমাদির কোনই অপেক্ষা না করিয়া) অবশভাবেও হরিনাম গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তি সংসার-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে।

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২৩৪)

[টীকা,— এতৎ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি নাম কৃষ্ণস্য নামেতি বা মধুরাদপি মধুরম্। চিৎ চৈতন্যং ব্রহ্ম তৎস্বরূপম্ ইতি পরমফলরূপতোক্তা। অতো যথাকথঞ্চিৎ সকৃৎ তৎকীর্ত্তনাদপ্যানুষঙ্গিকত্বেন সর্ব্বস্যাপি মোক্ষো ভবেদেবেত্যাহ সকৃদপীতি। পরীত্যর্দ্ধে, অব্যক্তমসম্পূর্ণমুচ্চারিতমপীত্যর্থঃ, হেলয়াপি বা। হে ভৃগুবর॥— শ্রীসনাতন।]

তাৎপর্য— হে ভৃগুবর! কৃষ্ণ এই নাম, অথবা কৃষ্ণের নাম মধুর হইতেও সুমধুর, মঙ্গলেরও মঙ্গল! সমস্ত বেদবল্লীর শ্রেষ্ঠতম ফল এবং সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ! এই কৃষ্ণনাম একবারমাত্রও কীর্তনে,— তাহাও যদি আবার অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ যে কোনও ভাবে অথবা শ্রদ্ধা বা অবহেলার

সহিতও উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও (বর্ণাশ্রমাদির কোনও অপেক্ষা না করিয়া) মনুষ্যমাত্রকেই আনুষঙ্গিক ফলেই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। মুখ্য ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়—ইহাই তাৎপর্য।

শাস্ত্র এইরূপ বহু বহু শ্লোক দ্বারা, নামের দেশ-কাল-পাত্রাদির নিয়ম কর্তৃক অপ্রতিহত মহিমার ঘোষণা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে আর অধিক প্রদর্শিত হইল না। এখানে একটি স্বাভাবিক দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবন্নামের উক্ত অব্যর্থ শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

রাশীকৃত বারুদের স্তূপে যদি জ্বলন্ত টিকার অগ্নি সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে যেমন মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত বারুদরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, বারুদের সহিত একাধিক জ্বলন্ত টিকা বা একখানি কিম্বা অর্দ্ধ বা সিকিখানি অথবা উহার একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র সংযুক্ত হইলেও যেমন একই সময়ে একই ভাবে বারুদস্তূপ ভস্মীভূত হইবে,— অধিক অগ্নির সংযোগ বা অল্প অগ্নির সংযোগ বলিয়া কোনও তারতম্য লক্ষিত হইবে না, সংসার-দুঃখ ধ্বংস করিয়া প্রেমভক্তি প্রদান করিতে নামের শক্তিও সেইরূপ। আবার সেই টিকার অগ্নি, যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অথবা সংকল্পপূর্বক কিম্বা অনিচ্ছায়ও প্রযুক্ত হয়, অথবা বালক বা বৃদ্ধ, স্ত্রী বা পুরুষ, ব্রাহ্মণ শূদ্র বা চণ্ডালাদি কর্তৃকও প্রযুক্ত হয় অথবা শুচি বা অশুচি অবস্থায় শ্রদ্ধায় বা হেলায়, কিম্বা পতিত স্খলিত, ভগ্ন সংদষ্ট সন্তপ্ত বা আহত অবস্থাতেও যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোনও প্রকারে প্রযুক্ত হয়, তথাপি সেই বারুদরাশি যেমন একই সময়ে একই ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, দেশ কাল পাত্রাদি নিয়মের কোনই অপেক্ষা করে না, পাপ তাপ অবিদ্যাদি দুঃখ আনুষঙ্গিক ফলরূপে ধ্বংস করিয়া মুখ্যফল প্রেমভক্তি প্রদান করিতে নামের শক্তিও সেইরূপ অব্যর্থ! তাই শাস্ত্রও এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীভগবন্নামের এইরূপ অব্যর্থ বা অচিন্ত্য মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

—(শ্রীভাঃ, ৬।২।১৮)

[টীকা,— ননু তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহুঃ, যদ্বা, কৃষ্ণস্য নামেদমপ্যয়ং ন জানাতি কথং তস্য সর্ব্বপাপক্ষয়স্তত্রাহুঃ অজ্ঞানাদিতি। অস্য শ্রীবিষ্ণোর্জ্ঞানাদজ্ঞানাদ্বা। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি, তদ্বৎ।—শ্রীসনাতন।]

—(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।১৫৪।১)[১]

তাৎপর্য— এই নাম যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা ইহা শ্রীভগবানের নাম, এই সকল কোনও সংবাদ না জানিয়াও যদি কেহ নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলেও কি সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থে শাস্ত্র বলিতেছেন, জানিয়া কিম্বা না জানিয়া শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিলেও অগ্নির শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞাত বালক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিও যেমন ইন্ধনরাশি দহন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ তাহার সমুদয় পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

এই পর্যন্ত আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীভগবন্নামের ফল সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানিতে পারিলাম, সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাহা সংবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—

নামাভাস।		নাম।	
১। একটি পূর্ণ নামাভাসের ফল—		১। নামোদয়ারম্ভের ফল—	
আনুষঙ্গিক বা গৌণফল।	ক। পাপক্ষয়।	আনুষঙ্গিক বা গৌণফল।	ক। পাপক্ষয়।
	খ। সংসারক্ষয়।		খ। সংসারক্ষয়।
মুখ্যফল।	গ। মুক্তি।		গ। মুক্তি।

১। —(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত শ্রীসনাতন পাদের টীকা শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা-কৃত সংস্করণ হইতে গৃহীত)

(একাধিক নামাভাস, তৎকারণস্বরূপ এক নামাভাসেরই কার্য।)

২। যৎকিঞ্চিৎ উদয়ের ফল—
মুখ্যফল- ঘ। প্রেম।

৩। একটি সম্পূর্ণ উদয়ের ফল- ঐ।

(একাধিক নামোদয়তৎ-কারণস্বরূপ এক বা যৎ-কিঞ্চিৎ নাম গ্রহণেরই কার্য।)

আবার উক্ত প্রকার নামাভাস বা নাম, কেবল মাত্র নামাপরাধ ব্যতীত কোনও বিধি নিষেধের অপেক্ষা না করিয়া—

যে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক,
যে কোনও সময়ে,
যে কোনও স্থানে,
যে কোনও অবস্থায়,
যে কোনও প্রকারে,
} কীর্তিত, শ্রুত বা মনোস্পৃষ্ট হইলেও পূর্বোক্ত যথাযথ ফল লভ্য হইয়া থাকে।

শ্রীভগবন্নামের ফল সম্বন্ধে ইহাই সর্বশাস্ত্র-নির্গলিত সার-মর্ম।

মলিন জলে একবার মাত্র ফট্‌কিরি সংযোগ করার পর তাহা সদ্যই পরিষ্কৃত হইবার কারণ হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে সেই কার্যের বিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ নামাপরাধশূন্য ব্যক্তির পক্ষে এক বা এক নামের যথাকথঞ্চিদংশও গৃহীত হইবামাত্র উহার গৌণফলে পাপক্ষয়, সংসার ক্ষয় ও মুক্তির এবং মুখ্যফলে প্রেমোদয়ের সদ্যই কারণ হইয়া, 'শ্রদ্ধা' 'সাধুসঙ্গ' 'ভজনক্রিয়া', 'অনর্থনিবৃত্তি', 'নিষ্ঠা' 'রুচি', 'আসক্তি' ও 'ভাব' এই ক্রমানুসারে প্রেমরূপ কার্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি, ৮।২৬)

এক নামের কার্যস্বরূপ বহু নাম গ্রহণ-প্রবৃত্তি ও তৎসহ শ্রদ্ধাদি সাধন ভক্তির ক্রমশঃ বিকাশাদি যদি যথাকালে পরিলক্ষিত না হয়, তবে অবশ্যই জানিতে হইবে দশবিধ নামাপরাধের কোনও এক বা একাধিক অপরাধ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সংঘটিত হওয়ায়, শ্রীভগবন্নামের অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম স্বীয় কৃপা-শক্তির প্রকাশ করিতেছেন না; অতএব এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধের সন্ধান করিয়া, তাহা সম্পূর্ণ বর্জন পূর্বক পুনরায় একান্ত ভাবে নামেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি নহে প্রেম—নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি, ৮।২৯-৩০)

প্রথম প্রকাশ ঃ- শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা)
১১বর্ষ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা ; শ্রাবণ—কার্তিক ১৩৪০ সাল।

—

॥ শ্রীশ্রীগৌররায় হরির্জয়তি ॥

ঝটিকা-বিধ্বস্ত অন্ধকার নিশায় দিশাহারা পোতের মত, বর্তমান ধর্ম-সংকটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাস্ত্র-নিরূপিত প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ পাঁচখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ।

নাম-বিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত :—

১। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

২। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ)

৩। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ)
শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বা নামাপরাধ-দর্পণ।

৪। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা।

৫। মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ কর্তৃক ভাষিত)

১। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

(বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা সহ)

[চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য—ছয় টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র]

ধর্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের জীবন পথের আশা ও আলোক।

নিম্নোক্ত বৈষ্ণবাচার্য ও মনীষীগণ এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকী পত্রিকা কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই ইহার উপযোগিতা ও উপাদেয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী,

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত গৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য, পণ্ডিত রাখালানন্দ শাস্ত্রী ঠাকুর, গোবিন্দকুণ্ডের শ্রীল মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর মন্মথনাথ গুপ্ত, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য, মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম বৈরাগী (formerly Mr. R. H. Nixion M.A. (Oxon), Prof. G. Tucci. ডক্টর সুকুমার সরকার, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি, এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, হিতবাদী, প্রবর্ত্তক, দেশ, শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ, The Amrita Bazar Patrika, The Advance, The East Bengal Times etc.

২। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ)

[তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ছয় টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র]

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডি-লিট মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।)

নিম্নোক্ত মনীষীগণ কর্তৃক সমুচ্চ ভাষায় সমর্থিত :—

মহামহোপাধায় ভারতাচার্য পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালিপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস্, বেদান্তরত্ন, রায় বাহাদুর ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-বি-ই প্রভৃতি।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন,—

..."এতাদৃশ সূক্ষ্মতত্ত্ব ও বিচার বিশ্লেষণপূর্বক শ্রীভগবন্নাম-নামীর অভিন্নতা প্রদর্শন, আমি এই সুদীর্ঘ বয়সে ইতঃপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। * * গ্রন্থকারের গবেষণা প্রণালী আমার বিবেচনায় একেবারেই মৌলিক বলিয়া অনুভূত হইতেছে।"

বহু সংবাদপত্র ও পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ ভাষায় সমালোচিত। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র সমালোচনার সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

..."এই গ্রন্থে যেরূপ সুগভীর বিচার ও মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা আজিকার দিনে দুর্লভ বলা যাইতে পারে। দেশে ভগবৎবিশ্বাস ও ভক্তিভাবের পুনরুত্থানের জন্য এই পুস্তক আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" —যুগান্তর।

..."প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় দুরূহ বিষয়ে এমন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই আছে, এবং এই বিশেষ বিষয়টির সম্বন্ধে এমন পুস্তক নাই। —এ'কথা অসঙ্কোচে বলা চলে।" —দেশ।

...And we can say without reserve that it will meet splendid reception not only at the hands of the Vaishnavas, but of all who are interested in Hindu religion and Hindu culture" —Hidustan Standard,

..."It is difficult to speak too highly of this learned and illuminating monograph which deserves to be read from cover to cover by every seeker of truth."—A. B. Patrika.

৩। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ)

(শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বা নামাপরাধ-দর্পণ)

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
... ... —শ্রীচৈঃ চঃ ১।৮ অঃ
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥" —শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৪ অঃ

নামাপরাধ সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তারিত আলোচনা এই প্রথম। দশবিধ নামাপরাধের প্রত্যেকটি অপরাধ সম্বন্ধে ইহাতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রত্যেক ভজনেচ্ছু ব্যক্তি ভজনের বিঘ্ন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়া উপকৃত হইবেন। ইহার আরও এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বিশ্লেষণের নূতনত্ব ও চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট। অতীব সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলিও সুব্যাখ্যান কৌশলে সর্বসাধারণের বোধগম্য করা হইয়াছে। ৯২ পৃষ্ঠার বিস্তৃত ভূমিকা ও নামাপরাধের ইতিহাস-সহ মূল্য ১২ টাকা মাত্র।

বিখ্যাত মাসিক পত্র "উজ্জীবন" হইতে সমালোচনার কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইল।—

"মানুষের সাধন পথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা "নামাপরাধ"। বহু সাবধানতা সহকারে নামাপরাধের হাত হইতে সাধক নিজেকে রক্ষা করিবেন, তাহা না হইলে কিছুতেই সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। পদ্মপুরাণে দশটি নামাপরাধের উল্লেখ আছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই দশটির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিভাবে সাধক এইগুলি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার লেখার মধ্যে শাস্ত্র এবং যুক্তির অদ্ভুত সমাবেশ। বিচারশৈলী অকাট্য অথচ মনোরম। বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে এই গ্রন্থ অবশ্য-প্রয়োজনীয় আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। আশা করি ভজনশীল বৈষ্ণব এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ-

রূপে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসগৌর ঘোষাল

৪। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয়-সংস্করণ। মূল্য ১০-০০ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থখানি স্থিরভাবে পাঠ করিলে বেদাদি সনাতন ধর্মশাস্ত্র সকলের সুমীমাংসা ও সারমর্ম সহজে অনুভূত হইবে।

বর্তমান ধর্মসঙ্কটের দিনে আধ্যাত্মিক জগতের সকল জটিলতা ও অন্ধকার অপসারিত হইয়া, এই গ্রন্থের আলোকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম ও একমুখ্যতা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

সমস্ত বেদ যে পূজ্যতমকে কীর্তন করেন, (সর্ব্বে বেদা যৎ-পদমামনন্তি' —কাঠকে। ১।২।১৫) — সেই বেদ বা ত্রয়ী নিহিত পরম উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিগূঢ় রহস্য সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত করাইয়া, আধ্যাত্মিক জীবনপথে নূতন আশা ও আলোকের সঞ্চার করিবার পক্ষে গ্রন্থখানি কিরূপ অতুলনীয়,— পাঠ করিয়া না দেখিলে স্বল্প কথায় তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে।

পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগোবর্ধন—

আপনার প্রণীত "শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা" আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা 'কণিকা' নহে, —কৌস্তুভ মণি। বাঙ্গলা ভাষায় এমন গ্রন্থ আমি আজ পর্যন্ত কোথাও পাই নাই। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা প্রভৃতি ইহার সর্বত্র সর্বোৎকর্ষের অনুভব পাইয়াছি। শ্রীনাম-মহিমা বহুজন বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা —'কোঽপি অনির্ব্বাচ্যতম'।

প্রীতিগন্ধশূন্য বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ও আপনার শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা আস্বাদে দ্রব হইয়া বিচিত্র গুণ-লীলার্ণবে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবে, —এই তো গ্রন্থের মহিমা! (বাং ২২।৭।৬৬)।

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম-এ বিদ্যাভূষণ মহোদয়।

'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' রচনায় গ্রন্থকার ভাগবত সমাজের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় এই গ্রন্থে ষড়্ গোস্বামি-প্রবর্তিত সন্দর্ভ নবরূপতা লাভ করিয়াছে। বিষয় নির্বাচন বিশ্লেষণক্রম ও বিন্যাসরীতি প্রতি পদে শ্রীজীবপাদের লিখন শৈলীর স্মরণ করাইয়া দেয়। * * *

গৃহে গৃহে এই গ্রন্থের বার্ত্তা প্রচারিত হউক। (১৬।৯।৫৯)

প্রভুপাদ শ্রীমৎ সীতানাথ গোস্বামী শাস্ত্রী মহোদয়।

'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের যথাসর্বস্বধন ও অপূর্ব বস্তু। শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রসেবী মহৎগণও এই গ্রন্থের অনুশীলনে শ্রীভক্তিদেবীর সর্বোপরি বর্তিত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইতে পারিবেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। ধর্মসঙ্কটের দিনে এই মহাগ্রন্থ গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া পরম সত্যের আলোক প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা করি। (বাং ১৪।১০।৬৬)

প্রভুপাদ শ্রীমৎ দীনেশচন্দ্র গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীল গ্রন্থকার তাঁহার স্বাভাবিক প্রেমের কোমল তুলিকায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে যে মনোমুগ্ধকর সুমধুর চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অন্যত্র দুর্লভ। গ্রন্থখানি স্থিরভাবে পাঠ করিলে বেদাদি শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরম উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক সম্বন্ধীয় প্রকৃত রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং যে ধর্মের তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্' তাহার সহজ, সরল এবং প্রকৃষ্ট পথের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা, শিক্ষা এবং আদেশপ্রাপ্ত শ্রীপাদ রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিপাদগণের রচিত গ্রন্থের পর এই শ্রেণীর

এমন গ্রন্থ আর রচিত হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, 'মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য'— ইত্যাদি।

গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ অনুভূতি ব্যতীত শুধু শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্যে সম্ভবপর নহে। (বাং ১৫।১০।৬৬)

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, ডি-লিট্
বিদ্যাবাচস্পতি, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর মহোদয়।

আপনার কৃপার দান 'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' পাইয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। পড়িয়া বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম। সাধকের পক্ষে যাহা যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য তৎসমস্তই অল্প কথায় অথচ শাস্ত্র প্রমাণ সহকারে অতি সুন্দর ভাবেই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাস্তবিক অতি উপাদেয় হইয়াছে। (২৮।৮।৫৯)

শ্রীমৎ বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তিভারতী-ভাগীরথী মহোদয়,
(ভুতপূর্ব 'দেশ'-সম্পাদক) কলিকাতা।

আপনার কৃপাপ্রদত্ত শ্রীগ্রন্থখানি শিরোধার্য করিয়া কৃতার্থ হইলাম। গ্রন্থপাঠে পত্রে পত্রে পরম বিদ্যার উপলব্ধি করিতেছি। দেহে মনে পুলকের স্পন্দন জাগাইতেছে। পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও পিপাসার নিবৃত্তি ঘটে না। প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিহ্নিত পুরুষ আপনি, তাঁহার কৃপা আপনার উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। নহিলে হরিকথা এমন করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কৃষ্ণনাম শুনাইবার এমন যোগ্যতা কাহারো হয় না। সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপনি জলের মত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুভূতি না থাকিলে এলোমেলো ভাব এড়াইয়া তত্ত্বকে এভাবে প্রমূর্ত করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। লীলার নিগূঢ় রহস্য এভাবে মেলিয়া দেওয়া যায় না। আপনার লেখা চিন্ময় আনন্দ সম্বন্ধে প্রাণময়। পরমভাগবত

আপনি, জয় আপনার জয়। (বাং ২৫।৩।৬৬)

পণ্ডিতপ্রবর সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়, সিঁথি, কলিকাতা।

'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা'-প্রসাদ আস্বাদন করিয়া 'পরম লাভবান্' (ভাঃ ১১।৫।৩৭) হইতেছি। এই এক কণিকার প্রসাদেই সর্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতের পরম সারস্বরূপ সাবরণ শ্রীগৌর-প্রসাদী-সিদ্ধান্তামৃতসার-সাগরে সকলেই অনায়াসে নিষ্ণাত হইতে পারিবেন। গ্রন্থের প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু, বিচার বিশ্লেষণ, চিন্তাশৈলী সদ্‌গতি সিদ্ধান্ত, এমন কি প্রত্যেকটি বাক্য ও শব্দ একান্ত অনুভবসিদ্ধ পরম শ্রৌতভাব-রসগর্ভ মৌলিক প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। (ইং ১১।১।৬০)

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ,
এম-এ, ডি-লিট্ মহোদয়, বারাণসী।

আপনার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতেই ভক্তসমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। শ্রীভগবান আপনাকে নিমিত্ত করিয়া এত দিনে ঐ অভাব দূর করিলেন। ইহাতে আপনার যে অপূর্ব পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম, লিপিকৌশল ও বিবেচনা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার জন্য আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভক্তি ও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আপনি যুগোপযোগী জীবসেবার কার্যই করিয়াছেন। আশা করি আপনার সুখস্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হইবে এবং শ্রীভগবৎ প্রেমের বন্যায় সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হইবে। (ইং ১৮।১।৬০)

যুগান্তর। ১৪ই কার্তিক, ১৩৬৬

গ্রন্থটি দরদের লেখা, অনুভূতির লেখা বলিয়াই প্রত্যেকটি কথা ভাবস্বচ্ছ, কৃত্রিমতা-বর্জিত, মৌলিক ও মর্মমূলস্পর্শী। বেদাদি সনাতন

হিন্দুধর্মশাস্ত্রের পরিপূর্ণ মীমাংসা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বলিষ্ঠ যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপমাদির দ্বারা সকলের সুবোধ্য করা হইয়াছে। শাস্ত্রের যাবতীয় কূটপ্রশ্নের উত্তর, যুগমানব মনের অসংখ্য সংশয় ও বিপরীত ভাবনার এবং বিশ্বশান্তির বিভিন্ন সমস্যার বিস্তৃত সমাধান এই একটি গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে।

ইহাতে জীবের পরম প্রয়োজন ও পরমা শান্তির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। কেবল সন্ধান ও গবেষণাত্মক বিশ্লেষণই নহে—বাস্তব বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, বস্তুলাভ ও বস্তুসিদ্ধির সহজতম ও পরম উপায়-টিকেও সুবিদিত করা হইয়াছে, গ্রন্থখানি ভক্তি ও তত্ত্বপিপাসুগণের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

৫। **মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ**। (প্রভুপাদ কর্তৃক ভাষিত)

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম॥" (শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবার দিন আগতপ্রায়। সেই সুসংবাদ বহন করিয়া কলিকৃত তিমিরের আলোক স্বরূপ শ্রীভাগবত ধর্মের সারমর্ম—

"শ্রীভাগবতী বাণী গ্রন্থমালা" নামে ধারাবাহিক আলোচনা সঙ্কল্প লইয়া উহার প্রথম মালিকা **"মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ"** প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা পাঠে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন— কলিকৃত এই ধর্ম সঙ্কটের অন্ধকার মধ্যে। ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাগজ, মূল্য যথাসম্ভব সুলভ— টা ১'৭৫ মাত্র।

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত **পথের গান (কবিতা)**

ও

শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী রচিত **লালসা মুকুল (কবিতা)**

একত্র মূল্য—২'০০ দুই টাকা মাত্র।

কবিতার অভিব্যক্তি হয় প্রাণের সরস সরল স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের আবেগ হইতে। এই হেতু কবিতার মধ্যে তত্ত্ব সিদ্ধান্তের অন্বেষণ করিতে না যাইয়া ইহা কবি-হৃদয়ের সাহজিক ভাবোচ্ছ্বাস রূপেই গ্রহণীয় হইয়া থাকে। কবিতাগুলিতে অধিকাংশই মধুর ভাবের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। যাহা মহান্ ভগবান ও ক্ষুদ্রতম জীবের মধ্যে স্বাভাবিক ও সাহজিক নিকটতম সম্বন্ধ।

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বিরচিত :—

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ) —**শ্রীনামের মাহাত্ম্য এবং শ্রীশ্রীরাগভক্তি-রহস্য-দীপিকা**— এই গ্রন্থদ্বয় সাধু সজ্জনগণের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা থাকিল।

লালসা মুকুল (দ্বিতীয় স্তবক)— **শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী রচিত (যন্ত্রস্থ।)**

—ঃ গ্রন্থ প্রাপ্তি স্থান ঃ—

১। **মহেশ লাইব্রেরী,** ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-৭৩

২। **ঢাকা স্টোর্স,** রাজার বাজার, পোঃ নবদ্বীপ, [নদীয়া]

৩। **শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী,** ৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

৪। **শ্রীগৌররায় গোস্বামী,** কোয়াটার্স নং- সি এন ৯০ কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর— ২, [বর্ধমান], পিন কোড- ৭১৩২০২

৫। **শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী,** শ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ—নবদ্বীপ [নদীয়া]।

৬। **চারিধাম আশ্রম,** পোঃ-খাগড়া, জিলা-মুর্শিদাবাদ।